জাতপাত, শ্রেণী এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনকালের রাজনৈতিক কৌশল নির্মাণ (১৯৭৭-২০১১): একটি পর্যবেক্ষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকসম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
মিঠুন মজুমদার
আন্তর্জাতিকসম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কাকলি সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপিকা
আন্তর্জাতিকসম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

Certified that the Thesis entitled

জাতপাত, শ্রেণী এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনকালের রাজনৈতিক কৌশল নির্মাণ (১৯৭৭-২০১১): একটি পর্যবেক্ষণ submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Kakoli Sengupta, Associate Professor, Department of International Relations, Jadavpur University, And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree/diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Dr. Kakoli Sengupta
Associate Professor
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata 700032
Dated:

Candidate:

(Mithun Majumder)
Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য ও গবেষণা সন্দর্ভ সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য একজন গবেষকের নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। একজন গবেষক নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদন করলেও পারিপার্শ্বিক বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তা কখনোই সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধি অর্জনের জন্য প্রদত্ত হল। আমার গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য সবথেকে বেশি যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষোণা সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা ডক্টর কাকলি সেনগুপ্ত। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, অনুপ্রেরণা, সামগ্রিক সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় আমার গবেষণা সন্দর্ভ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শ গবেষণাকার্য সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে সবথেকে সহায়ক হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা গ্রন্থ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাই আমি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা শ্রীমতি কাকলি সেনগুপ্তর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋনী। তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর ইমন কল্যাণ লাহিড়ীর কাছে। যিনি বিভিন্ন সময় আমার গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিতেন, গবেষণাটি দ্রুত শেষ করতে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিতেন। একই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকেও এখানে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম জানাই।

গবেষোণাকার্য চলাকালীন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস (ভাইস চ্যান্সেলর), চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য (প্রো ভাইস চ্যান্সেলর), স্বর্গীয় স্যমন্ত্যক দাস (ভূতপূর্ব প্রো ভাইস চ্যান্সেলর), স্নেহমঞ্জু বসু (রেজিস্ট্রার), ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী (সেক্রেটারী অফ আর্টস), ওমপ্রকাশ মিশ্র (প্রাক্তন ডিন অফ আর্টস) ও অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার (ডিন অফ আর্টস) প্রমুখকে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। তাঁদের নিরলস সাহায্য আমার গবেষণা সন্দর্ভ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, সুবর্ণ দাস, মুক্তিপদ সিনহা, মনোজিৎ মণ্ডল, রূপকুমার বর্মণ, মানস ঘোষ, রাজেশ্বর সিনহা, আব্দুল কাফি, নীলাঞ্জন অধিকারী ও প্রবীর ওঝাকে। যাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক শিবাশিষ চ্যাটার্জী মহাশয়কে (শিবনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী)। তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকার্যে সহায়তা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই বন্ধু অধ্যাপক মনিকান্ত পয়ড়্যাকে। বিভিন্ন সময়ে সে আমাকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছে।

আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তারকনাথ দাস রিসার্চ সেন্টারের শ্রীমতি কঙ্কনা দাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গ্রন্থাকারিক পার্থদা, তুষার দা। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্সের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, মুজাফফর আহমেদ লাইব্রেরি, রাজ্য বিধানসভা লাইব্রেরী, রাজ্য সরকারের আর্কাইভ ও বিভিন্ন জেলার লাইব্রেরীর আধিকারিকদের কাছে। তাঁরা আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখক, কৃষিজীবী কমিউনিস্ট নেতা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আমার গবেষণাকার্যে সহায়তা করেছেন। তাঁদের জীবন অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখ্যাগারের তথ্যের সমুতল। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রনাম জানাই।

আমার এই গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার [সহকারী অধ্যাপক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)] ও ড. অয়ন গুহ (সহকারী অধ্যাপক, জামিয়া হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয়)। যাঁরা সারাক্ষণ মূল্যবান পরামর্শ ও মানসিকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। কৃষ্ণদা নিরলসভাবে আমার গবেষণার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া গবেষণাকার্যে সাহায্য করেছেন আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ দেবু দা, প্রসেনজিৎ পাল, সৌরিশ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, সজীব মন্ডল, উজ্জ্বল ঘোষ, কৌশিক বৈদ্য, অসীম মোদক, অংকন রায়, অনন্যা দি, অম্লান মন্ডল, আনিসুল হক, প্রদীপ্ত রায়, অঙ্কিতা রায়, বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে আমার বন্ধুবর পিন্টু দাস, সম্রাট রায়, শুভাশিস চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ প্রামাণিক, সিটু শেখ, চৈতন্য মজুমদার, পাভেল, ও

আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু অধ্যাপক সম্রাট হেমব্রম (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)। এছাড়াও আমার এই গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন চিরঞ্জিত দাস, উত্তম দাস, আলি ভাই, ইন্দ্রজিৎ দাস, বনমালী মালিক, বিশ্বজিৎ হাজং, সন্দীপ, শুভঙ্কর, অজয়, রতন, গোকুল, সারফরাজ, সুজয়, কৌশিক, বিপ্রা, ধীরাজ, পূজা, সোনালি, নন্দদুলাল ও আরো অনেকে। সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই গবেষণা প্রকল্প নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের [UGC-University Grants Commission] কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের আর্থিক সাহায্য এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা দান করেছে।

যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না তাঁরা হলেন আমার পিতা শ্রীরমেন মজুমদার ও মাতা চিনু মজুমদার। যাঁদের স্নেহ ভালবাসায় আমি আমার গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। এখানে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া আমার দাদা রিপন মজুমদার, বৌদি রিতা মজুমদার, দুই দিদি রিনা মজুমদার, ও কৃষ্ণা মজুমদার। এছাড়া আমার স্নেহের অন্তর, তনু, বিশ্বরূপ, কৌশিক ও ননী সকলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছে। আমি আমার গবেষণা সন্দর্ভটি ঠাকুমা স্বর্গীয় শ্রীমতি পুণ্যলক্ষ্মী মজুমদার ও আমার দিদিমা স্বর্গীয় কুসুমকুমারী গোমস্তার করকমলে উৎসর্গ করছি।

মিঠুন মজুমদার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i-iii

মুখবন্ধ iv-vi

সারণি vii-viii

ভূমিকা ১-২০

প্রথম অধ্যায়: বাম রাজনীতির উদ্ভব, বিকাশ ও ঐতিহাসিক পটভূমি ২১-৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়: জাতপাত ও শ্রেণীর ধারণা, প্রকৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতি ৪৩-৯৯

তৃতীয় অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি ১০০-১৬৬

চতুর্থ অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির কৌশল: জাতপাত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরণ ১৬৭-২১১

পঞ্চম অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কৌশল ২১২-২৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতির বহুকৌনিক অবস্থান ২৭৬-৩১৪

উপসংহার ৩১৫-৩২৪

সংকেতাবলি ৩২৫-৩২৭

পারিভাষিক শব্দাবলী ৩২৮-৩৩০

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ৩৩১-৩৫৭

মুখবন্ধ

বর্তমান ভারতে ‘জাতপাত’ ও ‘জাতি হিংসা’, আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর শোষণ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। ভারতের সংবিধানে জাতপাত কেন্দ্রিক হিংসা, কিংবা অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হলেও সামাজিক জীবনে তার প্রভাব রয়েছে। যা সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। আমার গবেষণার বিষয় **জাতপাত, শ্রেণী এবং বাম শাসনকালের রাজনৈতিক কৌশল (১৯৭৭-২০১১): একটি পর্যবেক্ষণ**। আমার গবেষণাপত্রটি পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের গঠন, শ্রেণীর ও রাজনৈতিক কৌশল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে ‘জাতপাত’ শব্দটি ‘জাতি ও জাতপাত’ (Caste and Casteism) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কাজটি করার পূর্বে (২০১১) পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটে। দীর্ঘ বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও শ্রেণী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই আমার মধ্যে নানা ধরনের কৌতুহল তৈরি হয়। এছাড়াও দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিভিন্ন আলোচনায় ‘জাতপাত’ ও ‘শ্রেণী’র বিষয়টি উঠে আসে। ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষভাবে 'জাতপাত ছাত্র রাজনীতির' সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিষয়টির সাথে আরো গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। গবেষণার বিষয়ে প্রথমে রণবীর সমদ্দারের ‘প্যাসিভ রেভোলিউশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ গ্রন্থ্ পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হই। জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতি নিয়ে বিশেষ কৌতুহল তৈরি হয়।

গবেষণায় মূলত ভারতের প্রেক্ষাপটে যে জাতপাত রাজনীতি আলোচনা করা হয় তা সাধারণত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ্গুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জাতপাতকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। জাতপাতকে বর্ণের ভিত্তিকে ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রেক্ষাপটে দেখানো হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে জাতপাতের সেই সনাতনী ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে হার্বাট হোপ রিজলের হাত ধরে জাতপাত গবেষণার নতুন প্রেক্ষাপট সূচিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতপাতের বিষয় গবেষণার দ্বার আরো উন্মুক্ত হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজ বিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকেরা সমীক্ষার মাধ্যমে জাতব্যবস্থাকে দেখতে শুরু করেন। একইভাবে ভারতবর্ষের বামপন্থীরা জাতপাত ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণের প্রয়াস করেন। অর্থাৎ জাতপাত ব্যবস্থাকে শ্রেণীর নিরিখে আলোচনার বিষয় আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের

রাজনীতিতে জাতব্যবস্থা শ্রেণীর রাজনীতিতে উত্তরণ ঘটে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের রাজনীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীর রাজনীতির উত্তরণ ঘটান। সত্তরের দশকে ভারতেরে অন্যান্য রাজ্যে দলিত প্যান্থার আন্দোলন ও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের প্রভাবে জাতপাত রাজনীতির প্রবর্তন হলেও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী জয় অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীরা শ্রেণীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ক্রমশ বাম রাজনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। একাধারে জাতপাত রাজনীতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং তপশিলি জাতপাতের আত্মপরিচিতির রাজনীতি, সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি ও তপশিলিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনতার ফলে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জাতিসংগঠনগুলো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্রদের মতুয়া মহাসংঘ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পৌণ্ড্রমহাসংঘ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। অবশেষে ২০১১ সালে দীর্ঘ বামশাসনের অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনীতির যে উত্তরণ ঘটেছিল এবং মধ্যবর্তী বাঙালি বামপন্থী রাজনীতির অবসান ঘটে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বামরাজনীতির অবসর নিয়ে বিভিন্ন কৌতুহল তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত, শ্রেণী ও দরিদ্র রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার সরকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন, স্বরাজ বসু রাজবংশী সম্প্রদায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সর্বাণি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, অয়ন গুহ, অরবিন্দ কুমার, পৌষকর্ণ সিনহা, রূপ কুমার বর্মণ প্রমুখরা শ্রেণী ও বামরাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে জাতপাতের রাজনীতি ও শ্রেণীর রাজনীতি একটি মূল বিতর্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বামেদের রাজনীতিকে অনেকেই শ্রেণীর রাজনীতির এবং মধ্যসত্ত্বের রাজনীতির মিশেল হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। অনেকেই আবার বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত, শ্রেণীর মেলবন্ধনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। বামপন্থীদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে

অপসারণের পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক বহুকৌণিক মতবাদের উদ্ভব হয় এবং তার বিচার-বিশ্লেষণে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যের প্রয়াস নেওয়া হয়। বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতির বিষয়টি এবং তার সঙ্গে বামপন্থীদের রাজনৈতিক কৌশল কিভাবে তাত্ত্বিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটেছিল তা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মিঠুন মজুমদার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

সারণি সূচি

	পৃষ্ঠা.
সারণি:২.১. দলিত, আদিবাসী ও মুসলিম জনসংখ্যা (২০০১ জেলার জনসংখ্যার শতকরা)	৭৬-৭৭
সারণি:২.২. সংখ্যাবহুল মধ্য জাতি, ১৯৩১ (জেলার জনসংখ্যার শতাংশ)	৮০-৮১
সারণি:২.৩. পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও জনসংখ্যা (১৯৬১-২০১১)	৮২-৮৭
সারণি:২.৪. জনসংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ৫ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট তপশিলি জাতি	৮৭
সারণি:২.৫. রাজবংশী সমাজের জেলাভিত্তিক অবস্থান	৮৮-৮৯
সারণি:২.৬. জেলাভিত্তিক নমঃশূদ্রদের ভৌগলিক অবস্থান	৮৯-৯০
সারণি:৫.১. পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে জনসংখ্যার বন্টন (মোট তপশিলি জনসংখ্যার শতকরা)	২১৫
সারণি:৫.২. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা (১৯৫২-১৯৭২)	২৪৩-২৪৪
সারণি:৫.৩. তপশিলিদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৫২-২০১৬)	২৪৬
সারণি:৫.৪. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তপশিলি বিধায়ক সংখ্যা (১৯৭৭-২০০৬)	২৪৯
সারণি:৫.৫. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা (১৯৫২-১৯৭২)	২৫২-২৫৪
সারণি:৫.৬. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতির ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্ব (১৯৫২-১৯৭২)	২৫৭
সারণি:৫.৭. রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন (১৯৭৭-২০১১)	২৫৮-২৫৯
সারণি:৫.৮. বিভিন্ন দলের তপশিলি বিধায়কদের প্রাপ্ত ভোট শতাংশে (১৯৭৭-২০১১)	২৫৯-২৬০

সারণি:৫.৯. পার্টি অনুসারে তপশিলি বিধায়ক সংখ্যা (১৯৭৭-২০০৬)	২৬১
সারণি:৫.১০. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের হার (১৯৭৭-২০০৬)	২৬২-২৬৩
সারণি:৫.১১. বিধানসভায় বিধায়কদের পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ধারণা (১৯৫২-১৯৭২)	২৬৪-২৬৫
সারণি:৫.১২. বিধানসভার সদস্যদের শিক্ষাগত মান (১৯৫২-১৯৭২)	২৬৫
সারণি:৫.১৩. পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় জাতপাত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব(১৯৫২-১৯৭২) (শতকরা হিসাব মোট মন্ত্রীসভার)	২৬৫-২৬৬
সারণি:৫.১৪. বিধানসভার সদস্যদের পেশাগত বিভাজন (২০০১-২০০৬)	২৬৬
সারণি:৫.১৫. বিধানসভার সদস্যদের শিক্ষাগত (২০০১-২০০৬)	২৬৭
সারণি:৫.১৬. জাতি অনুসারে তপশিলিদের সংরক্ষিত বিধানসভার বিধায়ক (১৯৭৭-২০১১)	২৬৮
সারণি:৫.১৭. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতির ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্ব (১৯৭৭-২০০১)	২৬৮-২৬৯
সারণি:৫.১৮. নির্বাচিত তপশিলি বিধায়ক বিধানসভা (১৯৭৭-২০১১)	২৭০
সারণি:৫.১৯. পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যা	২৭১
সারণি:৫.২০. ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব	২৭২
সারণি:৫.২১. ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সামাজিক প্রতিনিধিত্ব	২৭৩

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতপাত ও বাম রাজনীতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলায় যেসব গণআন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সেইসব গণআন্দোলনে বাম রাজনীতির অংশগ্রহণ ও অবদান ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী দীর্ঘ বামপন্থী রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণীর প্রভাব দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মন্ডল কমিশনের জাতপাত ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র দুটো শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। একটি হলো ধনী শ্রেণী এবং অন্যটি হলো দরিদ্র শ্রেণী। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের কোন স্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সি.পি.আই.(এম.) এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন যে দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের পক্ষে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন আনা এবং শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণীর সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন করাই হল ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষাপটে দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বামফ্রন্টের সাফল্যের মূল্যায়ন করা উচিৎ।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভূমিহীন ও ভাগচাষিদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করত। সেই সময়ে মধ্যবিত্ত কৃষকরা জমির মালিক শ্রেণী ভুক্ত ছিল। ১৯৮২ সালে অল ইন্ডিয়া কিষান সভা সম্মেলনে এইচ.টি. সুরজিৎ বলেন যে সমৃদ্ধ ও মধ্যবিত্ত কৃষকসহ সকল সম্প্রদায়ের চাহিদাগুলি একত্রে উপস্থাপন না করলে আমরা কৃষি বিপ্লবের দিকে এগোতে পারব না। আমরা জমি অধিগ্রহণ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবো না। এর ফলে বাম রাজনৈতিক কৌশলের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিভেদ ছাড়াই কৃষক শ্রেণীকে অভিন্ন কৃষক শ্রেণী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কৃষক শ্রেণীকে অভিন্ন কৃষক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধারণ কৃষক ও জাতপাত ভিত্তিক কৃষক অর্থনৈতিক স্বার্থে একত্রিত হয়েছিল। যেখানে জাতপাতের স্বার্থের কোন বৈধতা ছিলনা। একটি মাত্র কৃষক সম্প্রদায় হিসেবে মানিয়ে নেওয়ার বৈধতা প্রদান করা হয়েছিল। অনেক বামপন্থী তাত্ত্বিক মনে করেন বামফ্রন্ট যে মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাতে জাতপাতের কোন স্থান নেই। বামপন্থী মতাদর্শে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণী রাজনীতির প্রভাব সবথেকে বেশি পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকাতে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে কৃষক শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ক্ষুদ্র ও ভাগ চাষিদের সঙ্গে মধ্যবর্তী কৃষকদের সমঝোতার মাধ্যমে

বামফ্রন্ট বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তাঁরা কৃষক সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। মুকুলিকা ব্যানার্জি, দয়াবতী রায়, পার্থ চ্যাটার্জি প্রমুখরা মনে করেন জাতপাত রাজনীতিকে প্রভাবিত না করলেও গ্রামীণ প্রান্তিক স্তরগুলিতে জাতপাত দ্বারা পরিচালিত হতো। গ্রামীণ রাজনীতিতে জাতপাত ব্যবস্থা সামাজিক একক হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু কখনোই রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেনি। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, সর্বানি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা মনে করেন শ্রেণীর রাজনীতি করতে বামপন্থীদের শ্রেণী বিরোধী আন্দোলন করতে হয়েছে। এই শ্রেণী বিরোধী আন্দোলনের একদিকে ছিলেন জমিদার ও বড়ো জমির মালিক। অন্যদিকে ছিলেন ভূমিহীন ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর, ছোটো ও মাঝারি কৃষক। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে গ্রামীন এই সংঘাতের অবসান ঘটে। জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবর্তী ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে মজুরি নিয়ে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল। সি.পি.আই.(এম.) ও তার সহযোগী দলগুলো ক্ষুদ্র ভাগচাষিদের পক্ষে থাকলেও পরবর্তী সময়ে মধ্যবর্তী চাষিদের পক্ষ নেয়। তাঁরা ক্ষুদ্র, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষি ও মধ্যবর্তী চাষিদের মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাঁদের লড়াই সংঘবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে। তাঁরা চাষিদের প্রতিনিধি। শ্রেণী সংঘাত যাতে না হয় সেদিকে তাঁরা নজর রাখবে। কৃষক সম্প্রদায়কে একটি সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত করাই বামপন্থীদের মূল লক্ষ্য। পৌষ্কন্ব সিংহরায়, সর্বানি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুলিকা রায় মনে করেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামপন্থীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে এক ধরনের বাম সংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। তাই বামপন্থীদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে অবসরের পরে জাতপাত রাজনীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। অরবিন্দ কুমার, অয়ন গুহ প্রমুখরা মনে করেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাম সংস্কৃতি ছিল। বাম ক্ষমতা রাজনীতির অবসান হলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাম সংস্কৃতির অক্ষয় ঘটবে না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতিকরণ ঘটার সম্ভাবনা নেই। জাতপাত সামাজিক একক হিসাবে কাজ করলেও রাজনৈতিক একক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না।

বামপন্থা একটি বহুল প্রচলিত রাজনৈতিক ধারণা। বাম রাজনৈতিক ধারণার প্রধান দুই প্রাণপুরুষ হলেন কাল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। এই দুই চিন্তাবিদের দর্শনকে মার্ক্সবাদ নামে অভিহিত করা হয়। মার্ক্সবাদের অনুসরণকারীরা কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। উপমহাদেশে কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত নীতি বাম রাজনীতি নামে পরিচিত। সাধারণ অর্থে মার্ক্স ও লেনিনবাদের নীতিতে বিশ্বাসীদেরকে বামপন্থী বলা হয়। তবে

বামপন্থী বলতে কাদের বোঝানো হয় তার সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা অভিধানে নেই। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে প্রথম বামপন্থী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফরাসি বিপ্লবে জাতীয়সভার প্রথম অধিবেশনে বামপন্থীরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে স্পিকারের বামদিকে বসে ছিলেন। তখন থেকে রাজনীতিতে 'বামপন্থী' শব্দের প্রচলন হয়। বর্তমান ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুযায়ী বাম থেকে ডানে বসার প্রথা প্রচলিত। বামপন্থী শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট নেতা অজয় রায় বলেন, রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে যাঁরা শ্রমজীবী ও গরীব মানুষের স্বার্থের অনুকূলে অবস্থান নেয় এবং সেজন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র পন্থাতেও ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তা যাঁরা অস্বীকার করেন না সাধারণত তাঁদেরই কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করা হয়।[1] সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে যারা শ্রমজীবী ও গরীব মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে থাকেন, তাঁদেরই বামপন্থী বলে অভিহিত করা উচিত।

উপমহাদেশে কমিউনিস্ট সংগঠন ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর রাশিয়ার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এম. এ. পার্সেস লিখেছেন, The emigration movement of Indian revolutionaries into the soviet Republic which took place in 1918-1922, yet mostly in 1920, was was all of the most interesting and striking indications of the effect which the great October socialist revolution had India.[2] শ্রীনিবাস গঙ্গাধার সরদেশাই লিখেছেন, And if history is to be written honestly and truthfully, if the purpose of history is to reveal truth and not to hide or destort it,.... It is clear beyound that we, in India, owe a deep debt to Lenin, the Russian revolution and the Soviet union for the charming up of our hearts and minds that took place in period.'[3]

---

[1] রায়, অজয়, বাংলাদেশ বামপন্থী আন্দোলন ১৯৭৪-১৯৭১, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪।

[2] Persists, M.A., Revolutionaries of India in Soviet Russia, Moscow, Progress Publishe, 1983, পৃ. ১৭।

[3] Sardesai, S.G. India and the Russian Revolution, Communist Party Publication, New Delhi, 1967, পৃ. ৭৩।

প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারতের কানপুর অধিবেশনে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল সেই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাম রাজনৈতিক ধারায় প্রথম দিকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাম রাজনীতিকে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩০ এর দশকে ভারতের রাজনীতির এক ব্যাপক পট পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৩৭ এর নির্বাচন-উত্তর অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হয়। জমিদার খাজনাভোগী ভদ্রলোকদের নিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের ভিত্তি তৈরি হয়। অন্যদিকে কৃষক, শ্রমিক ও জাতপাত ভিত্তিক নিচু জাতিকে নিয়ে জমিদার, জোতদারের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, শরণার্থী সমস্যা প্রভৃতি এই রাজনৈতিক পরিসরকে আরও জটিল করে তোলে। পরবর্তী সময় ভূমি সংস্কার আইন, ভূমি সংস্কার আইনের যথাযথ প্রয়োগ, খাদ্যের দাবি, পুনর্বাসনের দাবি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বামপন্থীরা তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্রমাগত অবক্ষয় এবং অন্যদিকে বামপন্থীদের উত্থান রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতপাত ভিত্তিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের ফলে রাজনীতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, খাদ্য, বাসস্থান, শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত একশ্রেণীর রক্ষাকর্তা হিসেবে বামপন্থীরা উঠে আসে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবতীর্ণ হয়। দেশ বিভাজনের ফলে জাতীয়তাবাদী মূলধারা থেকে বাংলার রাজনীতি কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্যের জন্য কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ভদ্রলোকের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে হিন্দু ব্যবসায়ী জমিদারদের নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস লড়াইয়ে হিন্দু মহাসভাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে

দেয়। ১৯৪৬ সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বাতাবরণ এবং শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০) এবং তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) যুক্তবাংলা গঠনের পরিকল্পনা বাংলার রাজনীতিতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলোকে সার্থক করার জন্য যে সমস্ত পন্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল, তা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল।[4] ষাটের দশকে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। অপরদিকে বামপন্থীরা বহুমুখী গণআন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় বাম রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করে। বিভিন্ন গণআন্দোলন বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন বিরোধিতা, বিচারে জেল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘট, ট্রাক ভাড়া বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি কমিউনিস্ট ও বিরোধীদের রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে সাহায্য করে।

গবেষণার পরিধি

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতের বামপন্থী রাজনীতির সূচনা লগ্নেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মার্ক্সবাদের চর্চা শুরু হয়। অবিভক্ত বাংলায় মার্ক্সবাদ চর্চা শুরু হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের সংবিধানে অবিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশকে পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে জাতপাতের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে জাতপাত ও শ্রেণী কিভাবে বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণাসন্দর্ভটিকে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি ও জাতপাত রাজনীতির চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সময়সীমা ১৯৭৭ কে ২০১১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে

---

[4] বেরা, অঞ্জন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, অন্যান্য সম্পাদিত জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ প্রথম খন্ড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. পৃ. ১২৩-১২৫।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নির্বাচনী রাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণীর রাজনীতিতে বামপন্থীরা কিভাবে জাতপাতের রাজনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেয়নি কিংবা স্থানীয় জাতপাতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ২০১১ সালে বামপন্থীদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে অবসরের পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সন্দর্ভে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রেণী চেতনা ও ক্ষমতার মূল রাজনৈতিক ধারায় 'জাতপাত' গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে ওঠার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় জাতপাত ও বাম রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ইতিপূর্বে জাতপাত বা জাতি নিয়ে যেসব গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত জাতির উৎপত্তি, বিকাশ ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। জাতপাতের সঙ্গে শ্রেণী কিংবা বাম রাজনীতির বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। বিভিন্ন গবেষক আলাদাভাবে জাতপাত রাজনীতি কিংবা বাম রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করলেও জাতপাত ও শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে চর্চার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। বলা যেতে পারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে তাঁরা বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। বাম রাজনীতি মূলত জাতপাত নিরপেক্ষ রাজনীতি হলেও রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে বাম রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাত নিয়ে গবেষণার যাত্রা শুরু হয় বুকানন হ্যামিলটনের হাত ধরে। পরবর্তী সময়ে মন্টোগোমারি মার্টিন, বুকানন জেমস টেইলর, এইচ. বেভারেলি জাতি ভিত্তিক পরিসংখ্যানের বিস্তারিত দলিল পর্যালোচনা করেন এবং জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঔপনিবেশিক আমলে এইচ. বেভারেলির বাংলার জাতি চর্চার বিষয়গুলি প্রাথমিক দলিল হিসেবেই গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে উইলিয়াম উইলসন হান্টার, জেমস ওয়াইচ, এইচ. এইচ. রিজলের হাত ধরে এই চর্চা বিস্তার লাভ করে। ১৯৩০ দশকে জাতপাত চর্চার অন্যতম হলেন জন হেনরি হুটন । তিনি

তাঁর *Caste in India: Its Nature, function and Origin* [5] গ্রন্থে মূলত ভারতের জাতপাতের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

নির্মল কুমার বসু তাঁর *হিন্দু সমাজের* গড়ন[6] গ্রন্থে ১৯৩১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে বাংলার প্রধান প্রধান জাতিগুলোর পেশা, সাক্ষরতার হার, নারী পুরুষের সংখ্যা ও তাঁদের পেশা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বাংলার জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পেশা, তাঁদের খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁদের জাতি পরিচয়কে তুলে ধরেছেন।

হিতেশ রঞ্জন সান্যাল[7] পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিম বাংলার জমিদার শ্রেণী ও ধনীশ্রেণীর মধ্য থেকে যে নেতৃত্ব উঠে এসেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের মুখপাত্র হিন্দু মহাসভা এবং তপশিলি হিন্দু গোষ্ঠী কর্তৃক ১৯৩৭ নির্বাচনে অংশগ্রহণ কংগ্রেসকে কোনঠাসা করে জাতপাতের রাজনীতির ভিত্তি স্থাপনের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই সময়ে গ্রাম অঞ্চলে কংগ্রেসের গণসংগঠন দুর্বল হতে থাকে এবং বামপন্থীদের সংগঠন ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্বে ভদ্রলোক শ্রেণী শুধুমাত্র কলকাতা ও শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ভারতছাড়ো আন্দোলনের মেদিনীপুর জেলার স্থানীয় ভূমি সম্পর্ক ও জাতি কাঠামো কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোট বদ্ধ করেছিল। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল ও বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বঙ্গ প্রদেশে কংগ্রেসের অবক্ষয় এবং জোতদার ভাগচাষিদের দ্বন্দ্বের সূত্রের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের শক্তির উত্থানের বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন।

শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ বাঙালি জাতি পরিচয়[8] গ্রন্থে বাঙালিদের ৪৮টি জাতির পরিচয় দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে গোত্র পরিচয়, পেশা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া তিনি এই

---

[5] Hutton, J. H., *Caste in India: Its Nature, function and Origin,* Oxford University Press, London, 1946.

[6] বসু, নির্মল কুমার, *হিন্দু সমাজের গড়ন*, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৪৮।

[7] Sanyal, Hitesh Ranjan, *Social Mobility in Bengal*, Papyrus, Calcutta, 1981.

[8] ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার, *বাঙালি জাতি পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৬৩।

জাতিগুলির জাতপাত ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বিশেষভাবে আলোকপাত করেন নি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতপাত রাজনীতির বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মধ্যে এ. কে মিত্র তাঁর *The Tribes and Castes of Bengal*[9], গ্রন্থে তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বাংলার বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে বাংলার জাতপাত ব্যবস্থার উৎপত্তি, সামাজিক গতিময়তা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। হিতেশ রঞ্জন সান্যাল Social Mobility in Bengal গ্রন্থে বাংলার জাতি ব্যবস্থার উৎপত্তি, জাতির সামাজিক গতিময়তা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এখানে জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উত্তরনের বিষয়ে তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। শতদল দাশগুপ্ত তাঁর *Caste Kinship and Community: Social System of Bengal Caste*[10] দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জাতপাত ভিত্তিক তপশিলি জাতিদের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি বাংলার তৃতীয় বৃহত্তম জাতপাত ভিত্তিক বাগদি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রসমীক্ষার তুলে ধরে বিভিন্ন রীতিনীতি, সংস্কৃতি, পারিবারিক প্রথা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর মার্ক্সীয় দর্শন ও সংস্কৃতি,[11] গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের কৃষি সমাজের শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় বাংলা রাজনৈতিক জমিদার শ্রেণী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শ্রমজীবী কৃষক সম্প্রদায়ের শোষণকারী হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবিভক্ত বাংলার জমিদার, জোতদার মহাজনদের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের ব্যাপক প্রাধান্য ছিল। হিন্দুরাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রদান করত। বর্ণ হিন্দুদের শ্রেণী স্বার্থের পরিপন্থী কৃষক, শ্রমিকরা কিভাবে ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন এবং তাকে কেন্দ্র করে যে কৃষি ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন।

---

[9] Mitra, A. K., *The Tribes and Castes of Bengal*, West Bengal Govt. Press, Alipore, 1953.

[10] Das Gupta, Satadal, *Caste Kinship and Community: Social System of Bengal Caste*, Universities Press, Hyderabad, 1986.

[11] উমর, বদরুদ্দীন, মার্ক্সীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর প্রান্তিক মানব[12] গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক গবেষণা। দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রাত্যহিক জীবনে টানাপোড়েন সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে উদ্বাস্তুর নীতির বিভিন্ন সমস্যা তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর প্রান্তিক মানব গ্রন্থের উদ্বাস্তুদের আর্থ-সামাজিক এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে ওঠা এবং সংগঠনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটেছে তা তিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিংশ শতাব্দীর বাংলার কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে গ্রাম অঞ্চলের জমির উপর অধিকার নিয়ে যে বিরোধ এবং তাকে কেন্দ্র করে যে ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেছেন। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অসম এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক নীতি কিভাবে ছোট ছোট ও মহাজনদের শিকার হয় এবং কিভাবে তাঁদের জীবন ধরনের উপকরনের উপর আধিপত্য কায়েম করে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

স্বরাজ বসু তাঁর *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*[13] গ্রন্থে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । রাজবংশীদের রাজনৈতিক আত্মপরিচয় ও উত্তরবঙ্গের তপশিলি জাতিদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে রাজবংশীরা তাঁদের আত্মপরিচিতিকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ক্ষত্রিয় সমাজকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজের ধীরে ধীরে রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটেছে।

মনোশান্ত বিশ্বাস 'বাংলার মতুয়া আন্দোলন: সমাজ-সংস্কৃতি রাজনীতি'[14] গ্রন্থে ৮টি অধ্যায়ে জাতপাত ভিত্তিক বাংলার মতুয়া সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মতুয়া ধর্মের তাত্ত্বিক আদর্শ মতুয়াদের সমাজ সংস্কার আন্দোলন সামাজিক জাগরণ এবং মতুয়া মহাসংঘকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি তার এই

---

[12] চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, প্রান্তিক মানব, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৪।

[13] Basu, Swaraj, *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*, Monohar, New Delhi, 2002.

[14] বিশ্বাস,মনোশান্ত, *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।

গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উত্তোরণের বিষয়টিকে আলোকপাত করেছেন। নমঃশূদ্র তথা তপশিলিদের সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিভাবে রাজনৈতিক উত্তোরণ ঘটেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

পার্থ চ্যাটার্জি ‘প্রেসেন্ট হিস্টরি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: এসেস ইন পলিটিকাল ক্রিটিসিজম’[15] গ্রন্থের বাংলার জাতির অবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তপশিলি জাতির রাজনৈতিক অবস্থান কে তুলে ধরেছেন। বাংলার জাতপাত ব্যবস্থা রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, বাউরি সম্প্রদায় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

উদয় চন্দ্র, জি. হেয়ার. স্টেট এবং কে. নিয়েলসেন সম্পাদিত ‘দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’[16] পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের ১১টি অধ্যায়ে জাতপাত রাজনীতি এবং মূলনিবাসী রাজনীতির পরিচিতি তুলে ধরেছেন। বাংলার প্রান্ত জনগোষ্ঠী কুম্ভকারের পরিচিতি এবং বাংলা রাজনীতিতে মতুয়া সম্প্রদায় কিভাবে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সর্বানি বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যানাদার হিস্ট্রি: ভদ্রলোক রেসপন্স টু দলিত পলিটিকাল অ্যাসেরশন ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল, এই প্রবন্ধে তিনি বাংলার তপশিলিরা কিভাবে ভদ্রলোকদের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে শোষিত হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য তার ‘কাস্ট ক্লাস এন্ড পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: কেস স্টাডি ইন বর্ধমান’ পশ্চিমবঙ্গের জাতি শ্রেণী ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ককে দেখেছেন। তিনি বর্ধমান জেলার রায়ান নামে একটি গ্রামের বাগদী সম্প্রদায় ও আগুরি নামে দুটি জাতির তুলনামূলক ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জাতি-শ্রেণী সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও শ্রেণীকে কেন্দ্র করে কিভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক আবর্তিত হয় তা তুলে ধরেছেন।

---

[15] Chatterjee, Partha , *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism,* Oxford University Press, Delhi, 1997.

[16] Chandra, Uday and Nielsen, Kenneth Bo, The Importance of Caste in Bengal in *Economic and Political Weekly Vol. XLVI No. 44,* November 3, 2012, পৃ. পৃ.৫৯-৬১।

পৌষ্কন্ব সিনহা রায় তার A New Politics of Caste'[17] প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বাম পরবর্তী সময়ে জাতপাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই প্রবন্ধে সম্মিলিতভাবে নমঃশূদ্র ও মতুয়া রাজনীতির নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন। তবে এই প্রবন্ধে বাম পরবর্তী সময়ে জাতপাত রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়টি তুলে ধরলেও শুধুমাত্র নমঃশূদ্র মতুয়াদের কথাই আলোকপাত হয়েছে যেখানে অন্যান্য তপশিলি জাতিদের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়েছে। সর্বানি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাস্ট পলিটিক্স ইন বেঙ্গল[18] প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হওয়া জাতি আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গর রাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে আলোকপাত করলেও নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য তপশিলিদের বিশেষ আলোকপাত করেন নি। রনবীর সমাদ্দার[19] তার 'হোয়াটেভার হ্যাপেন্ড টু কাস্ট ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় রাজনীতিতে কি ঘটেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু সমস্যা রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে ভূমিকা পালন করলেও তাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেনি এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নমঃশূদ্ররা একত্রিত হয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জেলাভিত্তিক জনগণের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তপশিলিদের একাত্ম হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। জাতপাত রাজনীতিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা অসম্ভব।

বি. টি রণদীপ তার 'শ্রেণী ও সম্পত্তির সম্পর্ক' গ্রন্থে মার্কসবাদীদের অবস্থানকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কমরেড বি.টি. রণদীপ এই বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কে সামনে রেখে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তার মতে তিনটি শক্তিশালী শ্রেণীস্বার্থ, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব জমিদারের প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করে এবং বর্ণ ব্যবস্থাকে রক্ষা কর্তা হিসেবে কাজ করে। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলি অনেক পদ্ধতিকে জাতপাত গত নিপীড়ন ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম পরিচালনা করে। কিন্তু জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলি জমির সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে

---

[17] Sinharay, Praskanva , A New Politics of Caste *in Economic and Political Weekly Vol. XLVII No. 34,* August 25, 2012, পৃ.পৃ. ২৬-২৭।

[18] Bandyopadhyay, Sarbani, Caste and Politics in Bengal in *Economic and Political Weekly Vol. XLVII No. 50,* December 15, 2012, পৃ.পৃ.৭১-৭৩।

[19] Samaddar, Ranabir, Whatever Has Happened to Caste in West Bengal in *Economic and Political Weekly Vol. XLVIII No. 36,* SePtember 7, 2013, পৃ.পৃ. ৭৭-৭৯।

মোকাবেলা করেনি। এটা আসলে জাতপাত বিষয়টিকে উপেক্ষা করে মূলত শ্রমিকদের বিভাজন এবং শ্রমবিভাজন নয় যা সিস্টেমের ঊর্ধ্বতন জন্ম ভিত্তিক এবং যা জনগণের ব্যাপক জনগোষ্ঠী থেকে পবিত্রতা ও বৈধতা অর্জন করে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য মার্কসবাদী পদ্ধতির এটি একটি অত্যন্ত সৃজনশীল প্রয়োগ। এই বইটি মূলত বর্ণ ব্যবস্থায় শ্রেণী বিভাজনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তেমনি ভূমিসংস্কার, শ্রম ব্যবস্থা ভেঙে যায় তা আলোচনা করেছেন।

দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য্য, 'পলিটিক্স অফ মিডিলনেস: দা চেঞ্জিং কারেক্টর অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল', প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়ন কৃষির পরিবর্তন, এবং বামফ্রন্টের সম্মিলিত রাজনীতি বুঝতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণী দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য এবং বামেদের কৃষি অর্থনীতির ভিত্তি অনেকটাই সাহায্য করে। ভট্টাচার্য্য যুক্তি দিয়েছেন যে সি.পি.আই (এম)-র রাজনীতি কি দ্বন্দ্বের রাজনীতিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বিভিন্ন বিভাগের স্বার্থের সঙ্গে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক স্বার্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে শ্রমিকদের মজুরের প্রশ্ন শ্রমিক ও মালিকদের দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব নিরসনের পার্টির ভূমিকা কি এবং পার্টি কিভাবে মধ্যস্থতার রাজনীতির সাহায্যে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্যাকে সমাধান করেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ভট্টাচার্য মূলত গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার মজুরির হার নির্ধারণ বামপন্থীদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন।

অরবিন্দ কুমার ও অয়ন গুহ, দ্য পলিটিক্যাল ফিউচার অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল[20], প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী রাজনৈতিক সংস্কৃতির আধিপত্য তুলে ধরেছেন যা জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির জন্য ইতিবাচক নয়। বাংলার প্রভাবশালী বামপন্থী রাজনৈতিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব মূল ধারার কোনো রাজনৈতিক দলের নীতি ও বামপন্থী মতাদর্শকে বিলীন করতে পারে না। ফলে মূল রাজনৈতিক ধারায় জাতপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। এই প্রবন্ধে বাম ধর্মনিরপেক্ষ ভদ্রলোক সংস্কৃতির প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত নির্ণায়ক ভূমিকা হতে পারে না। বাম পরবর্তী সময়ে তাই জাতপাত রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে না বলেই যুক্তি প্রদান করা হয়।

[20] Kumar, Arvind and Guha, Ayan , Political Future of Caste in West Bengal, *Economic & Political Weekly*, August 9, 2014 Vol xlix No 32.

সুমন্ত ব্যানার্জীর[21] 'মার্কসিজম এন্ড দা ইন্ডিয়ান লেফট; ফ্রম ইন্টারপ্রেটিং ইন্ডিয়া টু চেঞ্জিং ইট', নামক গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে বামপন্থা ও বামেদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা তার প্রবন্ধাবলীর সংকলন। তিনি তাঁর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কিভাবে বামপন্থী মতাদর্শকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে। এবং বামপন্থাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী রাজনৈতিক ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। অমিত ভট্টাচার্যের 'সিঙ্গুর টু লালগড় ভাইয়া নন্দীগ্রাম: রাইজিং ফিলমস অফ পিপল আণ্ডার ডিসপ্লেসমেন্ট, ডেস্টিনেশন অ্যান্ড স্টেট টেরর' নামক গ্রন্থটিকে তিনি লালগড় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন।[22] এই সময়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিষয়গুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন। বস্তুতপক্ষে বামেদের শিল্পায়নের নীতি ও কৃষি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে কিভাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং গণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাম সরকার কিভাবে গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই বিষয়ে তিনি তুলে ধরেছেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশলের বিষয়টিকে আধুনিক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির গোড়াপত্তন, ক্ষমতায়ণ, বাম রাজনৈতিক কৌশল স্বরূপ শ্রেণী রাজনীতির আধিপত্য, ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও প্রচ্ছন্ন জাতপাত কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করাই এই-গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই-সন্দর্ভে জাতপাত রাজনীতি, জাতিভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন ও তাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি, রাজনৈতিক ক্ষমতার্জন এবং বামপন্থী শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি কীভাবে রাজনৈতিক কৌশল অর্জন করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক উত্তরণ ও বহুমুখীন রাজনৈতিক প্রবাহে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কীভাবে জাতপাতকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার বিবরণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাম ক্ষমতার অবসানের পরে

[21] Banerjee, Sumanta , Marxism and the Indian Left: From 'Interpreting' India to 'Changing' it Purbalok Publication, Kolkata, First edition, 1 January 2012.

[22] ভট্টাচার্য,অমিত, সিঙ্গুর টু লালগড় ভাইয়া নন্দীগ্রাম: রাইজিং ফিলমস অফ পিপল আণ্ডার দিস্প্লেসমেন্ট, দেস্টিটিউশন অ্যান্ড স্টেট টেরর, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের রাজনীতির সম্ভাবনা বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের মতামতও এখানে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্নাবলী

সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে বর্তমান সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন—

১. পশ্চিমবঙ্গে বামরাজনীতির উদ্ভবে আন্তর্জাতিক তথা ভারতীয় ঘটনাপ্রবাহ কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল?

২. বাম দলগুলো সাধারণত শ্রেণীর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। জাতপাত কিংবা অন্যান্য বিষয়কে উপরিসৌধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থনীতিকে মূলভিত্তি করে বাম রাজনীতি পরিচালিত হয়। শ্রেণী রাজনীতিকে সামনে রেখে বামেরা জাতপাত রাজনীতিকে কী উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল?

৩. বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত ও সংগঠিত গণআন্দোলনকে 'শ্রেণী রাজনীতি'র কৌশল হিসাবে গণ্য করা কতটা যুক্তিযুক্ত? একই স্বার্থ ও অভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে শ্রেণীকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গণ্য করা বামেদের কি সঠিক পদক্ষেপ ছিল?

৪. পশ্চিমবঙ্গে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বামেরা কৃষক, শ্রমিক ও সর্বহারাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তবে প্রকৃতপক্ষে বামেরা কী সফলভাবে গ্রামীণ স্তরে একটিমাত্র জোটবদ্ধ শ্রেণী তৈরিতে কী কৌশল গ্রহণ করেছিল?

৫. বাম সংস্কৃতিমনস্ক ভদ্রলোক শ্রেণী কিভাবে শ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করেছিল এবং এই শ্রেণী ভিত্তিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আদৌ কী জাতপাত রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল?

৬. বামেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কী বাম সংস্কৃতি ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির অবক্ষয় হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত রাজনীতির প্রবণতা বাড়বে?

আলোচ্য সন্দর্ভে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য বাংলার জনগণনার পরিসংখ্যান, বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ারের তথ্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন আত্মচরিত গ্রন্থ এবং

জাতপাত ভিত্তিক সংগঠনগুলোর পত্রপত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একইসাথে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনার এর বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও জার্নাল থেকে প্রকাশিত তথ্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাকে যুক্তিনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক নেতাদের সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন বামপন্থী নেতাদের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, বামপন্থী দলগুলোর রাজনৈতিক ইশতেহার, লিফলেট, ঘোষণাপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় (বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলা) ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য মুখ্য উপাদান হিসেবে এই গবেষণা সন্দর্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। গৌণ উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পুস্তক, রাজনৈতিক নেতাদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ, আত্মজীবনী, বিভিন্ন প্রজেক্ট রিপোর্ট, বিভিন্ন গবেষকদের সংগৃহীত তথ্য এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এই গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণে মুখ্য ও গৌণ দুধরনের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) প্রকৃতির। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক নথিপত্র হিসেবে বামপন্থী সংগঠনগুলোর ও বামপন্থী দলগুলোর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, পার্টি'র বিভিন্ন প্রোগ্রাম, পার্টির দলিলপত্র, জনগণনার তথ্য, পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জনগণনার তথ্য, সরকারি নথিপত্র, নির্বাচন কমিশনের তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নদীয়া ও কোচবিহার জেলার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। মূলত নৃতাত্ত্বিক (এথনোগ্রাফি) পরিকাঠামোকে সামনে রেখে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক জাতপাত ও বামেদের কৌশল পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ স্তরের পঞ্চায়েতে কিভাবে কার্যকরী হয় তা পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় মানুষজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পঞ্চায়েত প্রধান, পার্টি মেম্বার, ও স্থানীয় জাতপাত নেতাদের উন্মুক্ত সাক্ষাৎকারের নেওয়া হয়েছে। এইভাবে আমার গবেষণায় এম্পিরিক্যাল (Empirical) পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণাসন্দর্ভে জাতপাত, শ্রেণীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিকস্তরের রাজনীতিতে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় সামাজিকও রাজনৈতিক কাঠামো বোঝার জন্য নির্বাচনী রাজনীতির তথ্য ও জাতীয় রাজনীতির তথ্যকে প্রান্তিক স্তরে অনুধাবন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রান্তিকস্তরের সামাজিক একক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থান, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্ব গবেষণা সন্দর্ভটি রচনায় সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দলীয় মুখপাত্র পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন সময় ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভটির উপাদানগুলি কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় উন্নয়ন পর্ষদ লাইব্রেরী, পৌণ্ড্র মহাসংঘ, কোচবিহার জেলার রাজবংশী ভাষা পরিষদ লাইব্রেরি, রাজবংশী ক্ষত্রিয় পরিষদের লাইব্রেরী, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলার নমঃশূদ্র ও মতুয়া সংগঠনের বিভিন্ন পত্রিকা এই গবেষণা সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে সাহায্য করেছে।

অধ্যায় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ও মতাদর্শগত অবস্থান। কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ ভিত্তিক কর্মসূচি, ভারতীয় প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রসার এই আলোচনায় উঠে এসেছে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান কি? রাষ্ট্র, সরকার সম্পর্কে রাজনৈতিক অবস্থান, ভারতে অর্থনৈতিক ধারণায় কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান, ভারতের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী ইশতেহার, নির্বাচনী রাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত রাজনৈতিক অবস্থান এই বিষয়গুলি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও ১৯১৭ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব এই সমস্ত বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সংগঠন ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ, ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন ও বামপন্থী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা

তথ্যবহুলভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান কি ছিল তাও জানা যাবে এই আলোচনায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতির প্রেক্ষিত। এখানে আলোচিত হয়েছে নানাবিধ দিক, যেমন- পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান; পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতির প্রভাব, সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতপাতের ভূমিকা; জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থান; পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া ও জাতপাতের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান। একইসাথে আলোচনায় উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে শ্রেণীর ধারণা। বামপন্থী পার্টির শ্রেণীভিত্তিক গণসংগঠন; নির্বাচনী রাজনীতিতে শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক কৌশল; অর্থনৈতিক নিরিখে শ্রেণীর অবস্থান ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীর উদ্ভব। গ্রামীণ রাজনীতিতে কৃষক সম্প্রদায়কে অভিন্ন শ্রেণী হিসেবে উদ্ভব; জমিদারি প্রথা বিলোপের মধ্য দিয়ে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অবসান এবং ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণী রাজনীতির প্রবর্তন সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বামপন্থীদের ভূমিকা, ১৯৬৪ সালে সি. পি. আই. (এম.) পার্টির উদ্ভব ও কর্মসূচির মত বিষয়গুলি। এর মধ্যে প্রধান ছিল ১৯৫২ সালের নির্বাচনী রাজনীতিতে বামপন্থীদের অবস্থান, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে কংগ্রেস বিরোধী হিসেবে বামপন্থীদের অবস্থান, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের নির্বাচনী রাজনীতিতে বামপন্থীদের অবস্থান, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭সাল পর্যন্ত ক্ষমতার রাজনীতিতে আসার আগে পর্যন্ত বামপন্থীদের বিভিন্ন গণ আন্দোলন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত শাসক হিসেবে বামপন্থীদের রাজনৈতিক দলের অবস্থানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। একইসাথে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে বামপন্থীদের গণসংগঠনের ভূমিকা, ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিকসহ সংগঠনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে রাজনৈতিক কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থীদের রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে জাতপাতের রাজনীতিকে কিভাবে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। বামপন্থীরা ধর্ম, জাতপাত প্রভৃতিকে উপরিসৌধ

হিসেবে বিবেচনা করে। বাম রাজনীতিতে অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বামেদের দীর্ঘ শাসনকালে কিভাবে জাতপাত কে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং জাতপাত কে মূল স্রোতের রাজনীতিতে একত্রীকরণ করতে দেয়নি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির যেভাবে জাতপাতের রাজনীতি মূল নির্ণয় ভূমিকা হিসেবে পালন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির প্রভাবে কিভাবে জাতপাতের রাজনীতি নির্ণায়ক ভূমিকা হয়ে উঠতে পারেনি সে সম্পর্কে বিশদে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও বাম সংগঠনের জাতপাতের নেতাদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে কৌশলগতভাবে দূরে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়, সত্তরের দশকে গণআন্দোলনকে হাতিয়ার করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের দলীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে উদ্যত হয়েছিল। জাতপাতের রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে এক ধরনের ভদ্রলোক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। ক্ষমতার অলিন্দে নেতৃত্বদানে এই ভদ্রলোক শ্রেণী নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করত। কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের ত্রুটি বিচ্যুতি সামনে এনে জনসম্মুখে ভদ্রলোক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে পড়েন। বামপন্থী দলের সংগঠনে এই ভদ্রলোক শ্রেণী নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং দলীয় সংগঠনে বিশেষ করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদীয় রাজনীতির উচ্চ শিখর পর্যন্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক কৌশল বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের স্তরে প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক সংগঠকদের সাথে প্রান্তিক স্তরে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। লোকসভা নির্বাচনে ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশলের পর্যবেক্ষণ, বিধানসভা নির্বাচনে ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশলের পর্যবেক্ষণ এবং পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা আধিপত্যের অবসান এর ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়, সুদীর্ঘ ৩৪ বছর শাসনে জাতপাত রাজনীতি খুব একটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি এই অভিমত যে নীতিগতভাবে সমর্থন করা যায়না, তা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পরিষ্কার হয়ে যায়। বামফ্রন্ট প্রথম থেকেই সুকৌশলে জাতপাতের বিষয়টি শ্রেণী চেতনার মোড়কে ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে জাতপাতের রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছে। বাম সংস্কৃতিকে বজায় রেখে শ্রেণী রাজনীতিকে জাতপাতের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়েছে।

গ্রামীণ রাজনীতিতে শ্রেণী ও জাতপাত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন এবং কিভাবে রাজনীতিতে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বামফ্রন্ট দীর্ঘ শাসনের ফলে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতি নির্ণায়ক ভূমিকা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বাম সংস্কৃতি কিভাবে এই জাতপাতের রাজনীতিকে মূল স্রোতের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পশ্চিমবঙ্গে বামপরবর্তী সময়ে জাতপাত রাজনীতির সম্ভাবনা কতটা রয়েছে সেই বিষয়ে একটা ধারনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণাসন্দর্ভের সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি ও জাতপাতের রাজনীতি কখনোই সহজ, স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে নি। বিভিন্ন সময় নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেই বাম রাজনীতি ও জাতপাতের রাজনীতি প্রবাহিত হয়েছে। কখনো অন্য দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জাতপাতের রাজনীতি আন্দোলিত হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির মধ্যে জাতপাত বিষয়ক তথ্য খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

ভারতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব রাজনৈতিক উত্তরণের প্রথম দিককার প্রকাশনার নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলোর নিজস্ব কোন প্রকাশনা না থাকায় এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতি বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তার কারণ হলো জাতপাত রাজনীতির তেমন কোন নেতৃত্ব বা 'নিয়মিত মুখ' নেই। জাতপাত রাজনীতির নেতাগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে কোন জাতপাত ভিত্তিক চেতনা নেই। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দীর্ঘদিন ধরে অপ্রকাশিত ও অনিয়মিত হওয়ায় তা জোগাড় করা খুবই সমস্যার। এছাড়া অধিকাংশ সময় কমিউনিস্ট বামপন্থীদের কার্যকলাপ গোপনে চলে। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় এবং তা সংরক্ষণের অভাবে বাম রাজনীতি ও জাতপাতের রাজনীতি নিয়ে গবেষণা চলাকালীন অনেক মূল্যবান দলিল পত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ও জাতপাত সংগঠনগুলোর যে দলিল প্রকাশিত হয়েছে কিংবা যেসব দলিল গবেষণার ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অধিকাংশই হয়তো তারিখ বিহীন না হয় প্রকাশক ও প্রকাশক সংস্থার নাম অনুপস্থিত। বেশকিছু দলিলপত্রের বিশেষ করে জাতপাতের দলিলের বিশেষ ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। জাতপাত ও বাম রাজনীতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় উপকরণ হলো স্মৃতিচারণ মূলক রচনা। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদদের আত্মজীবনী লেখার রেওয়াজ প্রচলিত থাকলেও তা অনেকটাই কম। এদেশে বাম রাজনীতির উত্থান ও বিকাশের পর্বে জড়িত নেতারা গোপনে পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। সেসব বর্ষিয়ান নেতারাও পার্টির কর্মকাণ্ড ও নীতিনির্ধারক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তেমন কিছু লেখেননি। গবেষণা করার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে। বিশেষ করে জাতপাত রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জাতপাতের নিজের জাতপাতের নেতাদের মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী দলগুলোর কর্মকাণ্ড অধিকাংশ সময়ে পরিচালিত হয়েছে গোপনে। অর্থাৎ জনগণ ও সরকারের দৃষ্টির আড়ালে। এর ফলে পার্টিগুলোর অনেক কর্মকাণ্ড অজানা থেকে গেছে।

জাতপাত রাজনীতির রাজনৈতিক দলগুলোর ও বিভিন্ন সংগঠনের নিজস্ব সংগ্রহশালার অভাব রয়েছে। পত্র পত্রিকা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতপাত ভিত্তিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই সচেতন ছিল না। জাতপাত ভিত্তিক সংগঠনগুলোর নিজস্ব রাজনৈতিক দল ও নিজস্ব সংগ্রহশালা না থাকায় বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গবেষণার একটি বড় সমস্যা। বাম দলগুলোর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বুকলেট, লিফলেট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পোস্টার দলীয় কমিটির সমূহের বিবরণ ইত্যাদি সহ দলীয় যেসব দলিলপত্র বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই সংগ্রহশালায় নেই। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সমূহের অপ্রতুলতা রয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসকল লাইব্রেরী রয়েছে সেখানে স্থানীয় বাম রাজনীতির উপর তেমন কোনো সংগ্রহ নেই। পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্টের অপ্রতুলতা রয়েছে। বাম রাজনীতির উপর গবেষণার ক্ষেত্রে পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্টের অধিকাংশই জানা সম্ভব নয়। করোনা পরিস্থিতি গবেষণার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে লাইব্রেরী, গোয়েন্দা রিপোর্ট, আর্কাইভ, ফিল্ড সার্ভের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেই বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাম রাজনীতির উদ্ভব, বিকাশ ও ঐতিহাসিক পটভূমি

সোভিয়েত রাশিয়ার যুগান্তকারী রুশ বিপ্লবের সাফল্যে মার্কসবাদ, লেনিনবাদের প্রতি সারাবিশ্ব আকৃষ্ট হয়। বামপন্থী রাজনীতি 'আলোকবর্তিকা' হয়ে দেখা দেয়। ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীরা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরাধীন ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী মতাদর্শ দ্বারা শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভাবধারা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই-অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে। অবিভক্ত বাংলা এবং পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সংসদীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাম রাজনৈতিক শ্রেণী আন্দোলনের উত্তরণ কিভাবে ঘটেছিল সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। জমিদার, জোতদার, খাজনা ভোগী, ভদ্রলোকদের মূল রাজনৈতিক দল ছিল কংগ্রেস। এই কংগ্রেস দলের আধিপত্য কিভাবে ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছিল তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে জমিদার, জোতদার এবং ভাগচাষীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক চাষী, ভাগ চাষী, শ্রমিক, উদ্বাস্তুদের মধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। প্রশ্ন হল কংগ্রেসের ব্যাপকভাবে জনশক্তি হারানোর কারণ কি? কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা না আদর্শের সাথে বাস্তব পরিস্থিতির বিরোধ? এই অধ্যায়ে তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকার বিরোধী গণ আন্দোলনগুলির রূপরেখা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

বাম রাজনীতির ধারার উদ্ভব

ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লবের বা মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবীর অন্যান্য ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের মতো ভারতেও বাম রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন কিংবা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাম রাজনীতির উত্থান ঘটেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় মুসলিম লীগও বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতের মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলো

শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী, মানুষের কথা না ভাবায় বামপন্থী আদর্শে প্রভাবিত হয়ে একটি তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা হয়। যারা ছোটো জমিদার, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ছোটো জমিদার, শিল্পশ্রমিক, কৃষকদের নিয়ে একটি অভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যদিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। যার মূল নিয়ন্ত্রক ছিল বিপ্লবী বামপন্থীরা যারা পরবর্তী সময়ে ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই রাজনৈতিক দল গঠনে তৎকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার মূল প্রেরণা ছিল ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লব। ১৯১৭ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সংঘটিত বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক রুশ বিপ্লবের পর্ব সমাপ্ত হয়। এই বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। এই বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের নিপীড়িত, শোষিত ও পরাধীন জাতির মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই বিপ্লবের পূর্বেই 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৪ সালে প্রথম ১৫ই আগস্ট এই-সংস্থার এক সাধারণসভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মার্কস এবং এঙ্গেল।[1] রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। সেইসময় অন্যান্য দেশের মতো ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয়-কংগ্রেসে (জুলাই-আগস্ট, ১৯২০) ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় নিয়োজিত হয়।[2] ভারতের মতো উপনিবেশিক দেশে কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে প্রবাসী কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পিছনে দুটি মতের প্রচলন আছে। সি.পি.আই বলে ১৯২৫ সালে এই পার্টি গড়ে উঠেছিল, আর সি.পি.আই.(এম.) এর মত হল ১৯২০ সালে তাসখণ্ডে এই পার্টি গড়ে উঠেছিল।[3] সি.পি.আই.(এম.) সহ বাম দলের একটি অংশ মনে করেন যে, প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে তাসখণ্ডে যে দিন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল সেই দিনই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। সি.পি.আই(এম) প্রবাসে গড়েওঠা কমিউনিস্ট পার্টিকেই মান্যতা প্রদান করেন।

---

[1] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০।

[2] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ১৯।

[3] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* পৃ. ২২।

অন্যদিকে সি.পি.আই ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টি যে দিন গড়ে উঠেছিল সেই দিনকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিন বলা হয়।

ভারতীয়দের উদ্যোগে ভারতের বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ভারতের বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির নাম ছিল 'তুর্কিস্থানের কমিউনিস্ট পার্টি'।[4] তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এবং ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল ১৯২৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর কানপুর অধিবেশনে। যেখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়, যার প্রধান কার্যালয় হয় বোম্বেতে।[5] যদিও ১৯২৪ সালে সেপ্টেম্বরের কানপুরে কমিউনিস্টরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তবে ভারতের বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে পড়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা পর্বের পথিকৃৎ হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মনে করা হয়। তিনি তৃতীয় 'কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজাফ্‌ফর আহাম্মেদ বলেন— আমরা ১৯২১ সালের তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা ভারতের নেতারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।[6] পরবর্তী সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে সেই সময় বিদেশে অবস্থানকারী কয়েকজন ভারতীয় এবং তাঁদের সহযোগীদের চেষ্টায় বিদেশের মাটিতে এর সূত্রপাত ঘটে।[7] পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শাসন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এই কাজকে আরো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

---

[4] আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ১৯২০-২৯, এন. বি. এ.,কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ.-৪২ ।

[5] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ.২৪।

[6] আহমেদ, মুজাফফর, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ ১৯২১-১৯৩৩,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ১৮।

[7] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৩।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো বৃহৎ রাজনৈতিক দল থাকতে কমিউনিস্ট পার্টি ও বাম রাজনীতির ধারায় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন কেন হল? এ-প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠন ছিল বৃহৎ জমিদার, জোতদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল। ছোটো জমিদার, জোতদার, ছোটো পুঁজির মালিক এবং কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় তাঁদের আগ্রহ ছিল না বলে মার্ক্সবাদীরা মনে করেন। ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে শূন্যস্থানের তৈরি হয় যা ভারতীয় বামপন্থীরা পূরণে সক্ষম হয়। প্রবাসী ভারতীয়রা বিদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুজাফফর আহমেদের ভাষায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি ১৯২০ সালে বিদেশে স্থাপিত হয়েছিল এবং এই ভিত্তিস্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাসখন্দ কমিউনিস্ট পার্টিতে সাত সদস্যের কমিটি হয়েছিল। এঁরা হলেন (১) এম. এন. রায়., (২) এভেলিনা ট্রেন্ট রায় (এম.এন.রায়ের স্ত্রী), (৩) অবনী মুখার্জি, (৪) রোজা ফিটিংহফ (অবনী মুখার্জির স্ত্রী), (৫) মোহাম্মদ আলী, (৬) মোহাম্মদ শরিফ সিদ্দিকী, (৭) এম প্রতিবাদী আচার্য বা মান্ডায়াম পার্থ সারথি তিরুমালা আচার্য।[৪] যদিও ১৯২৯ সালে পার্টির সাথে মতভেদের কারণে এম.এন.রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' অন্যান্য সংগঠন হতে বহিষ্কৃত হন। এম.এন.রায় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার হলেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার আর্থ-সামাজিক পটভূমি

১৯২০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যখন চালাচ্ছিলেন তখন 'তাসখণ্ডে' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। সারা ভারত জুড়ে তখন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান হয়। এইসময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও বাংলায় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়। মুজাফফর

[৪] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৪।

আহমেদ জানিয়েছিলেন— বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্ম পদ্ধতিকে আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু তাঁদেরও বড়ো অবদান আছে। সেই অবদানকে ও তাঁদের বলিদানকে কে না শ্রদ্ধা করে পারেন?[9] ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের বৃহৎ আয়তন শিল্পের যাত্রা শুরু।[10] ব্রিটিশ ভারত জুড়ে যে শিল্প গড়ে তুলেছিল তাঁর শ্রমিক সংখ্যা বাড়তে থাকে। এছাড়াও রেল শ্রমিকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ভারতের সর্বত্র অকৃষি পেশা বৃদ্ধি পাওয়ায় অসংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। নতুন নতুন কারখানা স্থাপন, সরকারি চাকরিতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর যোগদান শ্রমশক্তি ও অর্থনীতির পরিবর্তন এনেছিল। এইসময় ইউরোপ ও আমেরিকার মতো দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হয়। যদিও সেখানে পুঁজিবাদী বিকাশ হচ্ছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হচ্ছিল, কিন্তু ভারতে কোনও সমাজতান্ত্রিক সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি।[11] এছাড়া ভারতের নরমপন্থী জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের ব্রিটিশদের প্রতি নরম মনোভাব বাম রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিল। এক্ষেত্রে ১৯০৫ সালে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন নরমপন্থী থেকে বেরিয়ে এসে যে চরমপন্থী রূপ নেয় এবং ধীরে ধীরে বংলার বাইরে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই গণআন্দোলন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখরা মনে করেন যে— জনগণ জেগে উঠেছে, স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত। এক্ষেত্রে নরমপন্থীরা এবং ব্রিটিশরা উভয়ই শত্রুসম।

ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংশোধন করে ব্রিটিশ শাসকরা ঢাকার *অনুশীলন সমিতি,* বরিশালের *স্বদেশ বান্ধব সমিতি,* ফরিদপুরের *ব্রতী সমিতি,* ময়মনসিংহের *সুহৃদয়* এবং *সাধনা সমিতি* ইত্যাদি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[12] ব্রিটিশ সরকার একদিকে দমনপীড়ন ও অন্যদিকে মর্লে-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার শুরু করেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালে ভারতের

---

[9] আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. ১৫।

[10] Shirokov, G.K., *Industrialization of India, Progress Publishers*, Kolkata, 1973, পৃ.২০।

[11] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ১৮।

[12] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০,পৃ. পৃ. ১২৬-২৭।

শ্রমিকরা বর্ধিত বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবি করে প্রতিবাদ ও ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করেন।[13] এতে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থই নয় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব ছিল। ফলে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে ভারতের কৃষকদের দুর্দশাও চরম আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ শিল্প দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ছিল তার চেয়ে অনেক কম। ফলে কৃষি ও কৃষকদের জীবনে এক গভীর দুর্দশা নেমে আসে।

কৃষকরা প্রায় জমিদারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কৃষিজমিতে ভূমিহীণ চাষির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই-সময় কৃষকরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে এবং কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। বামপন্থী নেতারা কৃষকদের নিয়ে বামপন্থী রাজনীতির প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কমিউনিস্ট নেতা ও লেখক আমজাদ হোসেনের মতে— ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বড়ো বড়ো জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণ ভারতীয় সমাজের ক্রমবর্ধমান ভাঙন ও দৈন্য দশা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, বিভিন্ন শোষক শ্রেণীর শোষণ ও নির্যাতন, শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও তার ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা ইত্যাদি বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

প্রথমদিকে ভারতের শ্রমিক ধর্মঘট সমূহ নিজস্ব স্বার্থ ছাড়া কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব দেখা যায় নি। ১৯১৮-১৯১৯ সময়কালে শ্রমিক ধর্মঘটে শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা ও শ্রেণী সংহতির প্রতিফলন দেখা যায়। ফলে তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকদের মুনাফা শতকরা ২৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প শতকরা ২০০ থেকে ৪০০ ভাগ পর্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অর্জিত মুনাফা দিয়ে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি দুটি বড়ো বড়ো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করে ভারতীয় মিল মালিক ও ব্রিটিশ পুঁজির মালিকগণ কোনো ভাবেই শ্রমিক শ্রেণীর বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে রাজি ছিল না, ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভারতীয় পুঁজি

[13] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৩।

পরিচালিত বস্ত্রশিল্পে সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ১৬ হাজার এবং বস্ত্রশিল্পের নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে বেড়ে ২ লক্ষ ৮০ হাজার হয়।

এছাড়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, গদরপার্টি, হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন সহ ভারতের অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলো সন্ত্রাসের পথ পরিত্যাগ করে শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থবাহী বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়।[14] ১৯২০ সালে প্রথম টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে।[15] ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই বামপন্থী আন্দোলনের ও রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তুত হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক পটভূমি

ভারতের বামপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব রয়েছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের 'লেলিহান বাণী' সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতও তার বাইরে ছিল না। লেনিন এর নেতৃত্বে সফল এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করে। জাতীয় ও বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমান অধিকার এবং নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি জানায়। এই-সময় ভারতের রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

প্রথমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবলমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচি প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের প্রথম শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবীগণ জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে বিপ্লবী কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তৃতীয়ত, রাশিয়ায় সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটকালে শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে

---

[14] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২০৯।

[15] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৫।

শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। এই শ্রমিক আন্দোলন ভারতের শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। লালা লাজপত রায়ের মতো জাতীয় নেতারা এ-সময় ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উদ্যোগী হন।[16]

চতুর্থত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের একটি অংশ ভারতের বাইরে গিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার চেষ্টা চালায়। কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হলে তারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারায় আকৃষ্ট হয়। প্রবাসে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বরকত উল্লাহ, প্রমুখের কার্যকলাপ ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।[17]

ভারতের সামাজিক জীবনে ও বিপ্লবীদের মধ্যে রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব পড়ে। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন নেতৃত্বাধীন ছিল তারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৯২০ সালে 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ঔপনিবেশিক নিবন্ধ গৃহীত হয়। এই-নিবন্ধ বা থিসিসে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একাত্ম প্রকাশ করে, এবং সংগ্রামরত মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামরত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীগণ প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে এবং বামপন্থী আন্দোলন সূচনা করে। তাঁদের মধ্যে ২০০ জন কাবুল পৌঁছান। তাঁদের থেকে ৩১ জন তাসখণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এলেন এবং ২১ জন শেষপর্যন্ত মার্কসবাদ অধ্যায়নের জন্য ও বিপ্লবের কাজে যুক্ত হতে পূর্ব মস্কোর ইউনিভার্সিটি অফ টয়লার্স-এ গেলেন।[18] রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও শিল্প শহরে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ চালায়। ১৯২৪ সালে বামপন্থী কার্যকলাপ চালানোর জন্য মুজফফর আহাম্মেদ, এস.এ.ডাঙ্গে, শওকত ওসমানকে

---

16 চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২০৬।

17 চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৭।

18 মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও আমরা,* পৃ. ২১।

গ্রেফতার করা হয় এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারভেলু চ্যাটিয়ার সভাপতিত্বে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সর্বপ্রথম সম্মেলন আহব্বান করা হয়।[19] ভারতের বামপন্থী নেতাগণ এই সম্মেলনে ভারতের রাজনৈতিক দল গঠনের এবং রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ১৯২৬ সালের শেষ ভাগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়।[20] কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতাদের ও কমিউনিস্ট দেশের সহযোগিতা নেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়।[21]

তাসখন্দ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের পর তাসখণ্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ভারতের বাইরের বিপ্লবীদের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের রাজধানী 'তাসখন্দ'। এর প্রধান কারণ হলো ভারতীয় বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে যোগাযোগে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সুবিধা। ১৯১৫ সালে কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ বিপ্লবীদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে এবং অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।[22] ১৯১৯ সালে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সোভিয়েত-আফগান যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর জন্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট সরকারের কাছে আবেদন জানায়। কাবুলের ভারতীয় অনেক বিপ্লবীগণ রাশিয়াতে তাদের প্রতিনিধি

---

[19] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৪২

[20] আহমেদ, মুজাফফর, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ ১৯২১-১৯৩৩,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ২১।

[21] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৪।

[22] দেবেন্দ্র, কৌশিক, *আধুনিক মধ্য এশিয়ার ইতিহাস আদি উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল,* মস্কো প্রগতি প্রকাশন, পৃ. ১৪৫।

পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। কাবুলের ভারতীয় বিপ্লবীগণ এই প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। দেশ থেকে উৎখাত হওয়া ভাই শান্তক সিং এবং রতন সিংকে তাঁরা ১৯২০ সালে মস্কোতে পাঠিয়ে লেনিনের সাথে দেখা করতে বলেন। রাশিয়ার বিপ্লবের দ্বারা তাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন এবং ফিরে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে গৃহীত কর্মসূচি অনুসারে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[23] আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় বিপ্লবীদের ২৮ জন সদস্যের আরেকটি বড়ো প্রতিনিধি দল কাবুল থেকে মস্কো পৌঁছান ১৯২০ সালের জুলাই মাসে।[24] ১৯২০ সালে নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির আহ্বানে সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা তীব্রভাবে হিজরত বা মুজাহির আন্দোলন শুরু করেন। সেইসময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এর উদ্যোগে ১৯২০ সালে তাসখন্দে এম.এন.রায়ের নেতৃত্বে কয়েকজনের একটি গোষ্ঠী নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। যার বেশিরভাগ সদস্যই ছিল 'মুজাহির' এবং যার সম্পাদক হলেন মোহাম্মদ শফিক।[25] তাসখন্দ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং হিজরত আন্দোলনের যোগদানকারী এসব তরুণেরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[26] এবিষয়ে এম.এন.রায় তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে— এই অল্প সংখ্যক মুজাহির যুবকের ভিতর ইসলাম সম্বন্ধে যতটা উন্মদনা ছিল ঠিক ততটাই উন্মাদনা তাঁদের মধ্যে এসে গেল কমিউনিজম সম্বন্ধে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তখন যখন এই যুবকদের ভিতর হতে কয়েকজন এসে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমাকে জানান। অন্যরাও জানতে চাইলেন কেন আমরা এখনই এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করব না? সেই সময় কাবুল হতে একটি ছোট্ট দল এসে পড়ায়, যুবকদের পার্টি সংগঠনের দাবি আরো জোরদার হয়ে পড়ল। এই ছোট্ট দলের লোকেরা কাবুলেই নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই দলে ছিলেন আব্দুর রব, ভারত থেকে আগত আচার্য এম.পি.বায়ান কর, মোঃ শরীফ সিদ্দিকী প্রমুখ। একদল

---

[23] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. ২০।

[24] দেবেন্দ্র, কৌশিক, *আধুনিক মধ্য এশিয়ার ইতিহাস আদি উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল,* মস্কো প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৬, পৃ. পৃ. ১৪৬-১৪৭।

[25] সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. ২১।

[26] চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৯।

প্রতিনিধি ‘কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল’ এর তুর্কিস্তান গুরুর নিকটে হাজির হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার দাবি পেশ করলেন। আমি তাঁদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এত তাড়াহুড়ো করার কি দরকার আছে? ভারতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত। ক’জন মাত্র মুজাহির এসে নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে ঘোষণা করে দেওয়ার কোন মানে হয় না। এ কথাগুলো শুনে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। আমি ভয় পেলাম যে এই অভিজ্ঞতা তাঁদের মন ভেঙে দিতে পারে। কাজেই আমি কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করার প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমি জানতাম এই পার্টি নামে শুধু পার্টি হবে যদি আমি তো জানতাম যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অংকুরের কাজ এই পার্টি করতে পারবে। মোহাম্মদ শরীফ পার্টি'র সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।[27] তাসখন্দে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার প্রথম দিকে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ হয় নি। তা সত্ত্বেও **১৯২১** সালে পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, **১৯২৪** সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, এবং **১৯২৯** সালে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশদের বাধা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে পৃথক কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে। রণেন সেন লিখেছেন— অন্য প্রদেশের তুলনায় বোম্বাই, বাংলা ও মাদ্রাসা কম্যুনিস্ট আন্দোলন আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয় ও বাড়তে থাকে।[28] অর্থাৎ প্রথমে এলাকা ভিত্তিক পৃথকভাবে এবং পরে কেন্দ্রীয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়।

বাংলার বাম রাজনীতি

রুশ বিপ্লবের পরবর্তী সময় **১৯২০** থেকে **১৯২৯** পর্যন্ত সময়কে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থানের সময়কাল হিসেবে ধরা হয়। এইসময় অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট মতাদর্শ ভিত্তি করে বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার এইসময় দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে বাংলায় শক্তভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে। **১৯২০** থেকে **১৯২৯** সাল পর্যন্ত

---

[27] আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* **১৯২০-২৯**, এন. বি. এ.,কলকাতা, **১৯৬৯**, পৃ.পৃ. ৩৯-৪০।

[28] সেন, রণেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিবৃত্ত,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, **১৯৯৬**, পৃ. ১২।

সময়টি ছিল বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের উন্মেষকাল। কমিউনিস্টদের প্রতি ব্রিটিশ দমন-পীড়ন চললেও বাংলার যুবশক্তি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজদের পরাজিত করার স্লোগান তোলে।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মুজাফফর আহমেদ। **১৯২০** সালের **১২ই** জুলাই মুজাফফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলাম মিলিতভাবে *নবযুগ পত্রিকা* চালু করেন।[29] এইসময় বাম ভাবনার পত্রিকার মাধ্যমে প্রথমদিকে বাংলার শ্রমিক, কৃষক ও যুব শক্তির মধ্যে বাম মতাদর্শ বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পত্রিকায় কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ-বিষয়ে মুজফফর আহাম্মেদ নিজেই বলেন নবযুগ কাগজ পরিচালনার মধ্য দিয়ে আমার মন খানিকটা মজুরদের সমস্যার প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।[30]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও রাজনৈতিক মতাদর্শ স্থাপনের ভীত তৈরি করে। শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যা ও তাদের আত্মচেতনা বাম রাজনীতির চেতনার ক্ষেত্র তৈরিও করেছিল। এইসময় বাংলার ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অত্যাচার, শোষণ ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলে শ্রমিকদের নিজস্ব শ্রেণীর সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্নপ্রান্তে প্রকাশিত কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বামপন্থীরা প্রচার অভিযান শুরু করে। **১৯২০** সালের **৬** নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। **১৯২২** সালের **২২** শে এপ্রিল ব্রিটিশদের নির্দেশে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে প্রকাশিত সাম্যবাদী পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থ ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[31] ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে

---

29 আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ১৯২০-২৯, এন. বি. এ.,কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭১।

30 আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ১৯২০-২৯, এন. বি. এ.,কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৪।

31 দাশগুপ্ত, অবিনাশ, *লেনিন রুশ বিপ্লব ও বাংলা সংবাদ সাহিত্য,* কলকাতা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২।

বিপ্লবীরা ছিলেন তাঁরা বামপন্থী পত্রপত্রিকা ভারতে ও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানোর চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রভাব বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলোকে প্রভাবিত করে। ১৯২০ সালে অনুশীলন সমিতি কমিউনিজমকে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে।[32] বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গুপ্ত-সমিতিগুলো সক্রিয়ভাবে বামপন্থী মতাদর্শকে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে বামপন্থার প্রসার করতে থাকে। পরে যুগান্তর দলের অনেক বিপ্লবীও কমিউনিজমকে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। তাসখন্দের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।[33] তাসখন্দের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এম.এন.রায়-এর প্রতিনিধি হিসেবে নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালে ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় আসেন এবং ১৯২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলায় বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলার কম্যুনিস্ট ভাবধারার বিদ্বজনদের সঙ্গে দেখা করেন।

মুজাফফর আহমেদ কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন।[34] বাংলা বিপ্লবী সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁদের প্রতিনিধি মস্কো পাঠান। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কমরেড মুজাফফর আহমেদ, কমরেড আব্দুল হালিম, ড. অতুল গুপ্ত, হেমন্ত সরকার প্রমুখ। কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলার প্রথম কম্যুনিস্ট সংগঠন হলো 'ওয়ার্কার্স এন্ড প্রেজেন্ট পার্টি অফ বেঙ্গল'। এই সংগঠনটি ধীরে ধীরে বামপন্থীদের আদর্শগত সংগঠন হিসেবে রূপ ধারণ করে।

---

[32] চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯০।

[33] চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯৫।

[34] আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ১৯২০-২৯, এন. বি. এ.,কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. পৃ. ৮৪-৮৫।

১৯২৫ সালের ১লা নভেম্বর এই সংগঠনটি সাংগঠনিক রূপ নেয়।[35] এছাড়া বিপ্লবী সংগঠনের অনেক তরুণ নেতা কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও কম্যুনিস্ট ভাবধারার সংগঠন ছিল। 'দ্যা লেবার স্বরাজ পার্টি অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' যার প্রধান মুখপাত্র 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে কম্যুনিস্ট ভাবধারার প্রচার করত। *লাঙল* পত্রিকায় বামপন্থীরা ভারত তথা বাংলার শ্রমিক কৃষকদের পুঁজিবাদী বিরোধী সংগ্রাম তুলে ধরতে থাকেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় নব গঠিত *The Labour Party of Indian National Congress* এর ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছিল।[36] এই ইশতেহারে বামপন্থী নেতাগণ ভারতের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের সংঘটিত করে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের মুখপাত্র হল 'গণবাণী'। ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট মুজাফফর আহমেদ এর উদ্যোগে 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়।[37] মুজফফর আহমেদ ও আব্দুল হালিম বিভিন্ন পেশাতে যুক্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের জমায়েত করে কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[38] এইসময় ভারতীয় বিপ্লবীদের কিছু অংশ বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছেড়ে মার্কসবাদী চর্চায় নিয়োজিত হয়। এছাড়া অনুশীলন পার্টি ভেঙে যারা সেদিন মার্কসবাদ চর্চায় সক্রিয় হয়েছিলেন তাঁরা হলেন গোপাল চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, মণি সিংহ, গোপাল বসাক, পিয়ালি দাস, নলেন্দ্র সেন, নিরব চক্রবর্তী ও জ্যোতির্ময় শর্মা প্রমুখ এসব তরুণ কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেয়।[39]

কংগ্রেস নেতারা ছিল সমাজের উঁচু তলার ভদ্রলোক শ্রেণীর উচ্চবর্ণীয় মানুষ। তাঁদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নিপীড়িত কৃষক শ্রমিক ও প্রান্তিক শ্রেণীর দাবি উপেক্ষিত করেছিল। এই শ্রমিক কৃষকদের বামপন্থী সংগঠনগুলো সংগঠিত করার রাজনীতিতে তথাকথিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হ্রাস পায়। এই বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণী এবং শ্রমিক-কৃষক

---

[35] চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪।

[36] *লাঙল প্রথম খন্ড বিশেষ সংখ্যা ১৬ ই ডিসেম্বর,* কলকাতা, ১৯২৫, পৃ.পৃ. ১১-১৩।

[37] মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩৪।

[38] সেন, রণেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিবৃত্ত,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬।

[39] সেন, রণেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিবৃত্ত,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬।

নেতৃত্বাধীন নেতাদের পার্থক্য ছিল এই যে প্রথাগত আবেদন-নিবেদন রাজনীতির বাইরে গিয়ে আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করা। মুজাফফর আহমেদ এর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠিত হয় 'লেবার স্বরাজ পার্টি অফ ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস'। মতাদর্শগত রূপান্তরের মাধ্যমে পরবর্তীতে গঠিত হয় 'পেজেন্ট এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল'।

ভারতীয়দের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশদের কাছ থেকে আদায় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে সংগঠিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিতে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ অনেক কমে যায় এবং এক শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সমাজের এই শিক্ষিত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীও বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। বাংলার পার্টির বেশিরভাগ অংশ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আসা।[40] এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল ছোটো জমিদার, জোতদার, ছোটো পুঁজির মালিক এবং কৃষক শ্রমিকের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য যেমন ছিল তেমনি রাজনীতিতেও ভিন্ন ভূমিকা ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে নতুন বাম ও ডান রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটে।

'স্বরাজ পার্টি অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস' সংগঠনটি কমিউনিজম ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে 'পেজেন্ট এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল'-এ রূপান্তরিত হয়। এমতাবস্থায় এম.এন.রায়ের নির্দেশে ধরণী গোস্বামীর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির একটি উপদল তাঁদের অস্তিত্ব বিলীন করে ১৯২০ সালের শেষের দিকে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন।[41] বিপ্লবী সমিতিগুলো ও বিপ্লবীদের কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে আন্দোলন সংগঠিত করা। নব যোগদানকৃত কমিউনিস্ট কৃষক শ্রমিক

[40] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২২০।

[41] গোস্বামী, ধরণী, 'বাংলা তথা ভারতের কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ও পার্টি গড়ার প্রথম পর্ব' উদ্ধৃত *কমিউনিস্ট কলকাতা সি. পি.আই. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা,* ১৯৭৫, পৃ. ১৪৫।

আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত করে। প্রথমে তারা কাজ শুরু করেন চটকল শ্রমিকদের মধ্যে।[42]

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা সম্মেলনে সারা ভারত শ্রমিক কৃষক পার্টি (অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার অ্যান্ড পেজেন্ট পার্টি) গঠিত হয়।[43] শ্রমিক কৃষক পার্টির নির্দেশে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পার্টির সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হতে শুরু হয়। ১৯২৮ সালের মার্চ এপ্রিলে ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত পার্টি তৃতীয় কংগ্রেসে 'পেজেন্ট ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল' এর পরিবর্তে পার্টির নতুন নামকরণ করা হয় 'ওয়ার্কার এণ্ড পেজেন্টস পার্টি অফ বেঙ্গল'।[44] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টির সংযুক্তকরণ ও পার্টির নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় কমিউনিস্টদের শাখা সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে 'অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার এন্ড পেজেন্টস পার্টি' গঠিত হলে 'ওয়ার্কার্স এন্ড প্রেজেন্ট পার্টি অফ বেঙ্গল' তার শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ শুরু করে। ধরণী গোস্বামীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ইয়ং কমরেড লীগ'।[45] শাখা সংগঠনের কর্মীদের সক্রিয়ভাবে বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তাঁদের মধ্যে বাম মতাদর্শ প্রচার করা হয়। এই 'ইয়ং কমরেড লীগ' শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে 'স্টাডি সার্কেল' চালু করে।[46] ১৯২৭ সালে কৃষক শ্রমিক দলের প্রথম সম্মেলন হয় কলকাতা। ১৯২৭ সালে গড়ে ওঠে ছাত্রসংগঠন। শ্রমিক ও কৃষক সমাবেশ ও সম্মেলনগুলির পাশাপাশি ১৯২৯ সাল ও ১৯৩০ সালের প্রথম ছয় মাস জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র যুবদের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলনের প্রস্তুতি চলে। এই সম্মেলনে ভূপেন দত্ত প্রমুখ

---

[42] চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯২।

[43] মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭১।

[44] সেন, রণেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৪।

[45] মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫৫।

[46] চট্টোপাধ্যায়, কুনাল, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.২৬।

নেতারা উপস্থিত থাকতেন এবং সমাজতন্ত্রবাদের কথা প্রচার করেন।[47] ১৯২৯ সালের শুরু থেকে 'ওয়ার্কার এন্ড পেজেন্টস পার্টি' পরিবর্তিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলার বিভিন্ন জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে মূলত তিরিশের দশকে। বিভিন্ন ছোটো ছোটো গ্রুপ একত্রিত হয়ে ১৯৩১ সালের প্রথমেই আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি গঠিত হয়। সাতজন সদস্যকে নিয়ে এই কলকাতা কমিটি প্রথমে গঠন করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল হালিম, (সাধারণ সম্পাদক) রনেন সেন, অবনী চৌধুরী, অখিল চ্যাটার্জী, রমেন বসু প্রমুখ কয়েকজন।[48] ১৯৩৩ সালে ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলায় প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয়। হুগলি জেলার কমিটি গঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৫ সালে হাওড়া জেলা, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলার কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলার সব জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত বিভাগ পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার বাম ধারার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৩ জন। সেই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৩ সালে ২০০ জন, ১৯৩৬ সালে ৬০০ জন, ১৯৩৯ সালে ১৫০০ জন, ১৯৪২ সালে ৪৪০০ জন।[49] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তথা বাম রাজনীতি তেমন কোনো সহজ-সরল পথে গড়ে ওঠে নি। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্টগণ গোপনে তাঁদের কার্যকলাপ চালাতেন। শ্রমিক কৃষক এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্রিটিশরা ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ১৯৩৮ সালে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় চন্দননগরে।[50] এইসময় অবিভক্ত

---

[47] মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২২।

[48] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৫।

[49] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪।

[50] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ.২৯।

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০ জন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারতছাড়ো আন্দোলনকালে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সাথে কমিউনিস্টরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠার পর দুই দশক এই পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং বৈধ পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[51] অনেকেই ধারণা করেন যে, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই সময় তাঁদেরকে দেশদ্রোহী ‘রাশিয়ার দালাল’, ‘সাম্রাজ্যবাদের চর’, ইত্যাদি অপবাদ মাথায় নিতে হয়।[52]

দেশবিভাগের পর বাম রাজনীতির গতিধারায় নানা কৌশল লক্ষ্য করা যায়। এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে বাংলার ২৬টি জেলার মধ্যে ২৪ জেলাতেই তেভাগা আন্দোলন বিস্তার লাভ করে এবং প্রায় ৬০লক্ষ চাষী এতে অংশ নেয়। সরকার ‘দমন-পীড়ন নীতি’ গ্রহণ করায় এই আন্দোলনে ৮৬ জন নারী পুরুষ নিহত হন, ১০ হাজার আহত এবং ৩ হাজার মানুষ কারারুদ্ধ হয়।[53]

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পর ১৯টি বৈধ দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে সারা ভারতে প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিটি আসনে নির্বাচন সংঘটিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র ১০৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়। বাংলা থেকে ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা হলেন জ্যোতি বসু, মণি সিংহ, ওয়ালীনেওয়াজ, রূপনারায়ণ রায়, কৃষ্ণবিনোদ রায়, কল্পনা দত্ত, ব্রজেন দাস, রতনলাল

---

51 মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, *স্বাধীন সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশ চরিত্র তাৎপর্য,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২২।

52 বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১২২।

53 দাস, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা পুনর্বিবেচনা,* নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১।

ব্রাহ্মণ, চতুর আলী, সোমনাথ লাহিড়ী, বঙ্কিম মুখার্জি, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ। এই নির্বাচনে বামপন্থীদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ প্রাদেশিক নির্বাচনে কমিউনিস্টদের এক দিকে যেমন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। সারা ভারতে অনেক কমিউনিস্ট নেতা জয়লাভ করেন। বাংলা থেকে রূপনারায়ণ রায়, জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ জয়লাভ করেন। দার্জিলিং চা-বাগান শ্রমিক কেন্দ্রের প্রার্থী রতনলাল ব্রাহ্মণ, রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্রের প্রার্থী জ্যোতি বসু এবং দিনাজপুরের কেন্দ্রের প্রার্থী রূপনারায়ণ রায় এই তিনজন নির্বাচনে কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজয়ী হন।[54] ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গা রোধে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ১৬-১৮ আগস্ট এই তিন দিনে ৫হোজার নির্দোষ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছে ১০ সহস্রাধিক লোক। এর ফলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ব্যাহত হয়। কৃষক আন্দোলনের নেতা ও প্রাক্তন সি.পি.আই.(এম.) নেতা হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এই প্রসঙ্গে বলেছেন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কৃষক আন্দোলনকে যে বড়ো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তা হল হিন্দু মুসলমান বিরোধ। এটা কৃষকদের ঐক্য ও শ্রেণী চেতনার মধ্যে একদিকে জমিদার বিরোধী আর একদিকে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রাক্কালে এক নির্বাচনী ইস্তেহারে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল যে— কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র পার্টি যে, মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং মুসলিম লীগকে আহ্বান করিতেছে কংগ্রেস লীগ কমিউনিস্টদের মিলিত অভিযানের ভেতর দিয়া পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য সফল করিতে পারে।'[55]

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাভাগকে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে বাংলাভাগে বাঙালি জাতির

---

[54] মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫১৮।

[55] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ.পৃ.৩৯৭-৪২২।

ধ্বংস হবে।[56] বামপন্থীদের মতে বাংলাভাগে বাঙালি জাতির বিভেদ সূচিত হবে। পার্টির অভিমত ছিল স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা সম্ভব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেসের আনন্দ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেন যে তাঁরা অনুগত বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করবে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি উপমহাদেশে বি.টি.রণদীপের অতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করেন। বি.টি রণদীপের অতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু অতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে পার্টি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। রণদীপের সশস্ত্র রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ তথা হঠকারী কার্যকলাপের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা কার্যকর করতে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মারাত্মক শিশু সুলভ বামপন্থী হঠকারী ভুল করা হয়।[57]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে কমিউনিস্টদের বিভিন্ন বিপ্লবী লেখাপত্র প্রকাশিত হয়। কলকাতার মহম্মদআলী পার্কে বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। রণদীপের থিসিসের মূল কথা ছিল ১৯৪৭ সালে ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করেছে সে স্বাধীনতা ভুয়ো। এই স্বাধীনতা ভারতের বুর্জোয়ারা বিশেষত বৃহৎ বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে আপসের দ্বারা এভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা সে আপোষের পথেই আছে। ১৯৫০ সালে রাজেশ্বর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় বিপ্লবী লাইন পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫২ সালে প্রাদেশিক বর্ধিত সভায় মণি সিংহকে সম্পাদক করে দশ জনের কমিটি করা হয়। প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত সভায় রণদীপের সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণকে 'মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি' বলে স্বীকার করে নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ভারতে বুর্জোয়া বিপ্লব বিলম্বিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব পরিসরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেছে। অতএব গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একত্রে ভারতের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক

---

[56] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪০৫।

[57] সিংহ,মণি, *জীবনসংগ্রাম,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৯১

বিপ্লবের চরিত্র গ্রহণ করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছে। সংস্কারবাদী সে পথ পরিত্যাগ করে পার্টির বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া জরুরী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তখন বলা হয় যে যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেছে এবং এ যুদ্ধ হলো জনযুদ্ধ।[58] পার্টির পক্ষ থেকে এই সময় আহ্বান জানানো হয় 'Make the Indian people play the people's role in the people's war'।[59] নবচেতনা প্রাপ্ত জনগণও সে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। ১৯৫০ সালের প্রথমদিকে কমরেড রণদীপের লাইনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে বাংলার বামপন্থীরা গণআন্দোলনের পথ গ্রহণ করে বাংলার শ্রমিক কৃষকদের একত্রিত করে। বাংলার শ্রমিক, কৃষকদের একত্রিত করে উচ্চবিত্ত কংগ্রেস ব্যতিরেকে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার প্রসার ঘটাতে থাকে। গণআন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার বামপন্থী গণভিত্তি গড়ে ওঠে। কংগ্রেস নিষদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৬৪ প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতা দখল এবং চিন রাশিয়াপন্থী কেন্দ্র করে সপ্তম কলকাতা কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে।

পর্যবেক্ষণ

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বাইরে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠায় প্রবাসী ভারতীয় এবং ভারতের কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিপ্লবী ও কমিউনিস্টরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ শাসকদের প্রবল প্রশাসনিক চাপ থাকা সত্ত্বেও অদম্য চেষ্টায় ও শ্রেণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠায় অবিভক্ত বাংলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে এম.এন.রায় প্রবাসীদের নিয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ

---

[58] হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৩।

[59] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৩।

করেন। অবিভক্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে মুজাফফর আহমেদের হাত ধরে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরের কম্যুনিস্টদের কিছু অংশ নিয়ে অবিভক্ত বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতপাত ও শ্রেণীর ধারণা, প্রকৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতি

ভারতীয় সভ্যতার বহমানতা সুপ্রাচীন। এই সভ্যতার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে আবার বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যও রয়েছে। কালের প্রবাহে বিভিন্ন সময় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটেছে। ভারতীয় সভ্যতায় নানান দেশের, নানান ধর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির শাসকরা এখানে এসেছেন। ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে একত্রীকরণ করেছেন। কখনো কখনো বহিঃশক্তিরা এখানে বণিক হিসেবে এসেছেন। কখনোও আবার যাযাবর হিসেবে ভূ-খণ্ড দখল করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছেন। সভ্যতার ধারাবাহিকতায় কখনো কখনো জীবন, সংস্কৃতি, সামাজিক বিবর্তনের নানা বৈচিত্র্য এসেছে। আবার কখনো এরা রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে এবং দৈনন্দিন প্রবাহে ধর্ম, জাতি, বর্ণের নানা চাপ ও সামাজিক অবস্থান, জীবনযাত্রা প্রক্রিয়া, আচার-আচরণ, রীতিনীতি মানদণ্ড একেবারে ভারতীয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময় শাসক শ্রেণী তার রাজনীতির জন্য ধর্ম, জাতি, বর্ণ ব্যবস্থাকে ক্ষমতার লড়াইয়ের চালিকাশক্তি হিসেবে সাজিয়েছেন ।

ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতগুলির সামাজিক গঠন, অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইতিহাসে অনেক চর্চা হয়েছে। এইঅধ্যায়ে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণী, জাতপাত, শ্রেণী আন্দোলন, জাতপাত ও শ্রেণীর সম্পর্ক, শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জাত ব্যাবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে জাতি এবং শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কী? বিভিন্ন জাতির সামাজিক গতিময়তার সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কী এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গের আত্মপরিচিতি রাজনীতির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতিরা বিভিন্নভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস শাসনকালে ও বামফ্রন্টের শাসনে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এঁদের অপরিসীম রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, জাতিভিত্তিক

আত্মপরিচিতি নির্মাণ ও সামাজিক আন্দোলনে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চর্চায় জাতপাত ও শ্রেণীর রাজনীতি চর্চার উদ্ভব হয়েছে। এছাড়া বামপন্থীরা জাতপাত ও শ্রেণীকে কীভাবে পর্যালোচনা করেন সেই সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জাতপাত রাজনীতির ধারণা

ভারতীয় তথা বাংলার সংস্কৃতিতে জাতপাত এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। স্বাধীনতা-পূর্বে ও স্বাধীনতার পরে বাংলার বিভিন্ন শাসকবর্গ জাতপাত, ধর্ম রীতিনীতিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন। ভারতের এই জাতপাত, বর্ণ ব্যবস্থা নতুন নয়। এর এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই এর নমুনা পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতের বিশ্লেষক সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করেন যে— আর্যরা ভারতে বেদ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা হয়তো খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি কোন সময় এখানে পৌঁছায়।[1] ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় ভারতের জাত ব্যবস্থা, জাতি কাঠামো ও বর্ণ ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭২ ও তারপরে ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে সর্বপ্রথম বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, জীবিকা ধরন, রীতি-রেওয়াজ ছাড়াও জাতি কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন জাতির অবস্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে কিছু কিছু প্রান্ত জাতির মানুষের মধ্যে নিজ নিজ জাতির সামাজিক অবস্থান তথা সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় জাতপাত ভিত্তিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।[2]

জাতি ও জাতপাতের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Caste and Casteism। এই Caste শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'কাস্ট' (casta) থেকে। ‘কাস্ট’ শব্দটির অর্থ হলো ‘জাতি’ বা ‘কুল’ প্রভৃতি। তবে ভারতে জাতি শব্দটি সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা ব্যবহার করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেছেন— The word caste Owes it's origin to the the Spanish word 'casta' which means breed, race strain or a complex of hereditary qualities. The Portuguese applied this tearm to the classes of people in India known by the name of 'jati'। জাতপাত হল জন্মভিত্তিক। সুতরাং জন্মভিত্তিক বলেই জাতি হল অপরিবর্তনীয়।

---

[1] ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *আর্যরা: সংহিতা যুগ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১,* গাংচিল, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৫।

[2] ব্যানার্জি দুবে, ঈসিতা, সম্পাদিত, *কাস্ট ইন হিস্ট্রি,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি, ২০০৮।

জাতপাতের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ‘অন্তর্বিবাহ’। মজুমদার ও মদন তাদের *আন ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল এনথ্রপলজি* শীর্ষক গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর মত অনুসারে জাতপাত হলো ‘একটি বদ্ধগোষ্ঠী’।

জাতি ব্যবস্থার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। তবে জাতি ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে এ-বিষয়ে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ এডমন্ড লীচ (১৯৬০) জাতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, বংশ পরম্পরায় কুলীন পেশা অবলম্বন, সমকুলে বিবাহ, ভোজন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ অনুসরণ এবং অস্পৃশ্যতা। সমাজবিজ্ঞানী এস.সি.দুবের মতে— ‘কাস্ট’ বা ‘জাতি’ শব্দটির ব্যবহারের মধ্যেই বিভ্রান্তি রয়েছে। তাঁর মতে ইংরেজিতে জাতি অর্থে ‘Caste’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'কাস্ট' শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর অর্থেই ব্যবহৃত। কখনো এটি বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থানে রয়েছে এবং সবর্ণে বিবাহ করে এমন গোষ্ঠীকে ‘জাতি’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এছাড়া কোনো কোনো বড়ো গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসা ছোট্ট গোষ্ঠীকেও একই অভিধা দিতে দেখা যায়।[3] অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন অর্থ বোঝাতে ‘জাতি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যে গোষ্ঠীর মানুষজন নিজেদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখে, অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ করে, সমাজে যাঁদের জন্য আচরণবিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, ঐতিহ্য মেনে নিজেদের গোষ্ঠীর পেশায় যুক্ত থাকে, তাঁদেরকে ‘একটি জাতি’ বা ‘জাত’ হিসেবে অভিহিত করা উচিত। তাঁর মতে এ ব্যাপারে দুটি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত, তিনটি উচ্চ বর্ণকে তাঁদের জাতিবাচক নামে অভিহিত করা হত। সুতরাং জন্মভিত্তিক বলেই জাতি হল অপরিবর্তনীয়। মজুমদার ও মদন তাদের *‘আন ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল এনথ্রপলজি* শীর্ষক গ্রন্থে জাতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর মতানুসারে জাতপাত হলো একটি বদ্ধ গোষ্ঠী। যদিও জাতি আসলে বর্ণের উপবিভাগ মাত্র। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু জাতিগুচ্ছের একটি নাম থাকে, শুধু নামের আগে পিছে অতিরিক্ত পরিচয় যোগ করে ওই জাতিগুচ্ছের অন্তর্গত নির্দিষ্ট জাতিটিকে সনাক্ত করা হয়।[4] প্রায় ৩ হাজার বছর আগে গুণ ও

[3] দুবে, এস. সি., *ভারতীয় সমাজ,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩।

[4] দুবে, এস. সি., *ভারতীয় সমাজ,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৭।

কর্মানুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাজন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। হার্বার্ট হোপ রিজলি বর্ণ ব্যবস্থায় অন্তর্বিবাহের উল্লেখ করেছেন। অন্তর্বিবাহের নিয়মগুলিই এই বর্ণ প্রথার মূল ভিত্তি।[5] তবে বর্তমান সময়ে যে জাতপাত ব্যবস্থা (Caste System) ও তার উপজাত (Sub Caste) ব্যবস্থা রয়েছে বর্ণ ব্যবস্থায় তাদের নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে জাতপাত ও উপজাতপাতগুলোকে একটি ধারণার মধ্যে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। জাতপাত ও বর্ণ ব্যবস্থার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবিক সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অন্যদিকে বর্ণ ব্যবস্থায় ধারণামূলক নকশার মধ্যে সাধারণ মানুষ সর্বভারতীয় পদমর্যাদার ধারণা স্বীকার করে। স্থানীয় জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে তা গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নয়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাত চর্চা আরো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে লুই ডুমো এবং পোকক 'জাতি' ব্যবস্থার উপর দুই ধরনের আলোচনা করেন। একটি হলো গ্রন্থভিত্তিক আলোচনা এবং অন্যটি হলো সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা।[6] ব্রিটিশ শাসনকালে বিভিন্ন আধিকারিকরা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে জাতপাত ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। এই চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁরা আদর্শ হিন্দু সমাজের রূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। মূলত ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে যাঁরা জাত ব্যবস্থাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাঁদের যুক্তি হল ধর্মের শক্তি জাতিগুলিকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে এক বিরাট বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখে।

১৯৫০ এর দশক থেকে আদমশুমারি ও গেজিটিয়ার সমীক্ষার ভিত্তিতে জাতপাত ভিত্তিক ধারণাগুলির বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন এম.এন. শ্রীনিবাস এবং ম্যাককিম মেরিয়ট। বাঙালি গবেষকদের মধ্যে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়, নৃতাত্ত্বিক নির্মল কুমার বসু, সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

---

[5] ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, (অনুবাদ) *প্রাচীন ভারতে বর্ণশ্রেণী ও জাত,* ছোয়া, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৮১।

[6] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. ৮।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এফ.এফ.জি বেইলী, আন্দ্রে বেতেই, স্কারলেট, ক্যাথলিন গফ্ প্রমুখের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষ সমীক্ষা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সকল সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয় জাতপাত ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করেন। লুই ডুমো দাবি করেন জাতি ব্যবস্থার আদর্শ রূপের সঙ্গে যথার্থ রূপের সামঞ্জস্য সব সময়ই বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় না। নিম্নবর্গের মানুষেরা প্রায়ই এই তথাকথিত সর্বজনীন ধর্মের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যদিও সেই প্রতিরোধের মধ্যে প্রান্তিকতার বিষয়টিও উপেক্ষা করার মতো নয়। এই ভাবেই বাস্তব সামাজিক ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে বিবৃত হয় জাতি সম্পর্ক।[7] লুই ডুমোর এই তত্ত্ব কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আন্দ্রে বেতেইরা মনে করেন যে— জাতি ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন লুই ডুমো।

জাতপাত বিষয়ক অন্যতম গবেষক এম. এন. শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে জাতিপ্রথা হলো নিঃসন্দেহে এক বিশেষ সর্বভারতীয় ব্যবস্থা। এই অর্থে এরমধ্যে সকলেরই জন্মসূত্রে স্থান নির্ধারিত হয়। জাতপাত সম্পর্কিত আলোচনায় এম. এন. শ্রীনিবাস কর্মের ধারণা ও ধর্মের ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মফল অনুসারে একজন হিন্দু কোনো বিশেষ একটি জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। আবার ধর্মের ধারণা অনুসারে জাতপাতের মধ্যে কতগুলি কর্তব্যবিধি বা নিয়মাবলীর উপর জোর দেওয়া হয়। জাতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ধর্মের ধারণা উঁচু-নিচু ভেদাভেদকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে জাতপাত ব্যবস্থার মূল পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাও বর্তমান থাকে। এই ‘পবিত্র’ ও ‘অপবিত্র’র ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয় জাতপাতের সম্পর্ক। সনাতন ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি ছিল জাতপাত ব্যবস্থা। জাতপাতই ছিল সমকালীন ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী। বলা হয় যে, এদেশে জাতিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে বৈদিক যুগে। রবার্ট স্টাইন তার *চেঞ্জিং ইন্ডিয়া* গ্রন্থে Caste is the warp and woof of Indian civilization and India's civilization is the warp and

[7] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. ১০।

woof caste।[8] ভারতের রাজ্যস্তরে রাজনীতি এবং স্থানীয় রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোনো অঙ্গরাজ্য জাতপাতের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তবে বিশেষ কয়েকটি রাজ্যের রাজনীতিতে জাতপাতের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ভাবধারার অনুকরণ, পশ্চিমী ভাবধারার অনুকরণ, সাংস্কৃতিক অনুকরণ, ধর্মনিরপেক্ষ রীতিনীতি অবলম্বন প্রভৃতির মাধ্যমে জাতব্যবস্থার উত্তরণ ঘটছে। এছাড়া পশ্চিমী শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে শুধুমাত্র সাংবিধানিক অধিকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতপাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকটা বেড়েছে। শুধুমাত্র শ্রেণী উত্তরণের মধ্য দিয়ে এই জাতপাত গোষ্ঠীকে সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। শ্রেণী চেতনার মধ্য দিয়ে ক্রমেই তাঁদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি, অর্থনৈতিক সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের (Social Justice) দাবি। জাতপাতের এই উত্তরণ বিভিন্ন সময় ভারতের রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনৈতিকরণ ও উত্তরণ ঘটেছে।

এক্ষেত্রে বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে উত্তর ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোতে তপশিলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা জাতপাতের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁরা জাতিভিত্তিক অধিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। এক্ষেত্রে রামমোহন লোহিয়া নেতৃত্বাধীন 'সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি' এবং চৌধুরী চরণ সিংহ নেতৃত্বাধীন 'লোকো দল'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালের বিহারে জনতা দলের শাসন কায়েম ছিল। সেই সময় কর্পুরি ঠাকুরের সরকার সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিষয়টি সর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর আমলে।

১৯৯০ সালে জনতা দলের আমলে ভারতীয় রাজনীতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘোষিত হয়। এই ঘোষণায় মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর এই রাজনৈতিক কৌশলকে

[8] Stern, Robert W, *Changing India*, Cambridge University Press, London, 1993, পৃ. ৫৩।

ভারতীয় রাজনীতির ‘মণ্ডলীকরণ’ হিসেবে অভিহিত করেন। জাতপাত যেমন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে তেমনি রাজনীতিও জাতপাতকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। অন্যভাবে বলা যায়, জাতপাত ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতপাতের রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতির রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটি একটি ধারাবাহিক এবং পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া তা কখনো একমুখী নয় উভয়মুখী। এ-বিষয়ে রজনী কোঠারি তার *কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন— It is politics that getes caste,-ridden. It is caste that gets politicised dialectical as it might sound it is preciously because the operation of of competitive politics has drawn out of its political context and give it new status and identity hitherto unknown who is had begun to disintegrate. সুতরাং এই কথা বললে অতিরঞ্জিত হয় না যে, ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপট জাত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে রজনী কোঠারি মন্তব্য করেন— The alleged casteism in politics is no more and no less than politicisation of caste.[9] জাতপাত ভারতীয় রাজনীতিতে এখন আর একমুখী প্রক্রিয়া নয়। রাজনীতি ও জাতপাত উভয়মুখি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

শ্রেণীর ধারণা

‘শ্রেণী’ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কষ্টকর। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, অভিন্ন আর্থ-সামাজিক মর্যাদা যুক্ত গোষ্ঠী হল ‘শ্রেণী’। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিকগণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকাইভার ও পেজের মতানুসারে, শ্রেণী বলতে সমাজের এমন একটি বিশেষ অংশকে বোঝায়, যে অংশ সমাজের অবশিষ্ট অংশ থেকে স্বতন্ত্র। জনসমষ্টির যে অংশ সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক তাদেরকে বলা হয় 'সামাজিক শ্রেণী'। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে গড়ে ওঠা শ্রেণী ও শ্রেণীবিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সমাজের একটি অংশ অন্য অংশ থেকে নিজেদের উন্নত বলে মনে করে। এই চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা অন্য গোষ্ঠীদের থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায়

---

[9] Kothari, Rajni, *Caste in Indian Politics,* Orient Black Swan, New Delhi, 1970, পৃ. ২৫৫।

রাখার চেষ্টা করেন। মার্ক্সবাদী দার্শনিকরা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ও শ্রেণী শোষণের নিরিখে শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। ভি.আই.লেনিনের মতে 'শ্রেণী' বলতে বোঝায় সেই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে যাঁদের মধ্যে এক গোষ্ঠী নিজ অবস্থানে থেকে অন্য কোনো গোষ্ঠীর শ্রমকে আত্মসাৎ করেন।[10]

মার্ক্সবাদের মূল ভিত্তি হল শ্রেণী। মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণীর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কার্ল মার্ক্স অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীর ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো*-তে একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সমাজ সামগ্রিকভাবে দুটি প্রধান বিরোধী শিবিরে বিভাজিত। দুটি প্রধান শ্রেণীতে যারা সরাসরি পরস্পরের মুখোমুখি 'বুর্জোয়া' এবং 'সর্বহারা'।[11] মার্ক্স মূলত 'বুর্জোয়া' ও 'সর্বহারা' এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছেন। এই পার্থক্যের ভিত্তি হলো উৎপাদনের উৎসসমূহের মালিকানা।

মালিকানা বুর্জোয়াদের হাতে থাকলেও প্রলেতারিয়েতদের হাতে থাকে না। বুর্জোয়ারা সম্পত্তির ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। প্রলেতারিয়েতদের হাতে থাকা সম্পত্তির পরিমাণ কম এবং এই কারনেই তারা সর্বহারা। বুর্জোয়াদের কাছে এরা শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। সমাজে এঁদের মর্যাদা নিতান্তই নিম্নগামী। মালিক ও শ্রমিক এই দুই প্রধান শ্রেণী ছাড়াও মার্ক্স সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে পেটিবুর্জোয়া, কৃষকশ্রেণী, ক্ষেতমজুর, বুদ্ধিজীবীদের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্ক্সের মতে পুঁজির কেন্দ্রীভবন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা তত দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে। তার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সচেতনতা ও সংহতি বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণী উপলব্ধি করে যে, তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ পরস্পর বিরোধী এবং পরস্পর বিরোধিতা মীমাংসার অতীত।

শ্রেণী সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণার বিরুদ্ধে যারা বিকল্প মতামত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন প্রখ্যাত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)। তাই

---

[10] Lenin, V.I, *A Great Beginning, Collected Work, Vol. 29*, Progress Publishers, Moscow, 2011, পৃ. ৪২১।

[11] Marx, Karl and Engles, Frederick, Manifesto of the Party' in collection Works, Vol.6, Progress Publishers, Moscow, 1976, পৃ. ৪৮৫।

শ্রেণী প্রসঙ্গে ম্যাক্স ওয়েবার ও মার্ক্সের চিন্তার পার্থক্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েবারের মতে সমাজ বিভাজনের প্রশ্নটিকে এককভাবে শ্রেণীর মাপকাঠিতে বিচার করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ শ্রেণী শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানের মানদণ্ডে সমাজ বিভাজনকে বিশ্লেষণ করে। শ্রেণীর ধারণাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও ওয়েবার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সামাজিক বিভাজনের প্রশ্নটিকে অর্থনৈতিক উপাদানের সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে বিচার করা প্রয়োজন। ওয়েবারের ধারণা অনুযায়ী এই বিকল্প বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো পদমর্যাদা অনুসারী গোষ্ঠী।[12]

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের প্রভাব দেশের শ্রেণী কাঠামোর উপর পড়ে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন মাত্রা লাভ করে। দেশবাসীর মধ্যে শ্রেণীগত তারতম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়ের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানা, বৃত্তি বা পেশা, রুজি-রোজগার, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি। আধুনিক ভারতের অধিবাসীদের এরকম কয়েকটি ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। যেমন— ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, নিম্নবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। ভারতীয় বুর্জোয়া বলতে উৎপাদন মূলধনে যে সকল গোষ্ঠীর মালিকানা আছে তাদেরকে বোঝানো হয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা হলো দেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে বিভিন্ন পেশার বুদ্ধিজীবী, শহরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবী মানুষ, আধুনিক শিল্প বাণিজ্যের স্থাপক ও উচ্চ বেতনভোগী আধিকারিকদের বলা হয়। আধুনিককালে রাষ্ট্রচিন্তাবিদদেরও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো মাঝারি রোজগার সম্পন্ন বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত নিম্নস্থানে চাকরিজীবী, মাঝারি রোজগারের চাকরিজীবী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও ছোটো দোকানের মালিকদের। শ্রমিক শ্রেণী বলতে শহরাঞ্চলের দক্ষ শ্রমিক, মাঝারি, অদক্ষ শ্রমিককে বোঝানো হয়।

---

[12] দত্ত গুপ্ত, শোভন লাল, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩।

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেন তাঁর *স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এন্ড ক্লাস ফর্মেশন ইন ইন্ডিয়া: নিও মার্ক্সিস্ট কলোনিয়ালিজম আন্ডার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*[13] শীর্ষক এক রচনায় ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণীগত ব্যপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে দেশের প্রথমসারির শিল্প মালিকরা ১৯৪৪ সালে বোম্বাই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনায় আশা করা হয়েছিল যে ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র একটি নেতৃত্ব মূলক ভুমিকা পালন করবে। বিশেষত সেই সমস্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা অনাগ্রহী বা দুর্বল।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের কৌশল প্রণয়ন করা ও কার্যকর করা হয়। নয়া মার্ক্সবাদীদের মতানুসারে রাষ্ট্র মাত্রই শ্রেণীর বৃত্তি থাকবে। চূড়ান্ত বিচারে শ্রেণীগত ভিত্তি থেকে রাষ্ট্র কখনোই সম্পূর্ণ অধিকার পেতে পারে না। তবে ভারত রাষ্ট্র বর্তমানে শ্রেণীগত বিষয় থেকে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য স্বাধীকার করে। রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ প্রণব বর্ধন তাঁর 'দ্যা পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ডেভেলপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণীগত সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনে সাধারণ ভাবে শাসক শ্রেণীর ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণা বা প্রত্যয়ই হলো মার্ক্সবাদের মূল কেন্দ্রভূমি।

প্রণব বর্ধন ভারতীয় রাষ্ট্রভাবনা আলোচনায় শাসক শ্রেণীর ধারণাকে বহুলাংশে এড়িয়ে যান। তিনি সম্পত্তির মালিকানাভুক্ত প্রাধান্য কারী শ্রেণীসমূহের জোটের কথা বলেছেন। এই দুটোর মধ্যে আছে শিল্প মূলধনের মালিক শ্রেণী, বিত্তবান কৃষক শ্রেণী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী। প্রণব বর্ধন ভারতের গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী এবং জাতিসমূহের মধ্যে জটিল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতির কৃষকরা সমঝোতায় শামিল হয়। জাতিগত ভেদাভেদ স্বীকার করেও বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ও ভিন্নতার কারণে জোটবদ্ধ হয়। উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জাতের কৃষকরা জোট বদ্ধ হয়। বিভিন্ন জাতির অন্যান্য পেশাজীবীদের মধ্যে অনুরূপ ধরনের

[13] Sen, Anupam, *The State, Industrialization and Class Formations in India: A Neo-Marxist Perspective on Colonialism, Underdevelopment and Development*, Routledge Library Editions: British in India, 2017.

কোয়ালিশন পলিসি হয়। তবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী শব্দের মধ্যেও বিভ্রান্তি রয়েছে। চতুর্বর্ণের মধ্যেও অনেকে শ্রেণী ব্যবস্থার অবস্থান লক্ষ্য করেন। তবে এ.সি.দুবে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা বলার বিরুদ্ধে। তাঁর মতে এমন অনেক 'জাতি' বা জাত ছিল যাঁদের শ্রেণীবিন্যাস ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। কোনো অঞ্চল বিশেষের উপর নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক কাঠামোর গঠন প্রকরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারলেও সমগ্র দেশের জন্য সেই তথ্য যথেষ্ট নয়। কারণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি ভিন্ন।[14] সুতরাং বর্ণ ব্যবস্থার নিরিখে শ্রেণী কাঠামোকে সর্বভারতীয় বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণী কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এই শ্রেণী কাঠামোর একদিকে ছিল বিত্তবান শ্রেণী, আর অন্যদিকে ছিল শ্রমিকশ্রেণী। পুঁজিপতি বৃহৎ জমির মালিক, জমিদার শ্রেণী, বিত্তবানরা যেমন একদিকে ছিলেন অন্যদিকে কারখানার শ্রমিক, ছোটো কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, গরিব শ্রেণীর মানুষজনরা ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা এই পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। গড়ে ওঠে কম্যুনিস্ট আন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল। কিন্তু এখানেই এক বিরাট প্রশ্ন প্রকট হয়ে ওঠে। পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বাত্মক শ্রেণী সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্য দরকার ছিল শ্রমিক শ্রেণীর 'শ্রেণীসংগ্রাম'। সেই শ্রেণীসংগ্রাম কী বাস্তবে গড়ে উঠেছে? ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা কী শ্রেণী হিসেবে সংঘটিত হতে পেরেছেন?

প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম অভিযানের পরাজয়ের ফলে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন ঘটে। তারপর তারা অধঃপতিত হয়ে পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়। এই-পরাজয় বাইরে থেকে কোনো সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ফলে ঘটেনি, ঘটেছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে। শ্রমিক শ্রেণীর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই এগুলি হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমিক শ্রেণীর এই পরাজয়ের গভীর ছাপ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের উপরেও পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পরাজয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো কোনো

---

[14] দুবে, এ.সি., *ভারতীয় সমাজ,* ন্যাশনাল বুক টাস্ট ইন্ডিয়া, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪২।

শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয়স্তরে পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণীর হিংস্র হামলার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন না তা নয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের কারখানাতে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

যদিও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো একটি পার্টি গঠন করতে পারত তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারতো। স্বাধীনতার আগে ও পরে বিশেষ করে গত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী পার্টি ছিল। যদিও তারা বাস্তবে এইকাজে অবহেলা করেছে। অতীতে শ্রমিকরা বিভিন্নসময় শ্রেণীসংগ্রামের সম্ভাবনা দেখালেও বাস্তবে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে নি। ষাটের দশকে সি.পি.আই. ও সি.পি.আই.(এম.)-এর গণ সংশোধনবাদী সংস্কারবাদী পথে ঢলে পড়ার পর যে সি.পি.আই.(এম.) পার্টির জন্ম হয়, তারা ঐ শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে সমর্থ হয় নি। বরং দ্রুতই তারা অতি বামপন্থার রাস্তা গ্রহণ করেছেন। ভারতের শ্রেণীচেতনা ও শ্রমিক সংগ্রাম বোঝার সুবিধার্থে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক সংগ্রাম কথাটির তাৎপর্য আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

মার্ক্স, এঙ্গেলসের রচনাগুলি খুঁটিয়ে পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণী শব্দটি সমার্থক নয়। শ্রমিক শ্রেণী শব্দটি অনেকে আলাদাভাবে ব্যবহার করেন। কখনো সাধারণ শ্রমিকদের বোঝানো হয়। আবার কখনো বা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম উভয়ের স্তরে থাকা শ্রমিকদের বোঝানো হয়। কম্যুনিস্টদের লক্ষ্যগুলির অন্যতম হলো সর্বহারাদের শ্রেণীরূপে সংগঠিত করা। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী নয়। উৎপাদন সম্পর্কে তাঁদের অবস্থানের সুবাদে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অথবা অর্থনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ তাঁদেরকে বিশেষ প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হতে হয়।

শ্রমিকদের বা সর্বহারা শ্রেণী হিসেবে পরিণত হওয়ার কথা মার্ক্স, এঙ্গেলস অন্যত্রও বলেছেন। জার্মানির কৃষক সংগ্রামের ভূমিকাতেও এঙ্গেলস লিখেছেন— যতই সর্বহারারা বিকশিত হয়ে উঠল; যতই তাঁরা শ্রেণী হিসেবে অনুভব করতে লাগলো এবং শ্রেণী হিসেবে ভূমিকা নিতে

থাকলো বুর্জোয়ারা ততই বিহ্বল হয়ে পড়ল।[15] ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের জনগণকে প্রথমে পরিণত করেছিল শ্রমিকে। পুঁজির আধিপত্য এই-জনগণের জন্য তৈরি করেছেন এক সাধারণ অবস্থা, সাধারণ স্বার্থ। এই জনতা, এই পুঁজির বিপরীতে ইতিমধ্যেই একটি শ্রেণী। কিন্তু তার নিজের পক্ষে সে এখনো একটি শ্রেণী নয়। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এবং নিজের পক্ষে একটি শ্রেণী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। যে স্বার্থ নিয়ে লড়াই করে তা হয়ে ওঠে শ্রেণীস্বার্থ। কিন্তু শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম।[16]

শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলায় শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা

স্বাধীনতালাভের আগে ভারতে শ্রমিকদের উপর বিদেশি ও দেশী পুঁজির আক্রমণ নানান সময় নানান মাত্রায় আছড়ে পড়েছে। কখনো দীর্ঘ সময় ছাঁটাই, কখনো কম মজুরি বা মজুরি কমিয়ে দেওয়া, কখনো কাজের বোঝা বৃদ্ধি, কখনো বসবাস অনুপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অবিভক্ত-ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা নানান সময়ে বড়ো আকারে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম ও ধর্মঘট আন্দোলন করেছে। চটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চা-বাগান, ইস্পাতশিল্প, রেল ইত্যাদিতে স্বাধীনতা-পূর্ব সময় শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে সংগ্রাম করেছে। শ্রমিকরা কখনো দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছে, আবার কখনো বা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সাফল্য-ব্যর্থতা নিরপেক্ষভাবে এই সংগ্রামগুলি ঐতিহাসিক বলে গণ্য হয়েছে। মনে রাখতে হবে এ-আন্দোলনগুলি শ্রমিকরা করেছে এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার মধ্যে। কেননা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন করার আইনি অধিকার ছিল না। নানাভাবে চলত ব্যাপক দমন-পীড়ন, শ্রমিক বিক্ষোভে গুলিচালনা নির্বিচারে গ্রেফতার ইত্যাদি।

বামপন্থী ঐতিহাসিক সুকোমল সেনের মতে— যখন ভারতের শ্রমিক জাগরণ শুরু হল তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকে তাঁরা মনে করতেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে। শ্রমিকদের সভা, শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, ট্রেডিং ইউনিয়ন কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গুপ্তচরবৃত্তি, ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের গ্রেফতার ও কারাদণ্ড

---

15 এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, *জোর আমাদের জার্মানির কৃষক যুদ্ধের ভূমিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৭৭, পৃ. ১৩।

16 মার্ক্স, কার্ল, *দর্শনের দারিদ্র,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৮।

প্রদান এবং আরো ভিন্নরূপে পুলিশি হয়রানি চালানো হতো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে।[17] এতদসত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে কমিউনিস্টরা গুটিকয়েক শিল্প, শিল্পাঞ্চলে সামান্য কিছু প্রভাব রাখতে শুরু করেন।

তবে এই কাজগুলো কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হতো এমন নয়। কার্যকলাপ চলেছিল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। ফলতঃ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শ্রমিকরা যে অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা কম্যুনিস্টদের কমই প্রভাবিত করে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিত মূলত মধ্যশ্রেণী থেকে আগত নানান শ্রমিকরা। এই-প্রসঙ্গে বামপন্থী ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার লিখেছেন— ইউনিয়নের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই ছিল মূলত মধ্যশ্রেণীর হাতে। তাই সে ছিল নানান ধরনের রাজনৈতিক ধারা থেকে নরমপন্থী। প্রায় রাজভক্ত যেমন বোম্বাইয়ের এম. এন. যোসী, মাদ্রাজে প্রিয়া ও বোম্বাইয়ে বেসান্ত অনুগামী মানে বোম্বে ক্রনিকল গোষ্ঠী ও তাঁর সঙ্গে তিলকের কিছু তরুণ অনুগামী মাদ্রাজ কংগ্রেসে নেতা তীরু বিক, বাংলার পুরনো সন্ত্রাসবাদী খিলাফতী আন্দোলনকারী ও জাতীয়তাবাদীরা।[18]

একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ শুরু করার আগে থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা শুরু করে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করে। তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তৃত ও অবিভক্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধাবাদ সংস্কারবাদের প্রভাব এইসময় থেকে দেখা যেতে থাকে। বিভিন্ন বড়ো বড়ো আন্দোলন যেমন 'বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ধর্মঘট', 'বোম্বে সুতাকল ধর্মঘট' ইত্যাদির নেতৃত্বে হস্তক্ষেপ করে এবং বেশকিছু ক্ষেত্রে এই নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আন্দোলনগুলি দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সি.আর.দাস বলেন— কংগ্রেসকে শ্রমিকদের নিজের পক্ষে আনতে হবে এবং তাদের বিশেষ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ ও উচ্চতর আদর্শের দৃষ্টিকোণ উভয় দিক থেকে সংগঠিত করতে হবে। এই-আদর্শের জন্যই তাদের বিশেষ-স্বার্থ রক্ষা করা এবং এই-স্বার্থকে স্বরাজের কাজে লাগানো দরকার। তিনি সতর্ক করে দেন এটা না করা

---

[17] সেন, সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৯০,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯৪, পৃ. ১৫৩।

[18] সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত,* কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ২০১।

হলে স্বরাজের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ে উঠবে এবং তা শ্রেণীসংগ্রাম ও বিশেষ স্বার্থের লড়াই চালাবে।[19]

জাতপাত বনাম শ্রেণী

ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে জন্মসূত্রে মানুষের জাতপাত নির্ধারিত হয়। যেহেতু জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয় তাই জাতকে পাল্টানো যায় না। শ্রেণী হল সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিকভাবে সচেতন গোষ্ঠী যাঁদের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে উৎপত্তি শ্রেণীর সঙ্গে পার্থক্য আছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাত হলো উন্নত জীবনচর্চা সম্পন্ন গোষ্ঠী। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কে কোন্ জাতের অন্তর্ভুক্ত হবে তা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ধারিত হয় তার জন্মের উপর। কোনো ব্যক্তি কোন্ জাতে জন্মগ্রহণ করেছেন তা তার ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্যাদাকে নির্ধারিত করে। শ্রেণী নির্ণয়ের প্রশ্নে জন্মগত পরিচয় অপেক্ষা সম্পদ পরিচয় অনেকটা নমনীয়; সম্পদগত পরিচয় অনেকটা নির্দিষ্ট বলে এর উপরে কোনো শ্রেণী পরিচয়ের কথা বললে সেটাকে সহজেই চ্যালেঞ্জ করা চলে।[20] শ্রেণী যেহেতু সম্পত্তির ধারণা দ্বারা তৈরি হয় সেহেতু সম্পদ অর্জন, সম্পদ নাশ, কিংবা হস্তান্তরের সঙ্গে শ্রেণী পরিচয় পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে জাতপাতের মতো শ্রেণী মানুষের মধ্যে স্থায়ী বিভেদরেখা টেনে দেয় না। জাত ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমিক হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে নিম্নতর জাতগুলির জন্য আলাদা পরিবার-গ্রাম তৈরি করা হয়। একইভাবে শহরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির জন্য আলাদা আলাদা মহল্লা, পাড়া তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে জাতপাতে শুচি অশুচির ধারণা রয়েছে। শ্রেণীর ক্ষেত্রে জাতপাতের মতো এরকম স্থায়ী কোনো রীতি বা প্রথা নেই। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। জমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ধারিত হয়। সেকালের সামাজিক নির্দেশ মেনে জাতপাত ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই সেই মালিকানা নির্ধারিত হয়ে আসছে। জাতব্যবস্থায় উঁচু-নিচুর উপর আর্থিক অবস্থাও নির্ধারিত হয়। যে যত উঁচুতে অবস্থিত তাঁর আর্থিক কৌলীন্য তত বিস্তৃত। যে নিচু

[19] চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,* কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭৮।

[20] দেশাই, এ. আর., *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি,* কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২০১।

জাত তাঁর আর্থিক সঙ্গতিও তত সীমিত।[21] ভারতে শ্রেণীচেতনার চেয়ে জাতিচেতনার প্রাধান্য বেশি লক্ষণীয়। জাতপাত ধর্মীয়করণের জন্য বেশিরভাগ মানুষ সামাজিক কাঠামোতে দীর্ঘস্থায়ী প্রাধান্যতা পেয়েছে। সামাজিক সক্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও জাতপাতের গতিময়তা ধীর প্রকৃতির। বলা যেতে পারে, শ্রেণী উত্তরণ বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে হলেও জাতপাতের গতিময়তা ও কাঠামোর পরিবর্তন নিষ্ক্রিয় বৈপ্লবিক পন্থায় সংঘটিত হয়েছে। সকল জাতপাত ভিত্তিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে গরিব শ্রেণীর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও 'গরিব শ্রেণী' হিসেবে শ্রেণী চেতনা গড়ে তোলা তুলনামূলক কঠিন।

জাতপাত ও শ্রেণী ধারণার সম্পর্ক

ভারতীয় রাজনীতি তথা বাম রাজনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য শ্রেণী সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। শ্রেণীর ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য শ্রেণীর চরিত্র, পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণী রাজনীতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। শ্রেণী হল বুনিয়াদি বর্গ এবং উৎপাদনের মধ্যে তার উৎস বর্তমান থাকে। তবে জাতপাতের ধারণার সঙ্গে শ্রেণীর তাত্ত্বিক কাঠামোর দ্বৈততা রয়েছে। তবে জাতপাতের উৎসের মধ্যেও উৎপাদনের ধরনের সম্পর্ক রয়েছে।

মার্ক্স, এঙ্গেলস যখন ঘোষণা করেন যে– আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, তখন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ও সামাজিক বিকাশের মধ্যে একটি বুনিয়াদি সূত্র আবিষ্কৃত হয়। সেহেতু শ্রেণী সংগ্রামের এই আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক যেমন বর্তমানে রয়েছে তেমনি এর বৈধতা রয়েছে। শুধুমাত্র একটি পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীগুলি ও তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম বিরুদ্ধতা দেখা দেয় ও সমস্ত শ্রেণীসংগ্রাম অত্যন্ত জটিল রূপে পরিণত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে জাতপাত ও শ্রেণীর এই জটিল পরীক্ষা করে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করা যায় যে– কীভাবে ধর্মযুদ্ধ, ঔপনিবেশিকতা ষড়যন্ত্র, সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাহ্যিক রূপের অন্তরালে বিভিন্ন শ্রেণীর শর্তগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

[21] দাস, নরেন্দ্র চন্দ্র, *জাত ধর্মের বিচ্ছিন্ন সমাজে,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃ. ৫২।

অবতীর্ণ করে। অবশ্য কেবলমাত্র একটি পরিপক্ক পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণীগুলি ও তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম বিশুদ্ধ রূপে দেখা যায়। অন্য সমস্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অত্যন্ত জটিলরূপ পরিগ্রহ করে।[22]

ভারতের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তিকরে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের জাতপাতের লড়াই বাহ্যিক রূপ ভেদ করে তার আড়ালে সমাজের শ্রেণী সূত্রের মর্মবস্তুকে উদঘাটিত করতে হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিকে কিংবা উৎপাদন সম্পর্ককে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরলেও জাতপাত তার উপরিসৌধ হিসেবে কাজ করে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ এবং উৎপাদনের ধরনের ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসার সাথে সাথে এই সম্মতি ভেঙে যায়। শ্রেণী এবং জাত কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, একে অপরকে নির্ধারণের চেষ্টা করে।[23] কিন্তু শ্রেণীও জাতের দ্বৈততার তথ্য বর্তমান থাকে। জাতপাত প্রথাকে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট ধরন ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পর্ক হিসেবেই বলা যেতে পারে। এখানে শ্রেণী সম্পর্কগুলি জাতপাতের নিরিখে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের স্থায়িত্ব উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উৎপাদিকা শক্তি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থেকে জন্ম নেওয়া সমাজের স্থিতিশীল সামাজিক সংগঠন তা নির্ধারণ করে থাকে। যেখানে জাতপাত ও শ্রেণী ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একে অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। জাতপাতের কাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিতান্তই বাহ্যিক। কারণ এই দুটি হলো সমভাবে দুটি ভিন্ন বর্গ। যাদের উৎস রয়েছে যথাক্রমে কাঠামো এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান বিকাশে উৎপাদনের ধরন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। ফলে শ্রেণী, জাতের কাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যেও সংঘাত দেখা দেয়।

বিভিন্ন জাতপাতের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির বিভাজনের স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তবে নতুন আধুনিক অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলি অবশ্যই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগের জন্য জাতপাতের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে কাজে লাগায়। সেই পুরনো হাতিয়ার যা মূলত বস্তুর মধ্যে

---

[22] মিশ্র, বিনোদ, 'জাত, শ্রেণী ও দলিতঃ একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৫২।

[23] মিশ্র, বিনোদ, 'জাত, শ্রেণী ও দলিতঃ একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৫৫।

আমূল পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম পর্যায়ে সংহতির নেতিকরণ ঘটে এবং শ্রেণী ও জাতপাতগুলি পরস্পরকে সংযুক্ত করে আবার পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যায়। জাতপাত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। জাতপাত-ব্যবস্থা উৎপাদন সম্পর্ককে প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করে এবং উৎপাদন উপকরণগুলিকে বিভিন্ন জাতপাতের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিভাজিত করে। এই জাতপাত ব্যবস্থা উপরিকাঠামোর প্রধান ভূমিকা অর্থাৎ উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতপাত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা কাঠামোর উপর উপরিকাঠামোর ক্রিয়া। তার অর্থ জাতপাত কাঠামোর অন্তর্গত। ভারতের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জাতপাত শ্রেণী এক নয়। বরং শ্রেণীর ও অর্থনীতি বহির্ভূত দিকগুলো পরস্পর মেলবন্ধন ঘটায়। অন্যভাবে বলতে গেলে জাতপাত ও শ্রেণী উভয়েরই অর্থনৈতিক বহির্ভূত দিক আছে। উভয়েরই উৎস উৎপাদনের ধরনের মধ্যে উভয়ই বুনিয়াদি বর্গ এবং তাদের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

শ্রেণীর দ্বারা জাতপাত নির্মূলকরণ

জাতপাত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সর্বহারাকে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণী হিসেবে দেখতে হলে জাতপাতের উঁচু জাতের ও সর্বহারাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। কিশোর কুমার বোরার মতে— বিভিন্ন শ্রেণীগুলির জাতির আনুগত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধরত। জাতপাতের মধ্যে খণ্ডীকরণ রয়েছে কিন্তু শ্রেণী খণ্ডীকরণ সত্য নয়। কারখানার এবং পুঁজিবাদ সর্বহারা শ্রেণী সত্তার নির্মাণের শর্ত হলো যৌথ কার্যকলাপের মাধ্যমে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংঘটিত করা। তাছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার জাতপাত, শ্রেণী সাম্প্রদায়িকতা সংযোগ স্থাপনের ও সংহতি বৃদ্ধি চালানো। পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবকে জাতপাতের বৈপরীত্য হিসেবে ও তাদের মধ্যেকার জাতপাতের বিলোপ সম্ভাবনাকে অগ্রসর করে। রাডিক্যাল চিন্তা ধারা ঘটলে সর্বহারার চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্মবোধ হয়।

জাতপাত শ্রেণীর বৈপরীত্যের ধারণা

জাতপাতের ধারণাকে মার্ক্স যেখানে ভারতের শক্তি ও অগ্রগতির পথে নির্ধারক বাধা হিসেবে দেখেছেন, সেখানে ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা জাতপাতকে উপরিকাঠামো হিসেবেই গণ্য করেছেন। জাত হলো একটি উৎপাদন সম্পর্ক। সুতরাং তাঁরা জাতকে উপরিকাঠামোর ব্যাপার বলেই গণ্য

করেছেন।[24] জাতপাত উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে থাকলেও তা উপরিকাঠামোর ব্যাপার নয় বরং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, তা মেনে নিতে কম্যুনিস্টরা রাজি নন। ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের সবচেয়ে বড়ো তাত্ত্বিক ব্যর্থতা হলো জাতকে সমাজের মূল কাঠামো বিষয় হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করা। মার্ক্সীয় আলোচনায় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা উপরিকাঠামোর কথা অবশ্যই শোনা যায়। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ভিত্তি বলে কিছু হয় না। জাত ব্যবস্থাকে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত করতে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং জাতপাতের ও শ্রেণীর দ্বৈত চরিত্রে তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়।

এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ ও পেশার স্থায়ী বিভাজনের প্রতিষ্ঠা হিসেবে জাতপাত-কে দেখা হয়। অন্যদিকে বৈষম্যের মানসিকতা হিসেবেও জাতপাত প্রথাকে উস্কানি দেওয়া হয়। এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা খুবই প্রয়োজন। জাতপাতের মধ্যে এই উভয়দিক বর্তমান। ভারতীয় কাঠামোতে জাতপাতের যেরকম বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সঙ্গে জাতপাতের উপরিকাঠামোর সম্পর্কের দ্বৈততাও রয়েছে। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক সমাজগুলি শ্রেণী সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সমস্ত সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থনীতির বহুমুখি বল প্রয়োগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন, এই সামাজিক ব্যবস্থায় জাতপাতকে দীর্ঘ স্থায়িত্বতা দান করেছে।

উৎপাদনের ধরনের মধ্যেই শ্রেণীর উদ্ভব। বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক শর্তাবলী তাঁদের পরস্পর বৈরী সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ করে। এই-প্রক্রিয়া সমাজে শ্রেণী বিভাজনকে ত্বরান্বিত করে। [25] আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী বিভাজনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত ত্বরান্বিত করে। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বৃহৎ শিল্পের উদ্ভব জাতপাত পেশার ভাঙন ধরায় এবং এক নতুন শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে। এই নতুন শ্রেণী সর্বহারাদের শ্রেণী। বাগিচা, খনি,

---

[24] মিশ্র, বিনোদ, 'জাত, শ্রেণী ও দলিতঃ একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৪২।

[25] বেতে, আঁদ্রে, 'আধুনিক ভারতে অনুন্নত সমাজ', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৪২।

বস্ত্র, পাট ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত প্রথম প্রজন্মের সর্বহারাদের নিয়ে গড়ে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম। এই সর্বহারা শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল জাতপাতের ভিত্তিতে অস্পৃশ্য ও ক্ষুদ্রজাতি থেকে আগত। ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়।

জাতের ভিত্তিতে শুধুমাত্র তপশিলি নয়, অন্যান্য উঁচু জাতের মানুষরাও যোগদান করে। শ্রেণীর মধ্যে এক জাতপাত বিলোপের সম্ভাবনা তৈরি হয়। প্রগতিশীল সামাজিক শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাঁদের লড়াইয়ে জাতপাতের সমীকরণকে কাজে লাগানো বর্জন করে। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে জাতপাত স্থায়িত্ব অর্জন করে। উচ্চবর্ণীয় প্রধান শ্রমিক শ্রেণী আজও জাতিসত্তা বিলোপের পরিপন্থী। অর্থাৎ জাতপাতগুলি ভেঙে গিয়ে কখনো শ্রেণী সচেতনতা দানা বাঁধে আবার শ্রেণী কখনো কখনো জাতপাত রূপে কাজ করে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য চলতে থাকে।

জাতপাত শ্রেণী ও সংরক্ষণ নীতি

জাতপাত, শ্রেণী, সংরক্ষণ সম্পর্কে মার্ক্সবাদী গবেষকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। সি.পি.আই.-এর তাত্ত্বিক গোষ্ঠীগণ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে গ্রহণ করেন। তবে এক্ষেত্রে সি.পি.আই. তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সংরক্ষণ নীতি নিয়ে কিছু যুক্তিসঙ্গত আপত্তির দিকও রয়েছে।[26] সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতপাতের সঙ্গে শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। বামপন্থীতে দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিচার-বিশ্লেষণ একান্তই প্রয়োজন। অন্যদিকে সি.পি.আই.(এম.)-এর তাত্ত্বিকগণ ভারতে সংরক্ষণ নীতির বিরোধী। সি.পি.আই.(এম.)-এর তাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে ভারতের সংরক্ষণ নীতি শ্রমিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করে এবং নিপীড়িত শ্রেণী হিসেবে তাঁদের একতা নষ্ট হয়।[27] বামপন্থী গবেষকগণ বামপন্থীদের এই নীতিকে 'কৌশল' হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। জাতপাত ও শ্রেণী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁরা তাত্ত্বিক বিষয়ে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, ভারতের প্রেক্ষাপটে জাত ও শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ততটাই উদাসীন থেকেছেন।

---

[26] সরদেশাই, এসজি., *ক্লাসেস স্ট্রাগল এন্ড ক্লাস কনফ্লিট ইন রুরাল এরিয়া,* কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ১৯৮২, পৃ. পৃ. ৩৩-৩৪।

[27] রনদিভে, বি.টি. *জাত বর্ণ শ্রেণি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা কলকাত, ২০১০, পৃ. ২৬।

জাতপাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভারতীয় শাসক শ্রেণীর জন্য অনেকটাই অনুঘটকের মত কাজ করে থাকে। এইসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী চেতনার একটা সুস্পষ্ট রূপ পেতে দেরি হয়। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের শ্রেণী চেতনাকে আটকে রাখা যায় না। সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমাজের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। যা অন্য শ্রেণী থেকে অনেকটাই সুবিধাভোগী ও উঁচুতে অবস্থান করে। ফলে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে এক শ্রেণী বৈষম্যতা তৈরি হয়। কখনো একটি অংশ অভিজাতত্বে পরিণত হওয়ায় শ্রেণী দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। ফলে জাতপাতকে কেন্দ্র করে শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের বৈরিতা তৈরি হয়। র‍্যাডিক্যাল ও বামপন্থী দুই দলেরই উচিত মূলগত অসঙ্গতিগুলোতে আপামোর শ্রমজীবী জনগণকে পরিচালনা করানো এবং তখনই শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী চেতনা একটা সুস্পষ্ট রূপ পেতে পারে।[28]

পশ্চিমবঙ্গের জাত ও শ্রেণীর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি

মার্ক্সবাদী বামপন্থীরা শ্রেণীকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আলোচনা করার পক্ষপাতী। ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গেলে জাতিভেদ প্রথার দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, জাতপাত ভিত্তিক পৃথকীকরণ হলো শ্রেণীভিত্তিক পৃথকীকরণেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ।[29] বামপন্থীরা জাতপাত ব্যবস্থাকে শ্রেণীর নিরিখে ব্যাখ্যা করেন। সাম্প্রতিক কিছু মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতপাতকেই শ্রেণী হিসেবে দেখেন। প্রাচীন শাস্ত্র অনুসারে ও কিছু গবেষকদের লেখা পত্রে জাতপাতকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে যে দাবি করা হয় তা মার্ক্সবাদী বামপন্থীরা অস্বীকার করেন।

বেশ কিছু গবেষক জোর দিয়েছেন জাতপাতের আচার অনুষ্ঠানগুলোর উপর। মার্ক্সবাদীরা দাবি করেন যে, শ্রেণীর ভিত্তি হল ভূমি (Land)। জাতপাতের অবস্থান হলো সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামো। মার্ক্সবাদীদের জাতিভেদ প্রথাকে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতাও আছে।[30] জাতপাতের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাগণের এই

---

[28] গুরু, গোপাল, 'সংরক্ষণের রাজনীতিঃ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে' প্রকাশিত, সেন, সুজিত (সম্পাদনা), জাত পাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৫।

[29] *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, প্রচার পুস্তিকা,* ১৫ই অক্টোবর ২০১৫।

[30] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ৩৮।

দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জাতীয় শ্রেণীর মূল যোগসূত্রগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জাতপাত ব্যবস্থার যে একটি প্রকৃতি রয়েছে তা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে গেইল, ওমভেটের মতে— ভারতীয় সমাজে জাতি হল শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীবিভাগের রূপ ও তার সারবস্তু। তবে জাতিকে শ্রেণীর সমর্থক বলে ধরে নেওয়া কঠিন। কারণ দুটি ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি কিছুটা আলাদা।[31]

জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মের ধারণার যে ব্যাখ্যা করা হয় তাও মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করা হয়। জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে কর্মের যে ধারণা রয়েছে সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণার পরিবর্তন সূচিত হয়। অর্থাৎ জাতি ব্যবস্থায় এই সম্পর্ককে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বলে মনে করা হয়।[32] মার্ক্সবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। জাতি, জাতিভেদকে দেখা প্রয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতায়ও এগুলি দেখা দরকার। খেটে খাওয়া মানুষকে দাবিয়ে রাখাই জাতিভেদের চূড়ান্ত ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে প্রভুত্বকারীরা উদ্বৃত্ত অংশটিকে করে আত্মসাৎ।[33] প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে যে সহযোগিতার বাতাবরণের কথা বলা হয় তা নিতান্তই ধর্মগ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে আলোকপাত করা হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জাতিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক চিরকালই ছিল। বিভিন্ন সময়ে জাতপাত সম্পর্কিত যে জাতি হিংসার কথা বলা হয় তা এই দ্বন্দ্বের সম্পর্ককেই ব্যাখ্যা করে। জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে যে সহযোগিতা সম্পর্ক তা সর্বদা কাম্য নয়। ভারতের

---

[31] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. ১০।

[32] বসু, নির্মল কুমার, *হিন্দু সমাজের গড়ন,* বিশ্বভারতী, পৃ.পৃ. ১৮৮-৯৯।

[33] *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্ক্সবাদ) রাজ্য কমিটির প্রচার পত্রিকা,* ন্যাশনাল বুক প্রাইভেট এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ১।

সামাজিক প্রকরণের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে জাতের প্রশ্নটি এবং তার সঙ্গে শ্রেণী সংযোগসূত্রগুলি আলোচনা করতে হবে।[34]

আন্দ্রে বেতেই জানিয়েছেন যে, উপনিবেশিক যুগে সম্পদ ও ক্ষমতাবন্টন জাতি বিভাগের রেখাগুলোকে অতিক্রম করে। ফলে জাতীয় শ্রেণীবিভাগের রেখাগুলি স্থানে স্থানে এক জায়গায় এসে মিলে গেলেও সেগুলি পৃথক এবং বিপ্লবমুখী হয়ে দাঁড়ায়। বামপন্থীরা মনে করেন যে এই বিপ্লবমুখী হওয়ায় শ্রেণীর বঞ্চনার যোগ রয়েছে। অর্থাৎ শ্রেণীগত বঞ্চনার ঘনিষ্ঠযোগ রয়েছে তাঁদের জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে।[35] নিকোলাস ডার্ক প্রাক্-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলির পদমর্যাদাসূচি ধর্মীয় মানদণ্ডে নির্ধারিত হতো না। এই মর্যাদা নির্ভর করত রাজপথ থেকে তাঁদের দূরত্বের ওপর। জাতপাতের পদমর্যাদার প্রকৃতি রাজনৈতিক। রাজার ক্ষমতার দ্বারাই জাতপাতের ক্ষমতার বৈধকরণ ঘটত। পদমর্যাদার মূল ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোতে যাঁদের হাতে সম্পদের পরিমাণ বেশি তাঁরাই এই ক্ষমতা ভোগ করতেন। গেইল, ওমভেট বলেছেন যে— ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতার সহযোগিতার ফলেই ভারতের জাত ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় ছিল।

ঔপনিবেশিক সরকার এই কাঠামোকে গ্রহণ করে, পরিবর্তন করে ও অনেকাংশে শক্তিশালী করে নিজেদের কাজে লাগায়। ধারাবাহিক ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে এর প্রকৃতির ও চেহারার কিছু পরিবর্তন এলেও তার মূল কাঠামোটি অপরিবর্তিত থাকে। কমরেড ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদের ভাষায়— বুঝতে হবে যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হলো জাতিভিত্তিক হিন্দু সমাজ ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, ধর্মনিরপক্ষ গণতন্ত্র গড়ারও কোনো প্রশ্ন নেই। যতক্ষণ না ভেঙ্গে ফেলছি ভারতের 'সু-প্রাচীন' সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই দুর্গকে, অর্থাৎ উঁচু জাত-নিচু জাতের

[34] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ৩৬।

[35] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ৪৩।

সোপানের ধাপে ধাপে বিভক্ত সমাজকে। সোজা কোথায়, মৌলিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে জাতিভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পৃথক করা যাবে না।"[36]

শিক্ষার প্রসার, পশ্চিমায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিচুতলার সম্পদ ও ক্ষমতার ফলে জাতির এক ক্ষুদ্রাতি অংশ সমাজের উপরের স্তরে উঠে আসে। এক্ষেত্রে এক ক্ষুদ্রাতি অংশের ক্রমোচ্চ অবস্থান পরিবর্তন হলেও মূল কাঠামোটি অটুট থাকে। জাতপাত ব্যবস্থার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকারগণ জাতপাতকে অন্তর্বিবাহ, কর্ম বিভাজন, শুচি অশুচি, এবং ক্রমোচ্চ অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। বাংলার জাতপাত ও শ্রেণীকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। নীহাররঞ্জন রায় বাংলার জাতি, শ্রেণী ও ক্ষমতাবন্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পান। স্থায়ী কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কায়িকশ্রমে নিয়োজিত গোষ্ঠীগুলির জাতি পদমর্যাদায় নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে, আর ওপরে উঠে আসে মধ্যবিত্ত বৌদ্ধিক শ্রেণীগুলি।

উপনিবেশিক শাসকগণ জাতপাত ভিত্তিক জনগণনার মধ্য দিয়ে জাতপাতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে বৈধতা প্রদান করে। একইভাবে উপনিবেশিক রাষ্ট্র জাতপাতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে জাতপাতের ভেদাভেদকে সরকারি অনুমোদন দেয়।[37] সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতিতে হিন্দুকরণের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যাকে হিন্দু পদ্ধতি বলেও বলা যেতে পারে। মার্ক্সবাদীরা এই হিন্দুকরণ ও হিন্দু পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন। জাতপাত ও ধর্ম নিরপেক্ষ শ্রেণীর উত্তরণের বিষয়টিকে তাঁরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন। বামপন্থীদের মতে— এখনকার ভারতে, আজও জাতিভেদ প্রথা হলো শ্রমজীবী জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর এক শক্তিশালী যন্ত্র। যুগোপত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে, কৃষি মজুরের মধ্যে, কৃষকের মধ্যে, মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং গরিবের মধ্যে

---

[36] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ১০।

[37] *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদ) রাজ্য কমিটির প্রচার পত্রিকা,* ন্যাশনাল বুক প্রাইভেট এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৭।

বিভেদ আনার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। জাতপাত ভিত্তিক সংহতি শ্রেণী সংগ্রামকে নস্যাৎ করার কাজে লাগে।[38]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর বাংলার গ্রামীণ সমাজের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যা জাতপাত ব্যবস্থার উপর অপরিসীম প্রভাব ফেলে। ভূমি ব্যবস্থার বিভাজন বাণিজ্যের নীতি দরিদ্র ও কারিগরদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, চাকরির সুযোগ তথাকথিত বাংলার কুলীন পেশার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। 'কৃষ্টিকরণ' (Sanskritization) এবং সামাজিক গতিময়তার (Social Mobility) ফলে জাতি বিন্যাসের পরিবর্তন সূচিত হয়। বামপন্থীরা যাকে 'শ্রেণী উত্তরণ' হিসেবেই বিবেচনা করেন। বামপন্থীরা মনে করেন যে– জাতপাত এক ধরনের পরিচিতি সত্তা যার ভিত্তিতে 'পরিচিতি সত্তা নির্ভর রাজনীতি' (Caste based Politics) ফুলেফেঁপে উঠেছে।[39] এই ধরনের পরিচিতি সত্তার রাজনীতি শুধুমাত্র জাতপাত বা পশ্চাদপৎ শ্রেণীর সংগঠনগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই পরিচিতি সত্তার রাজনীতি শ্রেণী রাজনীতিকে একদিকে যেমন দুর্বল করে, তেমনি জাতপাত রাজনীতিকে শক্তিশালী করে। পরিচিত সত্তা নির্ভর রাজনীতি তাঁরা ব্যবহার করে এবং জাতপাত ভিত্তিক বিভাজন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।[40]

সি.পি.আই.(এম) নেতা প্রকাশ কারাত মনে করেন যে– সমাজে শ্রেণী শোষণ এবং সামাজিক নিপীড়ন দুটোই আছে। আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোয় জাতপাত ভিত্তিক জাতিগোষ্ঠী ও লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক নিপীড়ন যুগোপথ পুঁজিবাদী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী শোষণের সঙ্গেই বিদ্যমান। শাসক শ্রেণীগুলি উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করে শ্রেণী শোষণের মাধ্যমে এবং

---

[38] *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্ক্সবাদ) রাজ্য কমিটির প্রচার পত্রিকা,* ন্যাশনাল বুক প্রাইভেট এজেন্সি, কলকাতা, পৃ.৭।

[39] কারাত, প্রকাশ, *পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, পৃ. ১০।

[40] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ৪৪।

তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে তারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিপীড়নকে কাজে লাগায়। বামপন্থীরা মনে করেন দুধরনের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে। অন্যদিকে পরিচিতি সত্তা নির্ভর রাজনীতি চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃহত্তর জমায়েতে বাধা বাধা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকেও বাধা দেয়।[41] জাতপাত সংক্রান্ত পরিচিতি সত্তার প্রশ্নে পার্টি বিগত উনবিংশ কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলেছে যে— জাতপাত সংক্রান্ত পরিচিতির ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সমাবেশ আজ এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ বেশি বেশি করে বুর্জোয়া দলগুলি জাতপাত ভিত্তিক পরিচিতি সত্তার উপর নির্ভর করছে। এধরনের জাতপাত ভিত্তিক সমাবেশ পার্টি এবং বাম আন্দোলনের সামনে গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। যেহেতু পার্টি এবং বাম আন্দোলন চায় সমস্ত সম্প্রদায়ের নিপীড়িত অংশের মানুষকে সমবেত করে ব্যাপকতর আন্দোলন সংঘটিত করতে। এর মধ্যদিয়েই তারা একটি বাম গণতান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও দলিতদের জীবন জীবিকা ও সামাজিক নিপীড়নের প্রশ্নে পার্টিকে সুনির্দিষ্টভাবে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে শ্রেণীগত প্রশ্ন ও সামাজিক প্রশ্নকে একসঙ্গে মোকাবিলা করে জাতপাত ভিত্তিক বিভাজনের ক্ষতিকর প্রভাবের মোকাবিলা করা যায়। বামপন্থী দলগুলো জাতপাত ও শ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক বিবরণের প্রশ্নটিকে শ্রেণীগত বিষয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে।[42] পরিচিতি সত্তার বা জাতপাতের রাজনীতিকে বামপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছে তা বলা যায় না। এমনও হবে যখন ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলার সময় আমাদের এমন বিষয় তুলে ধরতে হতে পারে যা নিয়ে পরিচিতি সত্তার নির্ভর রাজনীতি করে এমন গোষ্ঠীগুলিও সোচ্চার হয়েছে। যেমন যখন আমরা দলিত স্বার্থ তুলে ধরি ও জাতপাত ভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করি তখন কিছু কিছু জায়গায় এধরনের গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমাদের হাত মেলাতে হতে পারে।

---

[41] কারাত, প্রকাশ, *পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, পৃ. ১৩।

[42] কারাত, প্রকাশ, *পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, পৃ. ১৩।

বিশেষত যেখানে তাঁরা গণজমায়েত করতে পেরেছে। আদিবাসী ও দলিতদের পরিচিতি সত্তার তথা জাতিসত্তার আঁধারে শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে তথাকথিত অনুসগ্রামের তত্ত্ব হাজির করা হচ্ছে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বনের দাবি করে তাদের রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই থেকে যায়। শ্রেণী শোষণের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়।[43] বামপন্থীরা শ্রেণী ও জাতপাতের প্রশ্নকে শ্রেণীর নিরিখে বিচার করে শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার উৎপত্তি ও প্রকৃতি

ভারতের তথা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোতে চারটি বর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। এই বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে আবার অনেকগুলো জাতি রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্য গোষ্ঠীরা মূলত পুরোহিত যোদ্ধা এবং উৎপাদক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটে গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সনাতনী সমাজ কাঠামোতে এই ধরনের শ্রেণী বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে নয় পশ্চিমবাংলার সনাতনী সমাজ কাঠামোতে এই ধরনের শ্রেণী বিভাজনো লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে পরাজিত এবং দমিত জনগোষ্ঠীকে 'দাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে 'কৃষ্ণবর্ণ' বলে। তাঁদের কথাবার্তা দুর্বোধ্য। তাঁদের আনুষ্ঠানিক পশুবলি নেই। তাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন এবং তাঁদের প্রথাসমূহ অদ্ভুত ধরনের। আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃতি এবং জাতিগত বিশিষ্টতা এই উভয় দিক থেকেই দেশীয় মানুষজন ছিল আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র।[44] এইসব বিজিত মানুষকে একত্রে একটি পৃথক শ্রেণীতে পরিণত করে নাম দেওয়া হল 'শূদ্র'। এটি 'চতুর্থ বর্ণ' হিসেবে পরিচিতি পায়।[45] বাঙালি সমাজের মধ্যে এই চতুর্বর্ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতপাত নিয়ে গবেষণা করেছেন যে সকল বাঙালি তাত্ত্বিকগণ তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বা বাঙালি জীবনের জাতপাতকে এই চতুর্বর্ণের ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই আলোচনা করেছেন। আর্য

---

[43] *মার্ক্সবাদী পথ ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা,* ফেব্রুয়ারি মার্চ,২০১৭, পৃ. ৪৩।

[44] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. .১৯।

[45] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. পৃ.১৯।

অনার্যদের নিয়ে গঠিত এই যৌগিক সমাজব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল সর্বনিম্ন।[46] আর্য অনার্য বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় যারা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী তথাকথিত জনপদ থেকে দূরে থাকতেন তাঁরা হলেন শূদ্র। তথ্যগতভাবে বর্ণের অর্থ হল 'গুণ'। সমাজ ব্যবস্থায় ও সামাজিক কাঠামোতে প্রত্যেক ব্যক্তির কতগুলো সহজাত গুণের ভিত্তিতে একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে বর্ণ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। মূলত বর্ণ বিভাগগুলি বংশগত এবং বংশগুলির মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। বর্ণ বিভাগগুলিতে একটি ক্রমোচ্চ বিন্যাস বিভাজনের যোগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণরা শিক্ষিত পুরোহিত মানুষ যাদের কাজ শিক্ষাদান, শাস্ত্র অনুসারে আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। রাজপথ অলংকরণ করা ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা ক্ষত্রিয়দের কাজ। শূদ্ররা ছিল কৃষক, কারিগর ও ছোটো ব্যবসায়ী শ্রেণী। বর্ণ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। পরবর্তী স্থান অধিকার করেন ক্ষত্রিয়রা। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বহুকাল ধরেই বিবাদ-বিসংবাদ চলতেই থাকতো। সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ব্রাহ্মণরা সবসময় সামাজিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। তবে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ক্ষত্রিয় রাজাদের এবং সৈন্যবাহিনীকে শাসনে আনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরোধের অন্যতম কারণ। বর্ণ ব্যবস্থায় ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্র অনুসারে বর্ণগুলি স্বতন্ত্র ও অন্তঃগোষ্ঠীর বিবাহ সমাজকে কতগুলো দলে বিভক্ত করে। তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন বর্ণগুলির ক্রিয়াকর্ম চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত গুণাবলী পূর্ববর্তী ভিত্তির উপরেই নির্ধারিত হয়। জাতপাতের ভিত্তিতে নিম্নতম বর্ণ গুণই প্রদর্শন করে না। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসের যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। যে তত্ত্বটাকে বিপুলভাবে গ্রহণ করেছে হিন্দু সমাজ। বর্ণ ব্যবস্থা ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ এবং সামাজিক ব্যাপার হিসাবে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা অভ্যন্তরীণ গঠন এবং শূদ্র জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ত্বরান্বিত করেছে। কঠোর নিয়মানুবর্তী ভাবে জাতিগুলি ক্রমোচ্চ শ্রেণীর সজ্জায় সজ্জিত। অপেক্ষাকৃত

---

[46] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯ ।

পবিত্রতর জাতিগুলি ক্রমোচ্চ বিন্যাসে উপরে অবস্থিত।[47] একদিকে শ্রেণী বিভাগে জাতিগুলির পদমর্যাদা ও অন্যদিকে তাঁদের পেশাগুলির সঙ্গে যুক্ত উন্নতির সম্ভাবনার মধ্যে একটি সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

বাংলায় বৈদ্য বা চিকিৎসক, এবং যাঁরা পেশায় মূলত লেখক বা করণিক তাঁরা জাতি হিসেবে প্রশাসনিক ভাবে জমির মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাই ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের একেবারে শীর্ষস্থানে থাকে। কারিগর জাতিগুলি যাঁরা বেশিরভাগ ব্যবসায়ী। কৃষক জাতিগুলোর মধ্যে পান চাষি, বারুই এবং ফুলচাষী, মালাকার (যারা মালা গাথে) তাঁরা মূলত শূদ্রগণের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই দুটি জাতি ছাড়া আর সব কৃষক জাতি বিভিন্নভাবে শূদ্র জাতির তুলনায় নিচের সারিতে থাকে। হিন্দু সমাজের গোঁড়া আদর্শ অনুসারে কোনো জাতির অর্জিত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাত্রা ও ক্রমোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দিক থেকে বৈদ্য, কায়স্থ, সবথেকে অগ্রসর জাতি। আর ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাজনের নিম্নস্তরের জাতিগুলির মধ্যে অন্তর্গত জাতিগুলো হল বাগদি, হাড়ি যারা তাদের উপরের জাতিগুলির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

‘শুচি’ ও ‘অশুচি’র ধারণাটিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। বংশগুলির মধ্যে বিবাহ সম্পর্কের দ্বারা জাতিগুলির কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অন্য জাতিগুলোর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়। একটি বিশেষ বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহমত এবং ভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কাম্য নয় বলে বিবেচিত হয়। জাতি অপর জাতির বিশেষ ধরনের অভ্যাস, প্রথা এবং আচরণগুলোকে কিছুটা অপবিত্র বলে মনে করত। সুতরাং তাদের সংস্পর্শে নিজেদের মর্যাদা দূষিত হতে পারে। একই সারির ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই ভূমিতে একসঙ্গে আহার করতে পারে। কিন্তু নিম্নতর পদমর্যাদার ব্যক্তিগণ সেই জায়গায় প্রবেশের অনুমতি পায় না। তাহলে আহার্য অশুচি হতে পারে।[48] একটি জাতির পবিত্রতা অপবিত্রতার মাপকাঠি

---

[47] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাত, ১৯৯৮, পৃ. ২৭।

[48] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাত, ১৯৯৮, পৃ. ২৯।

নির্ধারিত হয় ব্রাহ্মণদের প্রতি ঐ জাতির মনোভাবের প্রকৃতির উপর। ব্রাহ্মণদের পবিত্র বলে মনে করা হয়। তাঁদেরকে বিয়ে ও শুচি কাজে নিয়োগ করা হয়। ব্রাহ্মণের শুদ্ধতা নষ্ট হয় না এবং ব্রাহ্মণের জাতি দূষিত হয় না। জাতিগুলো বংশকুলের বিবাহসূত্রে কতগুলি খণ্ডিত জাতিতে বিভক্ত। বঙ্গদেশের খণ্ডিত জাতিগুলির শ্রেণী সমাজ বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে কখনো কখনো জাতিগুলির অন্তঃস্থ্ বিভিন্ন শ্রেণীর উচ্চতর মর্যাদার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। নিজের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শ্রেণীগুলির নিজেদের মধ্যে বিবাহ দেয় না এমনকি এক পঙক্তিতে একে অন্যের সঙ্গে আহারও করেনা।[49] জাতিগুলির বিবর্তিত পর্যায়ের মধ্যে অনেক শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতিগুলির মধ্যে ঐতিহ্যগত পেশার সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে। আবার পেশার খণ্ডিত অংশ নতুন নতুন খণ্ড জাতি গঠনে উৎসাহ যোগায়। অর্থাৎ অনেক সময় খণ্ডিত পেশা নতুন পেশার উদ্ভব ঘটায় এবং নিজেরাই এক নতুন খণ্ড জাতিতে পরিণত হয়।

পশ্চিমবাংলার কোনো কোনো অংশে শেঠ আর বসাকরা মিলিত হয়ে গঠন করে 'শ্বেত বসাক' সমাজ। এঁরা স্থানীয় তাঁতিদের মধ্যে সর্বোচ্চ সমাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও নতুন নতুন খণ্ডিত জাতি গঠন করতে পারে। গোষ্ঠীগুলি তাদের গোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চ পর্যায়ে পদমর্যাদার দাবি করতে পারে। আবার কখনো কখনো ভিন্ন ভিন্ন জাতির কয়েকটি বিভাগ তাঁদের নিজেদের ঐতিহ্যগত পেশা পরিত্যাগ করে অন্য লাভজনক পেশা অবলম্বন করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিগুলির নিজেদের থেকে অধিকতর সমৃদ্ধশালী পেশা গ্রহণ করে নিজেদের ক্রমোচ্চ উচ্চ পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে। জাতিগুলির ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ প্রযুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে অথবা সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত জাতিগুলির উচ্চতর স্থান এবং শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চ পদমর্যাদা পেয়েছিল। এই জাতিগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীভূত হওয়ার যোগ দেখা যায়।[50]

---

[49] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাত, ১৯৯৮, পৃ. ৩০।

[50] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়র্কস, কলিকাত, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।

জাতপাত উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব

বাংলার জাতপাত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন লেখকের গবেষণায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে বাংলার বৃহত্তম তপশিলি জাতিগোষ্ঠীগুলো জাতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাদের স্বতন্ত্র তত্ত্বের অবতারণা করেছে। এদের মধ্যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র জাতিসংক্রান্ত গবেষণাগুলো উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলায় যাদের নমঃশূদ্র বলা হয় পূর্বে তারা চণ্ডাল নামে অভিহিত হতো। বাংলার তথাকথিত চণ্ডাল বা নমঃশূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে মনুর চণ্ডাল জাতিতত্ত্ব বা যৌনমিলনের তত্ত্ব এবং রেসিয়াল থিওরিকে অস্বীকার করা হয়েছে। সীতানাথ বিশ্বাস তাঁর লেখা 'জাতিতত্ত্ব অনুকূল দর্পণ' গ্রন্থে (১৯৩০ সালে) মত প্রকাশ করেছেন যে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তানকে চণ্ডাল বলার যুক্তি বাংলার নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে রাসবিহারী রায়ের *নমঃশূদ্র দর্পণ* ও শশীভূষণ বিশ্বাসের *নমঃশূদ্র তত্ত্ব,* নমঃশূদ্রদের শূদ্র হিসেবে না দেখে আচার-আচরণ ও সামাজিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক তাঁদের ব্রাহ্মণদের সমান দেখা হয়।[51]

এক্ষেত্রে সকলেই নমঃশূদ্রদের কৃষ্টিকরণের ধারণাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নরেশচন্দ্র দাস বাংলায় নমঃশূদ্রদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল শূদ্রদের নমস্কার করার যোগ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমান সময়ে নমঃশূদ্রদের একটি কৌম গোষ্ঠী (সাব-কাস্ট) হিসেবেই দেখা হয়। একইভাবে নমঃশূদ্র সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কেও প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করা হয়।[52] পৌণ্ড্র লেখক শ্রীমন্ত নস্কর তার *জাতি চন্দ্রিকা* ও *ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পরিচয়* গ্রন্থে পৌণ্ড্রদের সংকর জাতি না বলে 'পদ্মরাজ' হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্য একজন পৌণ্ড্র পণ্ডিত বেণীমাধব হালদার *জাতি বিবরণ* গ্রন্থে এবং মহেন্দ্রনাথ করণ তাঁর একাধিক গ্রন্থে— *A Short History and Ethnology of The Cultivating Pods: An exposition of the origin of the Cultivating Pods, their status, ways of life and social manners and customs* (১৯১৯); *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয়* (১৩৩৪ সাল, ইং-১৯২৭); *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়শৌচ-বিবেক; ব্যবস্থাবলী; বাঙলার জাতি সমস্যা; পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতীয় সঙ্গীত* ও *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ* (১৯২৮)-

---

[51] বিশ্বাস, সতীনাথ, *জাতিতত্ত্ব ও নমস্য কুলদর্পণ,* ঢাকা, ১৯৩০।

[52] বিশ্বাস, শশীভূষণ, *নমঃশূদ্র দ্বিজাতি তত্ত্ব,* বরিশাল, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

উৎপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করে দাবি করেছেন যে, পৌণ্ড্ররা বর্ণ পরিচয়ে ক্ষত্রিয়ই, কোন ভাবেই শূদ্র নয়।[53]

অন্যদিকে রাজবংশী জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে *রাজবংশী কুলপ্রদীপ* গ্রন্থে হরকিশোর অধিকারী ও মনিরাম কাব্যভূষণের *রাজবংশী ক্ষত্রিয়দীপক* ও জগমোহন সিংহের *ক্ষত্রিয় রাজবংশী কৌমুদী* গ্রন্থে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বাংলার প্রধান এই তপশিলি জাতিগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের ধারণার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শাস্ত্রীয় বা ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বাংলার তপশিলি জাতিদের যেরকম নিচু জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে অন্যদিকে বাংলার তপশিলি পণ্ডিতগণ, সমাজতাত্ত্বিকগণ নিজেদের জাতিসত্তা পরিচিতি প্রতিষ্ঠাকে সামাজিক মর্যাদা তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। যেখানে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা কৃষ্টিকরণ প্রক্রিয়াকে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। নিজেদের জাতিসত্তাকে উচ্চবর্ণ জাতিগুলির সমগোত্রীয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাতে ভারতে প্রথম জাতপাত ভিত্তিক জনগণনা শুরু হয়। **১৯৩১** সালের জনগণনায় বাংলার জাতি গণনা হয়। বাংলার বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া বাদে অন্যসব জেলাতে উচ্চ জাতি হিন্দুদের সংখ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্মল কুমার বসু দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা শিক্ষা এবং উচ্চকোটির পেশাগুলি দখল করে আছে। বাংলার জাতপাত ভিত্তিক জনগণনায় উঁচুজাতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা প্রায় পুরোপুরি দখল করে আছে। জাতপাত ভিত্তিতে যাঁরা তপশিলি তারা কৃষি কারিগরি, শিল্প ছোটো ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। জাতপাত ভিত্তিক তপশিলিদের ‘ডিপ্রেসড ক্লাসেস’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

জাতি ও ধর্ম বিভাজন, **১৯৩১** জেলার জনসংখ্যা শতকরা

[53] সরকার, কৃষ্ণ কুমার, ‘বাংলার পৌণ্ড্র জাতি-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত’, প্রকাশিত, মৃন্ময় প্রমাণিক *(সম্পা), দলিত সাহিত্য চর্চা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২, পৃ.পৃ. ৩৩১-৩৩২।

জেলা	উঁচু জাতি হিন্দু	মধ্য জাতি হিন্দু	পশ্চাৎপদ শ্রেণী
বর্ধমান	৯.৮১	২৯.০৭	৩৪.৫০
বীরভূম	২২.৪৫	৩৬.৫	
বাঁকুড়া	১১.২৯	৩৯.৭০	৩১.৮১
মানভূম	৭.০৭	৩৭.৫০	২২.৪২
মেদিনীপুর	৬.৩১	৫৮.১৭	১৯.১৫
হুগলি	১০.৩৩	৪১.৮১	১৭.০
হাওড়া	১০.৪৮	৪৬.৫৮	২০.৮৬
২৪ পরগনা	৬.০৪	২৭.৬১	২৯.৯৪
নদীয়া	৪.৮৪	২১.৯৯	১০.১
মুর্শিদাবাদ	৩.৭৯	২৫.৩১	১৩.২৪
মালদা	১.৪১	২৫.৮৪	১০.২১
দিনাজপুর	১.৩২	৩২.৭০	৫.৭৬
জলপাইগুড়ি	১.৮০	৪৩.৮২	৪.০৭
কোচবিহার	১.৮৭	৫৯.৪৮	২.৭৪
দার্জিলিং	৩.১২	১৪.৫০	২.৩৮

সূত্র: **১৯৩১** সালের জনগণনা[54]

[54] Cencus of India, 1931.

১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুসারে সবথেকে বেশি উঁচু জাতের হিন্দু বসবাস করে যথাক্রমে বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং বর্ধমান জেলায়। উপরে সারণি অনুসারে বলা যায় সবথেকে বেশি মধ্য হিন্দু বসবাস করেন কোচবিহার জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায়। জলপাইগুড়ি, হাওড়া, হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলায়। এছাড়াও পশ্চাৎপদ শ্রেণী বর্ধমান, বীরভূম জেলায় সংখ্যাধিক্য এবং ক্রমানুসারে বাঁকুড়া, নদীয়া, মানভূম জেলায় অবস্থান করেন।

অন্যদিকে স্বাধীনতার পর হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া আর বিশেষ করে নদীয়া জেলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা **১৯৩১** এর তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এইসময় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর পরিমাণ নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে তুলনামূলকভাবে তপশিলি জাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার অন্যতম কারণ হলো **১৯৩১** সালের আগে রাজবংশীদের 'ডিপ্রেসড ক্লাস'র মধ্যে ধরা হয় নি। **১৯৩১** সাল থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি বিভাজনের চিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

সারণি:২.১. দলিত, আদিবাসী ও মুসলিম জনসংখ্যা (২০০১ জেলার জনসংখ্যার শতকরা)

জেলা	তপশিলি জাতি	উপজাতি	মুসলিম
বর্ধমান	২৬.৯৮	৬.৪১	১৯.৭৮
বীরভূম	২৯.৫১	৬.৭৪	৩৫.০৮
বাঁকুড়া	৩১.২৪	১০.৩৬	৭.৫১
পুরুলিয়া	১৮.২৯	১৯.২৭	৭.১২
মেদিনীপুর	১৬.৪০	৮.৩১	১১.৩৩
হুগলি	২৩.৫৮	৪.২১	১৫.১৪
হাওড়া	১৫.৪২	০.৪	২৪.২২

উত্তর ২৪ পরগনা	২০.৬০	২.২৩	২৪.২
দক্ষিন ২৪ পরগনা	২০.৬০	২.২৩	২৪.২২
নদীয়া	২৯.৬৬	২.২৩	২৫.৪১
মুর্শিদাবাদ	১২.০০	১.২৯	৬৩.৬৭
মালদা	১৬.৮৪	৬.৯০	৪৯.৭২
উত্তর দিনাজপুর	২৮.৭৮	১৬.১২	৩৩.২৪
দক্ষিন দিনাজপুর	২৮.৭৮	১৬.১২	৩৩.২৪
জলপাইগুড়ি	৩৬.৭১	১৮.৮৭	১০.৮৫
দার্জিলিং	১৬.০৯	১২.৬৮	৫.৩১
কোচবিহার	৫০.১১	০.৫৭	২৪.২৪

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ২০০১ থেকে নিরূপিত।[55]

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে কোচবিহার জেলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা সবথেকে বেশি। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, নদীয়া জেলায় পর্যায়ক্রমে তপশিলি জাতিদের অবস্থান। জেলাগুলোর মধ্যে তপশিলি জাতি সংখ্যা সবথেকে কম মুর্শিদাবাদে এবং পর্যায়ক্রমে হাওড়া, দার্জিলিং, মেদিনীপুর ও মালদা জেলায় অবস্থান করে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই জেলাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে

[55] Cencus of India, 2001

সাক্ষরতা ও জীবিকার নিরিখে তপশিলি জাতিদের অবস্থান খুবই নগণ্য। উঁচু জাতের সাক্ষরতা জীবিকার অবস্থান সর্বাধিক। অর্থাৎ জাতি চেতনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় তপশিলিদের জেলার নিরিখে জনসংখ্যা বেশি হলেও ক্ষমতার রাজনীতিতে এরা অনেকটাই পিছিয়ে।

জাতিগুলির নির্বাচিত জাতিগুলির মোট জনসংখ্যার শতাংশ

জাতি	সাক্ষরতা	কৃষি	শিক্ষা	উচ্চ পেশা
ব্রাহ্মণ	৩৭.২৮	১৫.৩৮	৪.৫০	৩০ ৭৬
বৈদ্য	৫১.৭	৬.০৪	১.৮৫	৪৯.৪০
কায়স্থ	৩২.৯০	২০. ০৩	৫.১৬	২২.৪২
গোয়ালা	১০.১৭	৩৭.৪৯	৭.২৮	৫.৪২
কামার	১৪.৫১	২১.৮১	৫৬.১১	৫.৩২
বাগদি	১.৯২	৮১.৭৪	৫.০৩	১.১৭
বাউরী	০.৭৭	৬৫.৯৪	৪.০৭	০.৭৮

সূত্র: নির্মল কুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গঠন,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯।[56]

উপরেউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ আমলে বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ছিল অধিক। জমির মালিক ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক পেশাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের স্থান ছিল অনেকটাই সংখ্যাধিক্য। তুলনামূলকভাবে জাতপাতের দিক থেকে বাঙালির নিম্নবর্গের মানুষের সাক্ষরতা কৃষিশিক্ষা উচ্চ স্থান ছিল খুবই নগণ্য। উচ্চবর্ণের মধ্যে বৈদ্যরা ছিলেন সর্বাধিক সাক্ষর এবং সর্বাধিক উচ্চ পেশায় নিযুক্ত। পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ছিল সাক্ষর ও তাঁরা উচ্চ পেশায় নিযুক্ত। অন্যদিকে তপশিলি

[56] বসু, নির্মল কুমার, *হিন্দু সমাজের গঠন,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৯।

জাতির মানুষরা বেশিরভাগই ছিল নিরক্ষর এবং কৃষির উৎপাদন কাজের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ তপশিলি মানুষগণ বাংলার উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে এবং কৃষিজীবী হিসেবেই বেশি নিযুক্ত ছিল।

১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাজবংশীরা তপশিলি জাতিভুক্ত ছিল না। রাজবংশীদের 'মধ্য জাতি' হিসেবে ধরা হতো। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর জেলায় এঁদের আধিক্য ছিল। অন্যদিকে মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া জেলাতে মাহিষ্যদের সংখ্যাধিক্য ছিল। মধ্য জাতিগুলোর মধ্যে প্রধান হলো সদগোপ, গোয়াল, কুর্মি, কামার, খয়রা, তাঁতি, কুম্ভকার প্রভৃতি।

সারণি:২.২. সংখ্যাবহুল মধ্য জাতি, ১৯৩১ (জেলার জনসংখ্যার শতাংশ)

জেলা	জাতি
বর্ধমান	সদগোপ ৬.৩১ গোয়ালা ৪.৩৪, কলু তেলি ২.০৪
বীরভূম	সদগোপ ৮.২০, কলু তেলি ২.৩৮
বাঁকুড়া	গোয়ালা৫.৮২, তিলি ৪.৯৩ সদগোপ ৩.৯৩ কলু দিলি ২.৭৯, খয়রা ২.৪২ তাঁতি ২.২১ কামার ১.৯৩, কর্মী১.৮৬ মাহিষ্য ১.৮২
মানভূম	কর্মী ১৭.৮৪, কুমহার ৩.১৫, তেলী ২.৬৮, গোয়ালা ২.২৬ কামার ১.৯৬
মেদিনীপুর	মাহিষ্য ৩১.৫৫, সদগোপ৩.৯২ কোমর ৩.০৬ তাঁতি ৩.০৩ বৈষ্ণব ২.২০ রাজু ১.৯৬
হুগলি	মাহিষ্য ২৪.৯২ গোয়ালা ২.৫১ সদগোপ ১.৯২
হাওড়া	মাহিষ্য ২৪.৯২, গোয়ালা ২.৫১ সদগোপ ১.৯২
২৪ পরগনা	মাহিষ্য ১২.১৪, গোয়ালা ২.৬২
নদীয়া	মাহিষ্য৬.৪৯ গোয়ালা ৩.৫০
মুর্শিদাবাদ	মাহিষ্য ৫.৪৮, সদগোপ ৩.৮২, গোয়ালা ২.০৬
মালদা	রাজবংশী ৩. ৯৯
দিনাজপুর	রাজবংশী ২০.৫৩

জলপাইগুড়ি	রাজবংশী ৩৩.৬৮
দার্জিলিং	রাজবংশী ৮.৪৪
কোচবিহার	রাজবংশী ৫৩.৯৬

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১, পঞ্চম ও সপ্তম খন্ড থেকে নিরূপিত।[57]

[57] *Cencus of India, Vol, V & VII.*

পশ্চিমবঙ্গের দলিত জাতিগুলোর জনসংখ্যা ১৯৬১ থেকে ২০০১

সারণি:২.৩. পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও জনসংখ্যা (১৯৬১-২০১১)

	জাতি	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
	সমস্ত তপশীলি জাতি	৬৮,৯০,৩১৪	৮৮,১৬,০২৮	১,২০,০০,৭৬৮	১,৬০,৮০,৬১১	১,৮৪,৫২,৫৫৫	২,১৪,৬৩,২৭০
১	বাগদি	১০৯৬৮৮৫১	১২৯১১২৭	১৮৩১৫৬৫	২৩৫৪৬০৯	২৭৪০৩৮৫	৩০,৫৮,২৬৫
২	বাহেলিয়া	১২৬৩	২১৮৯	৪৬০২	৭৯২১	৫১২৪	৫,৬৯২
৩	বাইতি	৮২৬৯	৭৪১০	১০০৩৪	১৪৬৯১	১২৪০৮	১৩,৭৫৩
৪	বানতার	৪৩৫	৬৩৭	২০৮৬	৫৪৫২	৭৫৩	১৩৮
৫	বাউরি	৫০১২৬৯	৬২৪০৭৭	৭৩২২০৫	৯৫০৬৯২	১০৯১০২২	১২,২৮,৬৩৫
৬	বেলদার	১৭৯৫	১৬৮২	১৮২৯	৪৭২৭	৪২১৩	৫,২৬১
৭	ভোগতা	৯৮৭	৩৩৩	১৩৮০৭	১৬৪২৫	১৫৪৭৮	১৮,২৬৯
৮	ভুঁইমালি	৩৯১৮১	৪৫০৫৯	৪৭৫২১	৬৭৮৮৭	৮১১০৩	৮৪,৯৫৬
৯	ভুঁইয়া	৫৩৩২৯	৫৮৪৫৩	৯৩৪১১	১২০৩৭৭	১২৭১৯৯	১,৪০,৩৫৭
১০	বিন্দ	২২৯৪২	২০৭৭২	৩৪০২৮	৪৫০৬৭	৫১৮২৮	৭০,৭২৬
১১	চামার	৩৯৬৫৯১	৫০৭৭৫৯	৭১১০২৪	৯২৪৫৪৭	৯৯৫৭৫৬	১০,৩৯,৫৯১

১২	চৌপাল	৫২৩	৬৫৫	২৫১৫	৮৩১২	৬৩৭৫	৫,৯৭৪
১৩	দাবগার	৭২	৯৩	৪৬০	১৫৯৯	১৪০	২৫২
১৪	দামাই (নেপালী)	১১৪৮৬	১১৫৫৩	১৮৮৪২	২৩৩৬৭	১৭৩৮৭	১৮,৩১৪
১৫	ধোবা	১৫৪৭৯১	১৯১০৬৩	২৫১৭৩৭	৩৩৯৫৫৫	৩৬৯৮০৮	৩,৮৫,২৮০
১৬	দোয়াই	১৪১৯১	৪৭৭০	৮০৫৪	১০২৩২	৫০৮৯	৯,৪৩৬
১৭	ডোম	১৫১৮১৮	১৭৪৩৬৭	২৩১৫৯৫	২৮৩৬৯১	৩১৬৩৩৭	৩,৫২,০৮৩
১৮	দোসাধ	২৫৮৩৫	৩২০৭২	৩৯২৮৪	৫৫০০৫	৬২২৫৮	৬৫,৪২৯
১৯	ঘাসি	১১৯৪১	১৬৪৯৪	১৭৪১১	২১৬৭০	১৫৮৮১	১৭,৯০৯
২০	ঘোনড়ি	১৩৮৫৯	১২১৫৩	১৪৮৩২	২৪২২৪	১৮৫৮৩	৯,৬৮৭
২১	হালালখোর	৩২৬	৪৭৯	১৩৪৮	২৩৮৯	১৪৩৭	১,১৭৪
২২	হাড়ি	১২৫৮৮০	১৬১৩৫৭	২৬৭৪৬৫	৩৬০৭৩৬	৩৯০৬১৯	৪,৩১,২৫৭
২৩	জালিয়া কৈবর্ত্য	১১৭৩৮৪	২০৪৬৭৯	৩১৮৩৪৪	৪৪২৭৮৩	৪০৯৩০৩	৫,৬৯,৪৪৮

২৪	ঝালোমালো	৬৮৭৫৭	৮৯৯১৮	১৫০৫৫৭	২২০৩০৬	২৯৩৭১৪	৩,০৩,৬১৮
২৫	কাদার	৫৬১০	৭৪০০	৯৭৮২	১৫৬৫৭	২৫৩৫০	২৩১৭৯
২৬	কামি (নেপালী)	২৬১৪৮	৩১৫৯০	৪২৪৯৩	৫৬২১২	৪৯৭০৪	৫২,১৭৮
২৭	কাঁদরা	২৫৪৩০	৪২২৯৪	৬৫১৮৩	৮০১৩১	৯২৩৬৪	১,১২,০৩৮
২৮	কাঞ্জর	১৪১৭	১২১৯	১০৬৭	১৮৪৯	২৭৯	৪৩৫
২৯	কাওড়া	১১৭৯২৯	১৪৫৪৪২	১৮০৯১২	২৪৯৪০০	২৬৩৭৩১	২,৭২,৮০১
৩০	করেঙ্গা	১১৩৩২	১২৩৮৮	২১১২৯	২৭০১৬	৩৩৫৬৩	৩৬,৬১২
৩১	কাউর	২৩৯৪	৫৮৪১	২০৮৬০	২৩৬৭০	১১৩৮৪	১৩,০৫৯
৩২	কেওট	২৩১৭৪	২৪৩৯৭	৪৫২৮২	৬০৭০৪	৭৪০৭৮	৮৮,৫৩০
৩৩	খয়রা	৬৭৯১৩	৬৩৫১৩	৭৭৬০৫	৮৯৯৭০	১১১৯৬৭	১,২৯,০০১

৩৪	খটিক	২৭১৬	১৪২৫	৪৮৬২	১২৫৭৭	৯০৫০	৮,৮৩৭
৩৫	কোচ	৩৫২২	১৭২৫৭	৯৭১৪	১৪৮৪৪	১২৭২৭	১২,১২৩
৩৬	কোনাই	৪৩১০১	৫৯২২৩	৭১৪২৩	৯০০২৩	১০৮৭৯৫	১,২৪,১২৬
৩৭	কোনওয়ার	৩৮৯৫	১৪৬৯	২৮৪১	৫৪৮৬	৪৭৭৯	৪,৩৭৬
৩৮	কোটাল	৭৭০০	১৫৫৩৭	১৯৩১০	২২৬০৬	২৫০৫২	২৫,৪৩০
৩৯	কুড়ারিয়ার	৭৭২	১৬৪	১৪১৬	১৫৫৫	৮৩৭	৯৪২
৪০	লালবেগি	৮৪৫	১৩৮৪	১১৭৯	১৩৬০	৫৬১	৪৮১
৪১	লোহার	৮৩৫৪৫	১০৩০৩৩	১৫১৬০৯	২১৯৭৯৮	২৭৯৫৮২	৩,১৫,০৯৩
৪২	মাহার	৬৭৬০	১২২২১	১৭৭০৬	২৩৬৩০	২৭৩৬৪১	৩৪,৭৯৩
৪৩	মাল	১১৭৭০৪	১৫৮৪১৯	২০৪৭৭৫	২৩০৬৩৮	২৭৩৬৪১	৩,০৬,২৩৪
৪৪	মাল্ল	১২৩৬৬	২১৫৯৬	৩৮১০৩	৪৯৪১৫	৫১৫০১	৫০,২৫২

৪৫	মুসাহার	১৩০৫৮	১২৪২৬	১৭৬২৮	২২৮০৪	২২৩৩২	২০,৯৪৯
৪৬	নমঃশূদ্র	৭২৯০৫৭	৯৮০৫২৪	১৬৯২২৩৩	২৫৮১৫৪৯	৩২১২৩৯৩	৩৫,০৪,৬৪২
৪৭	নট	৮৯৯	৭৪	৩৩৭৬	৩৮৮০	১৭৮১	১,১৪৬
৪৮	নুনিয়া	১৭৫৬১	২১৫৩১	৪১৫৩১	৪৮৯৭১	৫৬৮৮৮	৬০,৯৪১
৪৯	পালিয়া	৭৩৯৯৭	১০০৫৭১	১১৬৮১৯	১৩৩৮০৬	১৩০৮১৭	১,০৫,২৯০
৫০	পান	৩৩৭০	৩৬৯০	৯৩২৮	১৫৩১৯	২৩০৩২	২৮,২৫৯
৫১	পাসি	১৩৮৮১	২০৪৭৮	২১৩৬৭	২৮৩৭৮	২৫৪৬০	২৯,৪৯১
৫২	পাটনি	৬২৮৮	১২৭৮১	২২৪৬৬	২৯৫১৫	৩০৪২৯	৩১,১৮৮
৫৩	পোদ	৮৭৫৫২৫	৯৭৫৩৫২	১৫৩৬১৯৭	১৯৮৫২৪৩	২২১৬৫১৩	২৪,৫০,২৬০
৫৪	রাজবংশী	১২০১৭১৭	১৩৫৩৯১৯	২২৫৮৭৬০	২৮৩৯৪৮১	৩৩৮৬৬১৭	৩৮,০১,৬৭৭

৫৫	রাজওয়ার	৪১১৩৩	৫৩১৬৮	৮৫৩৭৪	১১০১৭৬	৯৯৫৬২	১,১২,১৮৪
৫৬	সরকি(নেপালী)	৫২৩২	৫৩৩৭	১১২৯২	১৬৯০৯	১১১১১	১৩,৬১৮
৫৭	শুঁড়ি (সাহাবাদে)	১০৬৮৭০	১৬৬৪১৮	১৫২৩৩১	৩২৯৭৭০	৩১৭৫৪৩	৩,৩৭,৬০৯
৫৮	তিয়র	৩৯৬৩৩	৭৯৭৮৬	৮২১০৬	১৫৯৪৯৯	১৯৫৩৪০	২,২৭,৮০০
৫৯	তুড়ি	১৯০৪৮	২৩১৯০	২৮৪৪৩	৩৯৯০৮	৩৮৭৩৮	৩৫,১১৬
৬০	চাঁই	-	-	-	-		**৩,২৩,৫৯৫**

সূত্র: ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ও ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে গবেষক এই সারণিটি প্রস্তুত করেছেন।[58]

২০১১ সালের জনগণনাতে সমগ্র ভারতে তপশিলি জাতিগুলির জনসংখ্যা ছিল ১৬,৬৬,৩৫,৭০০। এই জনগণনা পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতিগুলির জনসংখ্যা ছিল ১,৮৪,৫২,৫৫৫। এটি রাজ্যের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং ভারতে মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার ১১.৭ শতাংশ। এই নিরিখে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থান উত্তরপ্রদেশের। উত্তরপ্রদেশে ভারতের মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার ২১ শতাংশ বসবাস করে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিহার। সমগ্র ভারতে মোট তপশিলি জাতির ৭ শতাংশ বিহারে বসবাস করে।

[58] *Cencus of India, 1961, 1971, 1981, 1991 & 2001.*

সমগ্র ভারতের মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের আগে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার অবস্থান। সমগ্র ভারতের মোট তপশিলি জাতির ৭ শতাংশ সেখানে বসবাস করে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার তপশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের আগে পাঞ্জাবে রয়েছে ২৮.৫ শতাংশ এবং হরিয়ানাতে রয়েছে ২৪.৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থান ২৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতিগুলি পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো স্বাধীনতার পূর্বে বাংলায় যে তপশিলি ফেডারেশন গড়ে উঠেছিল তা ছিল মূলত পূর্ববাংলা কেন্দ্রিক। পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী নমঃশূদ্র জাতিরা ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধি। বাংলা ভাগের পর সেই আন্দোলন অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতিগুলির সংখ্যাগত অবস্থান ও জাতিগত বিভাজন এঁদের মধ্যে বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে অন্তরায় হয়ে ওঠে।

সারণি:২.৪. জনসংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে ৫ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট তপশিলি জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	দলিত জনসংখ্যার শতাংশ
রাজবংশী	৩৩,৮৬,৬১৭	১৮.৪
নমঃশূদ্র	৩২,১২,৩৯৩	১৭.৪
বাগদি	২৭,৪০,৩৮৫	১৪.৯
পৌণ্ড্র	২২,১৫,৫১৩	১২.০
বাউরি	১০,৯১,০২২	৫.৯
চামার	৯,৯৫,৭৫৬	৫.৪

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ২০১১।[59]

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার সামগ্রিক ভৌগোলিক চিত্র জানার জন্য কয়েকটি জাতপাত ভিত্তিক গোষ্ঠীর আলোচনা করা হলো। এরমধ্যে সর্বপ্রথম এই হল রাজবংশী সমাজ। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে এরা সংখ্যাধিক্য। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর

[59] *Cencus of India, 2001.*

দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার কিছু অংশে এদের অবস্থান। ১৮৭২ সালের জনগণনায় তপশিলিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১১লক্ষ ১১হাজার ১২৫ জন। পরবর্তী জনগণনাতে এই সংখ্যা কমে কিছুটা। রাজবংশী সমাজের ৮০ শতাংশ মানুষ উত্তরবঙ্গে বসবাস করে তবে দক্ষিণবঙ্গে মৎসজীবী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশী সমাজ মূলত মৎস্যজীবী। রাজবংশী সমাজের মূল জীবিকা কৃষি নির্ভর। অনেকেই কৃষি শ্রমিক আবার অনেকেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণ, রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী জাতির জনসংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৮৬হাজার ৬১৫ জন। এঁদের সাক্ষরতার হার ৭.১ শতাংশ। মুখ্য কর্ম সংস্থানের মধ্যে ৩৫ শতাংশ কৃষক, ২৯ শতাংশ ক্ষেতমজুর। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ৯২.৩৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে।

সারণি:২.৫. রাজবংশী সমাজের জেলাভিত্তিক অবস্থান।

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
দার্জিলিং	১২৯৯০৪	৩.৮৪
জলপাইগুড়ি	৮১১৫৬	২৩.৯৬
কোচবিহার	৯৭২৮০৩	২৮.৭২
উত্তর দিনাজপুর	৪০৫১৪০	১১.৯৬
দক্ষিন দিনাজপুর	২২৪৯৮৮	৬.৬৪
মালদহ	১৪৪১৫৮	৪.২৬
মুর্শিদাবাদ	৮৬৬৬৪৯	২.৫৬
বীরভূম	১২২৬৪	০.৩৬
বর্ধমান	১৮৫৬০	০.৫৫

নদীয়া	৭৬৩১২	২.২৫
উত্তর ২৪ পরগনা	১০৬৩৩৮	৩.১৪
দক্ষিন ২৪ পরগনা	১৪০৮৭৪	৪.১৬
হুগলি	৪৭৬৫১	১.৪১
মেদিনীপুর	১৩২৫১	৩.৯১
হাওড়া	৬২৭৮২	১.৮৫
কলকাতা	১৩৭৪০	০.৪১

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ২০০১।[60]

বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তপশিলি জাতি হলো নমঃশূদ্র। এই নমঃশূদ্ররা পূর্বে চণ্ডাল নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের ফরিদপুর, বাগেরহাট, পিরোজপুর, যশোহর, খুলনা জেলায় এঁদের সংখ্যাধিক্য ছিল। দেশভাগের পরে নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর একাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের চলে আসে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা ৩২ লক্ষ ১২৩৯৩। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের মোট তপশিলি জাতির সংখ্যা ১৭.৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, কোচবিহার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করেন। নমঃশূদ্রদের ৭৫.৫ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪.৬ শতাংশ শহরে বসবাস করে। জীবিকার ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে ২১.৪ শতাংশ কৃষক, ৫.৯ ক্ষেতমজুর এবং ৬১.৭ শতাংশ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। ২০০১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে এঁদের সাক্ষরতার হার ৭৮.৯৩ শতাংশ।

সারণি:২.৬. জেলাভিত্তিক নমঃশূদ্রদের ভৌগলিক অবস্থান।

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
দার্জিলিং	৪১৫৫৫৫	১.২৯

[60] *Cencus of India, 2001.*

জলপাইগুড়ি	২৮৬৭০৮	৮.৯৩
কোচবিহার	১৫৫৫১৪	৫.১৫
উত্তর দিনাজপুর	৯৯৯২৩৭	৩.০৯
দক্ষিন দিনাজপুর	৩৯১৭২	১.২২
মালদহ	১০১৪৪৪	৩.১৬
বর্ধমান	২২৪৬	৬.৯৯
নদীয়া	৮১০৫১২	২৫.২৩
উত্তর ২৪ পরগনা	৭৯৮৭০৪	২৪.৮৬
দক্ষিন ২৪ পরগনা	১৪৭৪৯০	৪.৫৯
হুগলি	১১১৭৪১	৩.৪৮
মেদিনীপুর	১৫৩১১৩	৪.৭৭

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ২০০১।[61]

নদীবিধৌত দক্ষিণবঙ্গের আর একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি হল পৌণ্ড্র। ১৯৩৬ সাল থেকে তপশিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ১৯৪১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তপশিলি জাতিগোষ্ঠী হিসাবে পৌণ্ড্রদের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানের তথ্য জানা যায়। এই সময়েও ২৪ পরগণাতেই এঁদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালের জনগণনায় এঁদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৯৮,৮৪৩ ও ৪,৯৫,৪৩১ জন। বর্ধমান বিভাগের মধ্যে একমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই পৌণ্ড্রদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালের জনগণনায়

[61] *Cencus of India, 2001.*

এঁদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬,০২৯ ও ৩৭,৭৭০ জন।[62] ২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে এঁদের সংখ্যা ছিল ২৪লক্ষ ৫০ হাজার ২৬০।[63] তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের ১১.৪১ শতাংশ। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১৩। তপশিলি নিম্নবর্ণীয় মানুষদের ১২ শতাংশ। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪৩, তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের ১২.৩ শতাংশ। ২০০১ সালের গণনায় পৌণ্ড্রদের ৬৩ শতাংশের বসবাস দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, ১৯.৬ শতাংশের বাস উত্তর ২৪ পরগণায়, ৫.৯ শতাংশের বাস মেদিনীপুরে এবং ৩.৮ শতাংশের বাস হাওড়ায়। কেবলমাত্র ২৪ পরগণায় ৭৯.৬ শতাংশ পৌণ্ড্র জাতির মানুষের বাস এবং দক্ষিণের এই চার জেলা ধরলে দেখা যাবে এখানে ৯২.৩ শতাংশ পৌণ্ড্র জাতির মানুষ বসবাস করেন। অপর দিকে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে এদের সংখ্যা ০.৫ শতাংশ। ২০১১ সালে এই সংখ্যার কিছুটা পরিবর্তন হলেও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পৌণ্ড্রদের জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এঁদের সংখ্যা ছিল ৬২.১৭ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগণায় ছিল ১৯.৩১ শতাংশ। অর্থাৎ ২৪ পরগণাতে ছিল ৮১.৪৮ শতাংশ। হাওড়াতে ছিল ৪.০৮ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ছিল ৬.১৪ শতাংশ। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের এই জেলাগুলিতে পৌণ্ড্রদের জনসংখ্যা ছিল ৯১.৭ শতাংশ। আর অবশিষ্ট জেলাগুলিতে পৌণ্ড্রদের সম্মিলিত জনসংখ্যা ছিল ৮.৩ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে পৌণ্ড্রদের জনসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলাগুলিতে পৌণ্ড্রদের জনসংখ্যা ছিল ১০৯০ অর্থাৎ ০.০৪ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যাটা হয় ১৫১৯, মূল পৌণ্ড্র জনসংখ্যার ০.০৬ শতাংশ। কাজেই একথা অবিসংবাদিত ভাবে বলা যায় যে, পৌণ্ড্ররা মূলত দক্ষিণবঙ্গের নদীবিধৌত অঞ্চলেই বসবাস করেন। সুতরাং আদমশুমারির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি হিসাবে পৌণ্ড্রদের একটা আঞ্চলিক কেন্দ্রীকরণ ছিল। দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি

---

[62] *Bengal Census Report, 1941, 1951.*

[63] *Census of India 2011.*

বিভাগের জেলাগুলিতেই এঁরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বসবাস করে আসছিল।[64] দেশভাগের (১৯৪৭) পরও এক্ষেত্রে কোনরকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ।

জাতপাত ও শ্রেণী চর্চার সাম্প্রতিক বিতর্ক

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যায়তনিক পরিসরে জাতপাত চর্চার তেমন প্রচলন ছিল না। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতপাতকে চর্চা করা হতো। ভারতের বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী যেভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন সেই প্রেক্ষাপটেই আলোচনা করা হয়। জনগণনার সমীক্ষা থেকে তথ্যের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতকে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা থাকলেও বাম শাসনকালে সেই চর্চা স্থগিত হয়। আন্দ্রে বেতেই, দীপঙ্কর গুপ্ত, যোগেন্দ্র সিংহ প্রমুখ জাতিগুলিকে এক একটি পেশাগত সামাজিক শ্রেণী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[65] বামপন্থী শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ভিত্তিক জাতিসংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয় আন্দোলন এবং নমঃশূদ্র মতুয়াদের সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বামপন্থীরা জাতপাত ভিত্তিক সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন যে, জাতপাতের রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই থেকে যায়। ফলত, তা শ্রেণী শোষণের প্রশ্নগুলি মোকাবিলা করার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়।[66] বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলার জাতপাত রাজনীতিকে অস্বীকার করেন। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টকে অস্বীকার করেন। তাহলে কি বামপন্থীরা জাতপাতের রাজনৈতিক বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময় জাতিসংগঠনগুলোর বিভিন্ন কার্যকলাপে বিশেষ করে মতুয়া মহাসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বামপন্থী নেতাদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। পরিচিতি সত্তার নির্ভর রাজনীতি বর্জনের কথা বললেও তা বাস্তব ক্ষেত্রে ভিন্ন

---

[64] সরকার, কৃষ্ণ কুমার, 'পোদ থেকে পৌণ্ড্র: বাংলার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক আলোচনা', প্রকাশিত, সরকার, সুধাংশ কুমার (সম্পাদক), *চতুর্থবার্তা, চতুর্থবর্ষ, প্রথম সংখ্যা,* পৃ.পৃ. ৬৩-৭৪।

[65] বন্দ্যোপাধায়, সৌভিক, *ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতি-বর্ণ সমীকরণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮,পৃ. ৭৩।

[66] *মার্ক্সবাদী পথ, ৩৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি মার্চ,* ২০১৭, পৃ. ৪৩।

চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিসরে জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা প্রকাশিত হতে থাকে। কিছু গবেষক জাত ও শ্রেণী তথ্য অনুসারে জাতিগুলির চরিত্র ব্যাখ্যা করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যে উচ্চবর্ণের বামপন্থী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বাংলার নিম্নবর্ণের জাতিগুলি থেকে উঠে আসা লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বল্প পরিসরে জাতি গবেষণার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।[67] এন.কে চন্দ্র *এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার ইন বর্ধমান* প্রবন্ধে বর্ধমানের তিনটি গ্রামের কৃষকদের চেতনা এবং কৃষি আন্দোলন বিষয় ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রবন্ধে দেখান গ্রামের ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী একই সঙ্গে শহরের প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর সঙ্গে আন্দোলনে অংশীদার হয়। এন.কে চন্দ্রের আলোচনায় বর্ধমান গ্রামীন নিম্নবর্ণের কৃষকদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের দরিদ্র কৃষকদের ও মধ্যবর্গের উগ্র ক্ষত্রিয় কৃষকদের আর্থসামাজিক বিভেদের বিষয়টি উঠে আসে। ২০০৩ সালে স্বরাজ বসুর *ডায়নামিকস অফ কাস্ট মুভমেন্ট* গবেষণায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গতিশীলতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকগুলি উঠে আসে। অন্যদিকে ২০১২ সালে রূপ কুমার বর্মণের *পার্টিশন এন্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন সিডিউল কাস্ট অফ বেঙ্গল* গ্রন্থে বাংলা বিভাজন তপশিলি জাতিগুলির উপর কী প্রভাব ফেলেছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৮৮ সালে গায়ত্রী চক্রবর্তী *ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ণ স্পিক* প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয়দের কথা বলার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার উত্তরে ২০১৬ সালে রূপকুমার বর্মণ *ইয়েস দ্যা সিডিউল্ড কাস্ট ক্যান রাইট* প্রবন্ধে গায়েত্রী চক্রবর্তীর সন্দেহের অবসান ঘটান। শুধুমাত্র বিদ্যায়তনিক আলোচনাতেই নয়, বাস্তবক্ষেত্রে জাতপাতের রাজনীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মতুয়া মহাসংঘ, ক্ষত্রিয় মহাসভা, পৌণ্ড্র মহাসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের উপস্থাপনা করেছে।

দীর্ঘকাল বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জাত পাত রাজনীতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গবেষক এই বিষয়ে চর্চা শুরু করেছেন। বিশেষ করে জাত পাতের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

---

[67] বন্দ্যোপাধায়, সৌভিক, *ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতি-বর্ণ সমীকরণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮,পৃ. ৭৩।

জাতিগুলির আত্ম পরিস্থিতির গঠন প্রক্রিয়া, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি গবেষণায় দেখা যায় যে, নিম্ন বর্ণের জাতিগুলির আত্মচেতনার বিকাশই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার কারণ বা তাদের রাজনৈতিক কৌশল তৈরি করতে সহায়তা করে।[68] পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সময়ে জাতপাতের বিভিন্ন মনীষী ও সমাজসেবকদের নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। জাতপাতের এই সংস্কারক ও তাত্ত্বিকদের জনমোহিনী ভাবমূর্তিকে রাজনৈতিক প্রচারকার্যে এবং রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজবংশী মনীষী যেমন পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, দক্ষিণবঙ্গের মতুয়াদের হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল এবং পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ সংস্কারক বেণীমাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর, রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ, রাজেন্দ্রনাথ সরকার নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক পরিচিতিসত্তার রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে পৌণ্ড্রদের নিয়ে কৃষ্ণ কুমার সরকারের গবেষণা, নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের নিয়ে পৌষ কর্ণ সিনহা ও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত প্রবণতা ও শ্রেণী নিয়ে অয়ন গুহর গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতপাত চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক লেখকগণ আত্মজীবনীমূলক রচনার মাধ্যমে জাতপাতের রাজনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে মনোরঞ্জন বেপারীর *ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন*, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাসের *দলিত মুক্তি আন্দোলন*, মনোহর মৌলি বিশ্বাসের *আমার ভুবনে আমি বেঁচে আছি*, কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের *আমি কেন চাঁড়াল লিখি* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

---

68 Basu, Raj Sekhar, 'Reinterpreting Dalit Movements in India' in *Indian Historical Review* 2006, পৃ. পৃ. ১৬৫-১৬৮।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতের তথা বাংলার জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়। অবিভক্ত বাংলার তপশিলিরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তপশিলিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো পূর্ববঙ্গে ছিল। ১৯৪৭ সালের দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয় এদের মধ্যে বিভাজন ঘটে। এর সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত সমস্যাগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাস্তুচ্যুতি, নতুন পরিবেশ বেঁচে থাকার সংগ্রাম, রাজনৈতিক অবনমন প্রভৃতি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাতপাত ভিত্তিক তপশিলি জাতির মধ্যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বেঁচে থাকার লড়াই ছিল অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতিতে জাতির আত্মপরিচয় হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতপাত ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর বেঁচে থাকার প্রধান লড়াই। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতপাত ভিত্তিক তপশিলিজাতিদের মধ্যে কতকগুলি ধারার সৃষ্টি হয়। প্রথমত পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় তপশিলি জাতিগুলির বাংলা বিভাজনের ফলে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ জাতি হিসেবে বা আত্মপরিচিতি হিসেবে না দেখে উদ্বাস্তু হিসেবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের প্রতি তাঁদের মনোভাব। দ্বিতীয়ত, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুচ্যুত উদ্বাস্তুরা তাঁদের পুনর্বাসনের সংগ্রামে জাতপাত আত্মপরিচিতি না দেখে শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্বকে বেশি মনে করেন। তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রাজনীতিতে তপশিলি জাতিদের গুরুত্ব ও নির্বাচনী রাজনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা। স্বাধীনতার সময় অনেক উচ্চবর্ণীয় হিন্দু যারা দেশভাগের পূর্বেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান গ্রহণ করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করেছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে যতটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল তথাকথিত জাতপাতের তপশিলিদের মধ্যে সেরকম কোনো সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়নি। তবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তপশিলিদের জীবন সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে আশির দশকে বিশেষ করে দণ্ডকারণ্য, মরিচঝাঁপিতে তপশিলি উদ্বাস্তুদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনা ও তাঁদের জীবন সংগ্রামের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তপশিলি জাতিদের জীবন ছিল খুবই দুর্বিষহ। সুকুমার গুপ্তের পর্যবেক্ষণে পূর্ববঙ্গের তপশিলি জাতির জীবন সংগ্রামের ইতিহাস চর্চার জন্ম দিয়েছিল। সুকুমার গুপ্ত সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থে ও অধ্যাপক কুমার ঘোষ রচিত গ্রন্থে যেভাবে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক সংগ্রামের প্রতি আলোকপাত করেছেন তা জাতীয় রাজনীতির এক অন্যতম পরিচিত বিষয়।

১৯৭৭ সালে তপশিলি জাতি দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উদ্বাস্তু তপশিলি পরিবারগুলো সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। বামফ্রন্ট সরকার প্রথমদিকে উদ্বাস্তুদের পক্ষে থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাঁদের গৃহীত বিভিন্ন নীতি উদ্বাস্তু, শরণার্থী মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে। ১৮৭৯ সালের ২৬শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের তুলে দেওয়ার জন্য দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মাছের ভেড়ি, নলকূপ ও বাড়িঘর সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ও রাজনীতিতে তপশিলিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন থেকে ২০১১ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত রাজনীতিতে জাতপাত ভিত্তিক তপশিলিদের অংশগ্রহণ সমাজবিজ্ঞানীদের মৌলিক আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। পার্থ চ্যাটার্জি *প্রেসেন্ট হিস্টরি অফ বেঙ্গল* লিখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে জাত পরিচিতি সবসময়ই রাজনৈতিক বাতাবরণের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতের স্বপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় পৌষকর্ণ সিংহরায় বা সর্বানি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকরাও বিশেষভাবে সহমত হয়েছেন। একইসঙ্গে বাংলার রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জি, উদয় চন্দ্র ও কেনিথ বো নেলসনের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের বহুকৌণিক রাজনৈতিক পরিসরের বৈচিত্র্য উঠে এসেছে।

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি— প্রথমত, ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা ও উৎপত্তি সংক্রান্ত যে তথ্য উপস্থাপন করা হয় তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে জাতপাত সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কত। ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে জনগণনা, নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা, বিভিন্ন সংখ্যামূলক গবেষণা এবং সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় জাতপাত ব্যবস্থার উৎপত্তি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা আমাদের সামনে উঠে এসেছে। অন্যদিকে মার্ক্সবাদী বা বামপন্থীদের জাতপাত সম্পর্ক যে আলোচনা তা শ্রেণীর নীরিখে করা হয়। জাতপাত ব্যবস্থার সর্বভারতীয় যে চিত্র উঠে আসে তাও বিভ্রান্তিকর। জাত ব্যবস্থাকে সর্বভারতীয় ব্যবস্থা বলা হলেও বিভিন্ন রাজ্যে জাতপাতের প্রকৃতি ভিন্নতর। দ্বিতীয়ত, ভারতের বর্ণবাদী শ্রমবিভাজনকে শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই ধারণা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। শ্রেণী বিভাজন

থেকেই জাতপাতের উৎপত্তি এই তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রেণী কাঠামো মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উৎপাদন, উপকরণ প্রক্রিয়াকরণ ও নেতিকরনের উপর নির্ভর করে। শ্রেণীর এই আলোচনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনীতির ভিত্তিতে করা হয়। যা সমাজবিজ্ঞানের অন্য কাঠামোর সঙ্গে এবং বর্ণ কাঠামোর শ্রমবিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তৃতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, দেশীয় ব্যাখ্যা যা মূলত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে এবং সর্বভারতীয় জাতপাত ব্যবস্থার নিরিখে করা হয়। বামপন্থী তাত্ত্বিকগণ এই ব্যবস্থার ও প্রকৃতি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের নিরিখে জাতপাত ব্যবস্থাকে আলোচনা করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার যে বিভিন্ন উপজাত (সাবকাস্ট) ব্যবস্থা রয়েছে তাও অত্যন্ত জটিল। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতপাতগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা বর্তমান রয়েছে। জাতপাতের উপজাতপাতগুলোর মধ্যেও আঞ্চলিকতা রয়েছে। সর্বভারতীয় জাতপাত ব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার প্রকৃতি ভিন্নতর ও স্বতন্ত্রতা যুক্ত। আবার ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যেও ভিন্নতা ও স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থত, জাতপাত ও শ্রেণীর মধ্যে যেরকম গুরুত্ব আছে তেমনি নিবিড় সম্পর্কও আছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের ফলে জাতপাত ব্যবস্থার প্রকৃতি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে স্বতন্ত্র করে। দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের গোষ্ঠীগুলোর উপর বামসংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে জাতপাত ব্যবস্থার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং জাতপাত ব্যবস্থার শ্রেণীকরণ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার রাজনৈতিককরণ বৈপ্লবিকভাবে না ঘটলেও নিষ্ক্রিয়ভাবে সংঘটিত হয়। পঞ্চমত, পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার কৃষ্টিকরণ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতগোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সভা ও সমিতিগুলোর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলন করেচলেছে। জাতপাত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সমাজ তাত্ত্বিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সমাজ তাত্ত্বিকগণ পশ্চিমবঙ্গে সভাসমিতির গঠন করলেও ভারতের অন্য রাজ্যের মত রাজনৈতিক দল সংগঠিত করতে পারে নি। এক্ষেত্রে শ্রেণী রাজনীতি ও শ্রেণী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ষষ্ঠত, ইতিহাস চর্চায় জাতপাতগোষ্ঠীগুলি প্রান্তবাসী, আলাদা জগতে বিচরণকারী হিসেবে চিত্রায়িত হলেও এরাই ছিল মূল

উৎপাদক (Primary Producer)। রাস্তাঘাট, বাসস্থান নির্মাণের প্রধান কারিগর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মূল চালিকা শক্তি হল এই জনগোষ্ঠী। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিন জীবনে এরাই প্রধান সহায়ক। স্বাভাবিকভাবে ঔপনিবেশিক বাংলার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে তপশিলি জাতির অস্তিত্ব তেমন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। শাসকরা যেভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন তেমনি এঁরা বিভিন্ন সময়ে সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় নেতৃত্ববর্গের তল্পিবাহক রূপে এরা কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, সামাজিক গতিশীলতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিভিন্ন সময় জাতপাতের অনেক দার্শনিকগণ যেমন গোবিন্দ হালদার, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মা, রাইচরণ সরদার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রূপনারায়ণ রায় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার বিরোধী বহুমুখী গণ আন্দোলনগুলি শক্তিতে সামর্থে এবং তত্ত্বগত ভিত্তিতে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলি একদিকে যেমন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে অপরদিকে এই বহুমুখী গণআন্দোলনগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় বামসংগঠনের গণভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এই অধ্যায়ে কংগ্রেস সরকার বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়নি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনগুলির চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর দেশের মানুষের তথা রাজ্যের মানুষের চাহিদার সঙ্গে সরকারি নীতির সামঞ্জস্যের অভাবে বিরোধী শক্তি হিসেবে বামপন্থীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ যে কলকারখানায় কিংবা কৃষিক্ষেত্রে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ ও গ্রামের সাধারণ কৃষকের স্বার্থবিরোধী সেটা বামপন্থীরা প্রমাণ করার চেষ্টায় তাত্ত্বিক বা বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো নেতৃত্ব ক্রমশ বামপন্থীদের নেতৃত্বে চলে যায়। কলকারখানার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বেতন বৃদ্ধির দাবি দাওয়া, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের ফলে সংগঠনগুলি বামপন্থী নেতৃত্বাধীন করে তোলে। একইসঙ্গে বামপন্থীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশকে বামপন্থী রাজনীতির কাছে টেনে নিয়ে এসেছিল। এই অধ্যায়ে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য যে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ও গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী বহুমুখী শ্রেণী আন্দোলন এবং বামদলগুলোর উত্থানের রূপরেখা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনেও কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ বিরোধী উত্তাল ৪২-এর গণ আন্দোলনের

সক্রিয়তা ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেসের সঙ্গে গণআন্দোলন গড়ে তুললেও স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে পড়ে। কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং পরবর্তী সময়ে বহুমুখী গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবাংলার এই গণআন্দোলনগুলো রাজনীতি ও অর্থনীতির ভিত্তি আরও জোরালো ভাবে মজবুত করে।

দেশভাগ বাংলার ভৌগোলিক চিত্রটাকেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করেছে। অবিভক্ত বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের আসন সংখ্যা গণপরিষদে কমে যায়। বাংলার ২৫০টি আসন সংখ্যার পরিবর্তে গণপরিষদে পশ্চিমবঙ্গ মাত্র ৮৯টি আসন পায়। ১৯৪৭ এর আগে কংগ্রেস কোনদিন বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিল না। তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় তারা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৫ই জানুয়ারি মাত্র পাঁচ মাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। বামপন্থীরা কংগ্রেসের বিরোধীদল হিসেবে সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ, স্পিকার-স্যার ঈশ্বর দাস জ্বালান, ডেপুটি স্পিকার আশুতোষ মল্লিক এবং কালিপদ মুখার্জী, বিমল চন্দ্র সিংহ, সুরেশ ব্যানার্জি, নিকুঞ্জ মাইতি, যাদবেন্দ্র পাঁজা প্রমুখ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।[1] স্বাধীন ভারতের নতুন অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে প্রথম দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই হাজার জন কৃষক বিধানসভার অভিমুখে মিছিল করে আসেন। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত এই কৃষক মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানানো।

কিন্তু পুলিশ সরকারের নির্দেশে এসপ্লানেডের পূর্বদিকে শিয়ালদহ ও হাওড়াতে কৃষক এবং শ্রমিকদের মিছিলের গতিরোধ করে তাদের বিধানসভায় প্রবেশে বাধা দেয়। এই ঘটনা সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বিধানসভায় একটি বিবৃতি দেন যে—মিস্টার স্পিকার, স্যার, আমরা এই নেক্সট আইটেম নেওয়ার আগে আমি আপনাকে এই কথা জানাতে চাই যে, অসংখ্য কৃষক নানা জায়গা থেকে এখানে আসছিলেন এই সভাকে, স্বাধীন বাংলাদেশের সভাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুলিশ হাওড়া এবং শিয়ালদার কাছে তাদের আটকে

---

1 West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report of the the first session (November -January), Vol.1,No.1, Kolkata, West Bengal Legislative Assembly Library.

দিয়েছে। আমি জানিনা এটা কেন হল? আমাদের প্রধানমন্ত্রী একথা জানেন। তিনি আমাদের বলেছেন যে, তাঁরা আসতে পারেন, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভাবে, যাতে গন্ডগোল না হয়। এ কথা দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁরা অভিনন্দন জানাতে আসছেন। আমি জানিনা পুলিশ কেন এই কাজ করলো? আমি জানতে চাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে এবং তিনি যদি বাইরে গিয়ে একটু দেখেন তাহলে সুবিধা হয়। যে স্বাধীন বাংলার প্রথম বিধানসভার অধিবেশনকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যই অসংখ্য কৃষক রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এসেছিলেন কিন্তু হাওড়া ও শিয়ালদার কাছে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়।[2]

প্রফুল্ল ঘোষ এর জবাবে বলেছিলেন "কালকে ভোর বেলা আমার কাছে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ রায় যান এ সম্বন্ধে কথা বলতে। তিনি আমাকে বলেন যে, আপনাদের অভ্যর্থনা করার জন্য পরিষদের মধ্যে সমস্ত কৃষকরা উপস্থিত হবেন। আমি বলি যে পরিষদের সভা গৃহের সামনে এইরূপ সমবেত ভাবে তাঁদের না আসাই বাঞ্ছনীয়।"[3] আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, সেটা না করাই ঠিক হবে। তবে আমি তাকে বলি যে, "আপনারা যদি ওয়েলিংটিং স্কয়ারে কিংবা ময়দানে কোন সভা করেন, সেই সভায় আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। পাশাপাশি কিষানদের সম্বন্ধে আমাদের নীতি কি তা বলতেও প্রস্তুত আছি। অন্য কোন প্রকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। তখন কৃষ্ণবিনোদ বাবু বলেন যে আমি আপনার কথা শুনলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মতামত কি তা আপনাকে পরে জানাবো। তারপরে রাত্রে টেলিফোন করে তিনি জানান যে পরিষদ সম্বন্ধে আপনাদের যে মত তার সঙ্গে আমাদের মতবাদ ঠিক মেলেনা। তারা এই কথা আমাকে বললেন পুলিশ যেন না আটকায়। যদি আপনারা আগে বলতেন তাহলে হত।... আমি বলি সাড়ে তিনটা থেকে চারটের মধ্যে আমাদের অ্যাসেম্বেলির কাজ শেষ হলে আমি সেখানে ময়দানে গিয়ে বক্তৃতা দিতে রাজি আছি, এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করি যে আপনারা সেখানে যান । এই কথা শুনে তারা চলে গিয়েছে। এর

---

[2] *West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report of the the first session (November -January), Vol.1, No.*1, Kolkata, West Bengal Legislative Assembly Library.

[3] *West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report off the first session (November -January) 1947-48,vol.1,No.2*, WBLAL

বেশি আর আমি কিছুই জানি না।"[4] জ্যোতি বসু পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে বিধান সভায় একটি Adjourment Motion আনেন। ডক্টর ঘোষ এর উত্তরে বলেন যে সরকারের কাছে খবর আছে কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মীরা সন্ত্রাসের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাখেন। তিনি আরো বলেন -We shall use our strength to meet such efforts if any.[5]

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বিরোধী শক্তি দমনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'ওয়েস্টবেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার বিল' আনেন। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলো এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। পরবর্তীতে এই বিলের নাম পরিবর্তন করা হয় 'ওয়েস্টবেঙ্গল সিকিউরিটি বিল।' এই বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলগুলো কণ্ঠ রোধ করা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসু এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এই বিলের বিরুদ্ধে কলকাতার 'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে' এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভাটি সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি কর্তৃক আয়োজন করা হয়। এই সভার সভাপতি শ্রী শরৎচন্দ্র বসু এই বিলের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেন-"এই বিল পাস হইলে পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কিছু থাকিবে না"।[6] বামদলগুলোর থেকে বলা হয় যে এই বিল গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর কণ্ঠ রোধ করবে। বিরোধীদলের নেতাগণ বিধানসভার বাইরে ও ভেতরে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই বিলের ১৫নং, ১৬নং এবং ১৭নং ধারায় মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ এবং তিন মাস বিনা বিচারে আটকে রাখার নিয়ম নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার ও বিরোধীদের সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে, সরকার বিরোধীদের কোন সংশোধনী গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। বিধানসভায় জানান যে, এই আইন সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রতিক্রিয়া বিরুদ্ধে পাস করা হয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়।[7]

---

[4] *The West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Reports of the first session (November-January) 1947-48, Vol. LXXVIII, NO.1*

[5] Chakraborty , Saroj, with Dr BC Roy and others Chief Ministers, Calcutta, 1974, পৃ. ৬৭।

[6] *স্বাধীন,* ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

[7] *স্বাধীন,* পৃ.-৬৭-৬৮

কংগ্রেস সরকার ২১শে নভেম্বর সি.পি.আই নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪) সহ ২৫ জন নেতাকর্মীকে বিনা বিচারে আটকে রাখেন। বামদলগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় ‘সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় নাগরিক রক্ষা কমিটি’। সারা বাংলা জুড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত হয়। বাম নেতাদের নেতৃত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি জনসভা করা হয়। সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি ছিল এই জনসভার মূল উদ্যোক্তা। বামদলগুলো ও কংগ্রেসের কিছু ব্যক্তির বিরোধিতা থাকলে অবশেষে এই বিলটি পাস হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল পাস করিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিধানসভা বন্ধ করে দেওয়ার পর ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও তাঁর মন্ত্রিসভা অপসারিত হয়। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে (১৮৮২-১৯৬২) মুখ্যমন্ত্রী করে এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই নতুন মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন কিরণ শংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) এবং অর্থমন্ত্রী ছিলেন নলিনী রঞ্জন সরকার (১৮৮২-১৯৫৩)। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে নতুন মুখ্যমন্ত্রী রূপে মান্যতা দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। একইসাথে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করা হয়।[8] ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ক্ষমতায় আসার পর ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গীয় ফৌজদারি আইন অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালের ২৬ শে মার্চ বিধান রায়ের সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করতে শুরু করেন।[9] কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে কংগ্রেস সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে দমন-পীড়নের সাহায্যে স্তব্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করে কংগ্রেস প্রশাসক কমিউনিস্ট ও বিরোধী আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণসমর্থন জাগিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে বি.টি রণদীবে অন্যদিকে রাজনৈতিক থিসিস গ্রহণ করা হয় এবং পার্টির মধ্যে কর্ম তৎপরতা শুরু হয়।

---

[8] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি. এ. কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৬১।

[9] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৬।

বোঝাই যাচ্ছিল পার্টির উপর আঘাত হানার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। ইতিমধ্যে চারদিক থেকে ধরপাকড়ের খবর আসে।

জ্যোতি বসু স্মৃতিচারণায় বলেন যে, পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার কয়েক দিন আগে হেমো বাবু আইনসভা আমার কাছে এসে আমাকে একটি পান খেতে দিয়ে বলেন-জ্যোতিবাবু একটা কথা আছে খুব সাবধানে থাকবেন আপনাকে সব পরে বলব। কিন্তু তারপর হেমো বাবুকে আমি ধরতে পারি নি। ধরতে পারলে আরো পাকা খবর পাওয়া যেত। পরে আমি জেনেছি যে ২৬ শে মার্চ আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার আগের দিন অর্থাৎ ২৫ শে মার্চ আমাদের সংবাদদাতা খবর দেয় পার্টি বেআইনি ঘোষিত হতে চলেছে। বহু নেতাকে গ্রেপ্তারের জন্য একটা তালিকা তৈরী হয়েছে।[10]

পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন পাশ করার পূর্বে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ আশ্বাস দিয়েছিলেন এই আইন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না এই আশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হলো ডঃ বিধান চন্দ্র আমলে।[11] **১৯৫৯** সালের **১৩ই** জানুয়ারি কমিউনিস্টদের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ও বেআইনি ঘোষণা করে। সাতটি ছাত্র ও শ্রমিকদের কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেআইনি ঘোষণা করে । **১৯৫০** সালের **৪ই** জানুয়ারি কলিকাতা গেজেটের একটি নোটিফিকেশন আমরা পাই- Whereas provincial government is of opinion that organisations known by the names of (i) the Bengal provincial students federation (ii) the chhatri sangh(iii) the mohila atma raksha samiti (iv) the peoples relief committee (v) the kishan samiti (vi)the khet Mazdoor samiti and (vii)naujawan league and their committees sub- committees and branches have object for their interference with the administration of the law and the maintenance of the law and order and constitutes a danger to the public space. (Now,

[10] বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৬।

[11] বন্দোপাধ্যায়, সুরভী, *জ্যোতি বসু: অনুমোদিত জীবনী,* কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.-৫৬।

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 of the Indian criminal law amendment act, 1908 (xiv of 1908) the provincial government is pleased to declare the Said organisations theirs committee, sub-committee and branches to be unlawful.[12]

এই আইন বলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার প্রমোদ দাশগুপ্ত, আব্দুল হালিম, ভূপেশ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, জ্যোতি বসু সহ অনেক কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। নিরঞ্জন সেনগুপ্তর উপর একটি গোপন আই.বি ফাইল থেকে জানা যায় যে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ তারিখ জ্যোতি বসু ও নিরঞ্জন সেনকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।[13] সকলের খাওয়াটা অবশ্য আর পাঁচজন বন্ধুর মতোই একই ছিল লপসি আমাদের ব্রেকফাস্ট। তবে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য আলাদা কিচেন ছিল।[14] রাজনৈতিক বন্দি ও সরকারের মধ্যে টানা পোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত জেলে বন্দী কমিউনিস্ট নেতা নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আরো অনেকের সঙ্গে শ্রী জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জি এবং জলি মোহন কলের সাক্ষাতের অনুমতি দেয়। অবশ্য সকলকে একই সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি।[15] ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায় কমিউনিস্ট পার্টি আবার বৈধ বলে ঘোষিত হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে মুজাফফর আহমেদ মুক্তি পান। সেই সময় কংগ্রেস সরকার কিছু বন্দিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়া হয়নি। ১৯৫১ সালের কলকাতা ময়দানে সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

১৯৫১ সালের ১৮ ই মে মুজাফফর আহমেদকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আইনজীবী অতুল গুপ্ত। বিপুল সমাগমে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল ভর্তি হয়। সংবর্ধনার জবাবে কমরেড মুজাফফর আহমেদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিনা বিচারে আটক বিচারাধীন ও সাজা পাওয়া রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্ত করতে অবিলম্বে বিরাট আন্দোলন

[12] *The Hindusthan Standard*, January 6, 1950

[13] WB IB file no.374ZX 23, subject: Niranjan Sengupta, WBSA

[14] WB IB file no.374ZX 23, subject: Niranjan Sengupta, WBSA, পৃ.-৬২

[15] WB IB file no.374ZX23, subject: Niranjan Sengupta, WBSA

গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[16] বন্দী মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর সহ বিভিন্ন ধরনের প্রচার অভিযান শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ১২ই নভেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর রায় ঔদ্ধত্যভাবে জানান নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য বন্দী মুক্তির আন্দোলন চলতে থাকে থাকলো।[17] রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির দাবিতে বামপন্থীরা গণ আন্দোলন শুরু করে। বহু সংগ্রামের ফলে সরকারের সদিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে ১৯৫২ সালের কিছু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই রাজনৈতিক বন্দীগণের[18] মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. শ্রী গণেশ ঘোষ

২. জনাব আব্দুর রাজ্জাক খান

৩. শ্রী বীরেন ব্যানার্জি

৪. শ্রী যতীন্দ্রনাথ মাইতি

৫. শ্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

৬. শ্রী.ভূপেশ চন্দ্রগুপ্ত

৭. শ্রী তারাপদ দত্ত

৮. শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী

৯. শ্রী অমল কুমার গাঙ্গুলী

১০. শ্রী অজিত কুমার গাঙ্গুলী

১১. শ্রী বিজয় মোদক

---

[16] *স্বাধীন পত্রিকা ১৯ মে, ১৯৫১,* বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি. এ. কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৩।

[17] *স্বাধীন পত্রিকা, ১৯ মে, ১৯৫১।*

[18] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি. এ. কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭।

১২. শ্রী রবীন্দ্রনাথ মাইতি

১৩. শ্রী তুষার চ্যাটার্জী

১৪. শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন

অবশ্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আগেই বন্ডে সই করতে হয়েছিল।[19]

এমতাবস্থায় ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লক্ষ। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটার গণ ২৩৮জন বিধানসভার সদস্য এবং ৩৮জন লোকসভার সদস্যকে নির্বাচিত করেন। তাঁরাই আগামী কয়েক বছর জন্য রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন বা উহাতে সংশ্লিষ্ট থাকবেন।[20] ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও বিরোধীদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভাবে উত্থান ঘটে। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টরা বাংলার বিধানসভায় ২৮টি আসনে জয়ী হয়।[21] কমিউনিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ নির্দল প্রভৃতি বিরোধী পক্ষ মিলিয়ে মোট ৭৬টি আসন জয়লাভ হয়। অন্যদিকে কংগ্রেস ১৫০টি আসনে জয়লাভ করে।[22] কংগ্রেস এই নির্বাচনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকাকে নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টায় অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এপ্রসঙ্গে অতুল্য ঘোষ মন্তব্য করেন, ১৯৫২ সালের নির্বাচনে একটা শিক্ষা আমরা লাভ করেছিলাম যে স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্যাতন, ত্যাগ, কারাবরণ কেবলমাত্র এই মূলধন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না।[23]

বাম গণআন্দোলনে সর্বহারা শ্রেণী

---

[19] WB IB. file no.374ZX 23, Subject: Niranjan Sengupta M.L.A, (C.P.I). letter from the Superintendent, Dum Dum central jail to the Asstt. Secy. of the Govt. of West Bengal, Home (Poll) Department, WBSA

[20] *স্বাধীন*, ১৯৫২ সাল ২০ ফেব্রুয়ারি।

[21] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন*, এন. বি. এ. কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৪।

[22] *স্বাধীন*, ১৬ ফেব্রুয়ারী, *১৯৫২*।

[23] ঘোষ, অতুল্য, *কষ্ট কল্পিত*, পৃ. ১১৪।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের ফলে বামশক্তি আরো মজবুত হয়। ১৯৫২ সালের প্রথম সংসদীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা বামদলগুলো এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। দেশভাগের পরবর্তী সময় উদ্বাস্তু, শরণার্থি সাধারণ মানুষের স্বল্প মূল্যের যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল ট্রাম। সি.পি.আই, অন্যান্য বামদল ও উদ্বাস্তু সংগঠন (ইউ.সি.আর.সি) এই আন্দোলনকে গণআন্দোলনের রূপ দেয়। ঐতিহাসিক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী মতে -"In July 1953, the pent-up ire of the refugee population found cathartic express in a violent movement quaintly called' war for a pice' or the Tram Fare Enhancement Resistance movement.The movement was organised and led by CPI and other parties of the Left.The U.C.R.C and a refugee organization had no in the movement.But the U.C.R.C leader were aslo the recognised leader of the Left,and after all those year of meeting,procession,railles, demonstration and convention the UCRC were flock were aslo seeking to strike hard at an insensitive Government"[24]

১৯৪৭ সালে ট্রাম কোম্পানিগুলো ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব আনেন তখন কংগ্রেস সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশনের চাপে তা একটি ট্রাইব্যুনালের কাছে পেশ করা হয়। ট্রাইবুনাল বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে এবং আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। সেই ট্রাইব্যুনালের রায় সরকার কংগ্রেস সরকার কখনোই জনসমক্ষে আনেননি। বিরোধী বামপন্থীরা মনে করেন যে এই ট্রাইবুনাল পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের উপর ভাড়া বৃদ্ধির চাপ যাতে না হয় তার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। ১৯৪৯ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সমর্থনে ট্রাম কোম্পানিগুলো প্রথম শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি করে। কলকাতার বিদেশি কোম্পানিগুলো ট্রামের পরিষেবার উন্নতি না করে ট্রাম লাইনের উন্নতি না করে ভাড়া বৃদ্ধি করার মানে বিদেশি কোম্পানির সহযোগিতা করা। বিদেশি কোম্পানিগুলোর যাত্রী পরিষেবা ও

---

24 Chakraborty, Prafulla Kumar, *The Marginal Men*, Glory Printers, Calcutta, 1960, পৃ. ২৩৯।

পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর এমন আগ্রহ ছিল না। ট্রাম কোম্পানিগুলো মুনাফা অর্জন করায় মূল লক্ষ্য ছিল। বিরোধীরা অভিযোগ করেন ডক্টর ঘোষ এর সরকার জনগণ স্বার্থকে ত্যাগ করেছেন। বিদেশি কোম্পানির হয়ে সরকার কাজ করছে তা সম্পূর্ণ জনবিরোধী।

বিরোধীদের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও কংগ্রেস সরকার ভাড়া বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো সংঘবদ্ধভাবে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলে। আসলে গোটা পঞ্চাশের দশকটাই ছিল আন্দোলনর দশক।[25] বাম দলগুলোর প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত হয় ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ কমিটি। ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে উদ্বাস্তু মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়। বাম দলগুলো উদ্যোগে বিধানসভাতে প্রতিবাদ করা হয়। বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে প্রতিবাদ করা হয়। ট্রাম ভাড়া প্রতিরোধ কমিটির মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে,- জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হবে যে ট্রামে চড়বেন কিন্তু ভাড়া দেবেন না ।

কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু আন্দোলনের বর্ণনায় বলেন-"যেহেতু ট্রাম কর্মীরাও আমদের সঙ্গে ছিলেন সেহেতু প্রতিরোধ কমিটির আহ্বান ম্যাজিকের মত কাজ করেন। যাত্রীরা ট্রামে চাপেন, কন্ট্রাক্টর ভাড়া চাইলে তারা পুরনো ভাড়া দিতে চায়, কিন্তু কন্ট্রাক্টর বলেন, ভাড়া এক পয়সা বেড়ে গেছে, বাড়তি ভাড়া না দিলে তিনি ভাড়া নেবেন না।[26]

বামদলগুলো তাঁদের কর্মী সমর্থকদের দ্বারা সারা কলকাতাতে এই প্রচার অভিযান চালায়। কলকাতার ট্রামকর্মীদের একটি অংশ বাম শ্রমিক সংগঠনের সমর্থক ছিলেন। বাম সমর্থিত ট্রাম কর্মীদের একাংশ এই আন্দোলনকে অংশগ্রহণ করে। বাম দলগুলো প্রচার করতে থাকে তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধী নয় তারা বিদেশী কোম্পানির বিরোধী। লোকের মুখে মুখে ধ্বনি উঠলো, 'ইংরেজ কোম্পানি মুর্দাবাদ', ‘কংগ্রেস সরকার ইংরেজদের দালাল' ইত্যাদি। তারপর

[25] বন্দোপাধ্যায়, সুরভী, *জ্যোতি বসু: অনুমোদিত জীবনী,* কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৯।

[26] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি. এ. কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৯।

চললো ট্রাম বয়কট অন্দোলন।[27] পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন বিদেশি কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেছেন। সাধারণ জনগণের হয়ে বামপন্থীরা এই দাবি তুলতে থাকেন।

কংগ্রেস সরকার ভাড়া বৃদ্ধিতে অনর ছিলেন। ডক্টর রায়ের সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে গণ আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এতে আন্দোলনের আকার বিদেশি কোম্পানি বিরোধী এবং পুলিশি অত্যাচার বিরোধী গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাড়া না দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। অতি উৎসাহী মানুষ বিনা পয়সায় ভ্রমণ করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি গণআন্দোলন ইংরেজ কোম্পানি বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। ভাড়া না দেওয়ায় সাধারণ মানুষের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। জোর করে তারা ভাড়া আদায় করে দলে দলে বামপন্থী সমর্থকরা ট্রামে উঠতে থাকে এবং ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। পুলিশ লাঠি, গুলি চালাতে থাকে।

কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জনতা-পুলিস সংঘর্ষ হয়। ট্রাম ভাড়া বিরোধী গণআন্দোলন পুলিশ জনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকার ট্রাম ভাড়া বিরোধী আন্দোলন প্রতিরোধ করতে না পেরে পুলিশের মাধ্যমে জনগণকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিরোধীরা বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, ও চিৎপুরে ট্রামে অগ্নিসংযোগ করে জনতা।[28] সাধারণ মানুষ ও পুলিশের মধ্যে খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কলকাতার রাস্তায় আগুন লাগানো হয়। বামদলগুলো এই আন্দোলনকে ইংরেজ কোম্পানি বিরোধী আন্দোলনের রূপ দেয়। ইংরেজ সরকার মুর্দাবাদ ধ্বনি ওঠে।

প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ওয়েলিংটনে একটি সভার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সবকটি সংবাদপত্র তাদের প্রতিবেদনে বামআন্দোলনের পক্ষে প্রতিবেদন পেশ করে এবং বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। ডক্টর রায়ের সরকার বিরোধীদল এবং বাংলার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার পুলিশের মাধ্যমে আন্দোলন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। ৩ই জুলাই বামনেতা জ্যোতি বসু ও আরো তিনজন বিধায়ক গ্রেপ্তার হলে আন্দোলনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। গড়িয়াহাট, ভবানীপুর, কালীঘাট, ধর্মতলা, শ্যামবাজারে অগ্নিসংযোগ করা হয় ।

[27] সেনগুপ্ত, মনিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৪৪।

[28] *দৈনিক বসুমতী,* ৪ জুলাই, ১৯৫৩।

বিভিন্ন জায়গাতে পথ অবরোধ করা হয় এবং পুলিশ জনতা সংঘর্ষ শুরু হয়। **১৯৫৩** সালের ৪ই জুলাই কলকাতা ও হাওড়া দুই জেলায় হরতাল ডাকা হয়। স্কুল, কলেজ, বাজার, হাট বন্ধ রাখা হয়। বাম দলের কর্মী সমর্থকরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। পুলিশ বামদলীয় কর্মীদের উপর অত্যাচার চালায়। প্রচুর সমর্থক ও কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। এই দিন প্রায় ছয়শত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[29] বাম নেতাদের মধ্যে যে প্রধান আট জন নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন-

১. শ্রী অমর বসু [ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট)]

২. শ্রী মহিত মৈত্র [কমিউনিস্ট পার্টির]

৩. শ্রী গণেশ ঘোষ [আর .সি. পি. আই পার্টির]

৪. শ্রী বিশ্বনাথ দুবে [বলশেভিক পার্টি]

৫. শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষাল [আর. সি. পি. আই]

৬. শ্রী হেমন্ত বসু [ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট)]

৭. শ্রী জ্যোতি বসু [কমিউনিস্ট পার্টির]

৮. শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি [সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার]

ট্রাম বর্জন আন্দোলনের দ্বিতীয় দিবসে গণপ্রতিরোধ সংগ্রাম দৃঢ়তর হয়। ট্রাম কোম্পানির অফিসের সম্মুখে ৮০০জন নর-নারীর বিক্ষোভ।[30] বিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে এঁদের গ্রেপ্তার করে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সর্বত্র মিটিং মিছিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার মিটিং-মিছিলের রোধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ট্রাক ভাড়া প্রতিরোধ কমিটি ময়দানে জনসভার ডাক দেন। ময়দানে জনসভার সাংবাদিকদের আটকানো হয় এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের মারধর করা হয়। **১৯৫৩** সালের ২৩ জুলাই তারিখের দৈনিক *বসুমতি* পত্রিকার প্রতিবেদনে এই বর্বোরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা হল "সাংবাদিক নিগ্রহ কংগ্রেসী সরকারের

29 *দৈনিক বসুমতী,* ৫ জুলাই, ১৯৫৩।

30 *দৈনিক বসুমতী,* ৪ জুলাই, ১৯৫৩।

বিশ্বরেকর্ড স্থাপন। প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা শ্রী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কর্মরত বহু সংবাদপত্র প্রতিনিধি গ্রেপ্তার।[31]"

শ্রী সত্যপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায় ও বহু সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং সাংবাদিক নিগ্রহকে নিয়ে কংগ্রেস সরকারের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সাংবাদিক নিগ্রহের কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা মধ্যেও মতবিরোধ তৈরি হয় পুলিশের অত্যাচারের দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের উপর চাপানো হয়।[32] সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সমালোচনা করেন। কংগ্রেস সরকারের সাংবাদিকদের উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। তিনি 'কেলোর কীর্তি' নামে একটি প্রতিবেদন লেখেন। এই প্রতিবেদনে কংগ্রেস সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

সরকারের এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য কমিউনিস্টরা এইসব কার্যকলাপ করছেন। গণআন্দোলনের নামে এই হিংসাত্মক কার্য কলাপের পিছনে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর ষ্টেশনে পুলিশের গুলিতে একজন মারা যায়। ৬ জন গুরুতর আহত হয়। দক্ষিণ কলকাতায় শৈলেন্দ্রনাথ নামে ৫০ বছরের একজনের মৃত্যু হয়। ট্রাম বর্জন, পিকেটিং-এর জন্য শত শত কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।[33] সরকার বাধ্য হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। ৮ই জুলাই অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী এক বৈঠকের আয়োজন করেন। কিন্তু মিটিং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনকে সমাজ বিরোধীদের আন্দোলন বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[34]

বাম দলগুলোর পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করা হয়। এই বিবৃতিতে জানানো হয় ট্রাম ভাড়া যত দিন রধ না হবে ততদিন শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা

---

[31] *দৈনিক বসুমতী,* ২৩ জুলাই ১৯৫৩।

[32] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৮ জুলাই, ১৯৫৩।

[33] *দৈনিক বসুমতী,* ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

[34] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

ঘোষণা করা হয়।[35] ১৯৫৩ সালের ১৭ জুলাই টাউন হলের এক সভায় সকল বামদলগুলির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে যতদিন পর্যন্ত সরকার প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে আলোচনায় না বসবে ততদিন পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। এই আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষ এতে যোগদান করেন। এই তপশিলি উদ্বাস্তুরা বেশিভাগ ছিল শ্রমিক তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার খারাপ থকায় ট্রামের বর্ধিত ভাড়া দেওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। বর্ধিত ট্রামের ভাড়া দেওয়া তাঁদের পক্ষে তাই সম্ভব ছিল না। তাই তাঁরা সর্বত্র গর্জে উঠেছিল। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনের ফলে ট্রাম কোম্পানিগুলোর আয় কমে যায়। ট্রাম কোম্পানির এজেন্ট মিস্টার ব্রিজ রাজ্য সরকারকে জানান যে সেখানে দৈনিক ট্রাম কোম্পানির টিকিট ৬০ হাজার হত তা কমে ২০ হাজার টাকা হয়।[36]

সরকারের দমনমূলক নীতির জন্য কংগ্রেসের জনভিত্তি নষ্ট হয় এবং বামদলগুলো ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বাম দলগুলোর সংগঠন গড়ে উড়তে থাকে। বহু তপশিলি ও উদ্বাস্তু রাজনৈতিক নেতার পরিচিতি লাভ কর। এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অনেক শ্রমিক নেতা ও পরিচিতি লাভ করে। আন্দোলন প্রতিরোধ করতে সরকার যে ব্যর্থ হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী তা স্বীকার করে নেন।[37] ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বিচারপতি প্রশান্ত বিহারী মুখার্জিকে দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। অবশেষে সরকার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত রাখে তদন্ত কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন বন্ধ করেন [38] বামদলগুলো ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাম মতাদর্শের বিভিন্ন সংগঠন ও দলগুলো সহবস্থানের নীতিতে ছিলেন না। কিন্তু এই আন্দোলনের মাধ্যমে বামদলগুলোর ঐক্যবদ্ধতা আরো সুদৃঢ় হয়।

বাম গণআন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান

---

35 *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯জুলাই, ১৯৫৩।

36 *দৈনিক বসুমতী,* ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

37 *দৈনিক বসুমতী,* ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

38 *স্বাধীন পত্রিকা,* ১৯ জুলাই, ১৯৫৩।

পঞ্চাশের দশক পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের যুগ বলা হয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কৃষকরা কংগ্রেস বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের আন্দোলনে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেনি। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশগ্রহণ করেছে। শহরবাসী ছোট চাকরিজীবী, শিক্ষক গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ সালের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ শিক্ষানীতিতে মেকলের সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল। মেকলে এর মর্মকথা ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতের মুষ্টিমেয় বিত্তবান তথা অভিজাত বর্গের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হোক। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হোক এমন স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় যাঁরা হবেন ইংরেজ ও ইংরেজির তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুরাগী ও বংশবদ অনুগামী। তাঁরাই রচনা করবেন ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সুস্থির বুনিয়াদ।[39]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে বেকারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত অভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানের, বিদ্যালয়, কলেজর খরচ, শিক্ষকদের বেতনের সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্কুল পরিচালনা ও খরচ সংকুলানের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা লেখি শুরু হয়। সরকারের শিক্ষানীতির নানা সমালোচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের বেতনের দাবি করা হয়।

সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে ১৯ জানুয়ারি বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিরিখে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিকাঠামো বিঘ্নিত হতে পারে। এই আশঙ্কায় ‘নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি’র পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ

---

[39] *স্বাধীন পত্রিকা,* ২০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ।

[39] বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *হেডমাস্টার ম্যানুয়েল,* স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.পৃ. ৫৫০-৫৫১।

করা হয়। এই শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সরকারের এই সংস্কারে পশ্চিমবাংলার ২৫ হাজার শিক্ষকদের অধিকাংশ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে। শিক্ষকদের একটি বৃহৎ অংশ সরকারের বিপক্ষে গিয়ে এই শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে কর্মবিরতির ডাক দেয়। এই বিভেদকামী সংস্কারের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের 'মধ্যশিক্ষা শিক্ষক সংগঠন' কর্ম বিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[40]

শিক্ষক সংগঠনগুলো জানান যে ৩৫% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাবে। বেসরকারি বিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ৯৮৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬৫২৬ শিক্ষকই সরকারি সাহায্য পায় না। এর ফলে শিক্ষকদের বৃহত্তম অংশ সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের আমলে শিক্ষকদের বর্ধিত বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে ন্যূনতম মহার্ঘভাতা প্রয়োজন ছিল সেই নৈতিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখায়।[41] শিক্ষকদের ন্যায্য মহার্ঘ ভাতার দাবিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার জবাবে এক বিবৃতিতে বলা হয় তাদের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের বর্তমান মূল্য ক্রয় ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে।[42] মাধ্যমিক, জুনিয়র বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বামপন্থী শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষক সংগঠন গড়ে ওঠে। শিক্ষক সংগঠনগুলোর ক্রমাগত চাপের কাছে সরকার নতি শিকার করতে বাধ্য হয়। শিক্ষক সংগঠনগুলো তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ১৯৫৪ সালে সরকার বেতন বৃদ্ধিতে বাধ্য হয় ।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ ও শিক্ষক কর্মচারীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কর্মবিরতির ডাক দেয়। মাধ্যমিক শিক্ষকদের এবং শিক্ষক সংগঠনের কর্মবিরতির দাবি বাম দলগুলো সমর্থন জানায়। বাম দলগুলো যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে জানান যে শিক্ষকদের প্রতি সরকারের মনোভাব নিয়ে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। শিক্ষক সমাজ মানব মনের গঠনকারী

---

[41] স্বাধীন, ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

[42] বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *হেডমাস্টার ম্যানুয়েল,* স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৭,পৃ.পৃ. ৫৪৮-৫৪৯ ।

বলে সমাদৃত হয়ে থাকে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা ও সেই শিক্ষকদের সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার উদাসীন মনোভাব প্রদর্শন করেছেন।[43] সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে শিক্ষক সংগঠনগুলো ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন।

১৯৫৪ সালে এই আন্দোলন আরো জোরদার হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন'কে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু জানান যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করছে না, শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলা করছেন। এই আন্দোলন শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। দ্রুততার সাথে এই আন্দোলন ছাত্র, অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১০ জানুয়ারি শিক্ষকদের কর্মবিরতি সিদ্ধান্তের প্রস্তুতিতে 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি'র উদ্যোগে ওয়েলিংটনের সভায় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন- "স্বভাব শান্ত মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিলে নিস্তার নাই, এই সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যটি আমরা সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই"।[44] তিনি আরো জানান যদি মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে তবে তা সরকারের পক্ষে ভালো হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের সরকার বিরোধীতা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষকদের বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি' মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় এই আন্দোলন শুরু হয়। কলকাতা, ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া কোচবিহারে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় শিক্ষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বামপন্থী নেতারা এই আন্দোলনের রেশ বিধানসভায় উৎক্ষেপণ করে। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১৮ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের ধর্মঘটের ঢেউ বিধানসভাকে উত্তাল করে তোলে।[45]

---

43 বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *হেডমাস্টার ম্যানুয়েল,* স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.পৃ. ৫৫০-৫৫১

44 *স্বাধীন পত্রিকা,* ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

45 *দৈনিক বসুমতী,* ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

এই সময় বামপন্থী আন্দোলনের রণকৌশল ছিল বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে একযোগে প্রবল আন্দোলন করে সরকারকে ‘বেকায়দায় ফেলা’ এবং ‘বিভিন্ন দাবি-দাওয়া’ আদায় করা। শিক্ষক আন্দোলন ও অন্যান্য বহুগণআন্দোলনে এই কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[46] এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষও সমর্থন জানায়। ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নেয়। প্রবল চাপের মধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষক সংগঠনগুলো রাজভবনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা আয়োজন করে। পুলিশ পথ আটকালে শিক্ষকরা সাধারণত রাজপথেই বসে পড়েন। শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যতক্ষণ না তাঁদের দাবি মানা না হয় তাঁরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার বিরোধী বাম দলগুলো শিক্ষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সকল বামদলগুলো বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা শিক্ষকদের সমর্থনে হরতাল করবেন। শিক্ষকদের সমর্থনে হরতালে বামপন্থী নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলে তাঁদের দাবী সরকার মেনে নেয় নি। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ডঃ বিধানচন্দ্র রায় শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর রায় কতৃর্ক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।[47]

শিক্ষকদের মিছিলের অভিমুখ বিধানসভার দিকে অগ্রসর হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে।[48] বিধানসভার ভেতরে বামদলগুলো শিক্ষকদের ডেপুটেশন গ্রহণের দাবি জানায়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের সরকার গ্রেপ্তার করেন। শিক্ষকদের আন্দোলন বামেদের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে এলে বামপন্থী নেতা বিভূতি ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকার বামদলগুলোর নেতাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেন। বিধানসভার ডেপুটি লিডার মণিকুন্তলা সেন, অধ্যাপক নিমাই ভট্টাচার্য ও শ্রী জ্যোতি জোয়ারদারকে গ্রেফতার করা হয় ।

---

[46] *স্বাধীন পত্রিকা,* ১১ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪, ।

[47] *স্বাধীন পত্রিকা,* ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪।

[48] মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, *চুয়ান্ন: স্মরণীয় বার দিন,* কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮০।

শ্রীমতি মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতে লিখেছেন-“আমি তৎকালীন কারা মন্ত্রী জীবন রতন ধরকে দেখা করতে অনুরোধ করলাম। উনি এলেন। ভারী ভদ্র এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন উনি কারো বিদ্বেষ বিরক্তির পাত্র ছিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম-এটা কি হচ্ছে? আমাদের দুজনকে আটকে রেখেছেন কেন? যাঁরা আপনাদের লক্ষ ছিলেন তাঁরা তো দিব্যি গটগট করে চলে গেলেন। উনি বললেন বলতে আমায় বারণ আছে; তবু আপনাকে বলছি।[49] ডক্টর রায় আপনার উপর ভারী চোটে আছেন। তিনি বলেছেন-মেয়েটা থাকুক আরও কদিন জেলে। এমন শান্ত ও ভদ্র মেয়ে শেষে কিনা এই কাজ করল। ওর একটু শাস্তি হওয়াই দরকার। আমি আর কিছু বললাম না, লজ্জা বোধ করছিলাম।”[50]

গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের আন্দোলনকারীদের উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. শ্রীমতি মণিকুন্তলা সেন [এম.এল.এ (সি. পি .আই)]

২. শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী [এম.এল.এ(সি.পি.আই)]

৩.শ্রী জ্যোতিষ জোরদার [এম.এল.এ (এস.আর.পি)]

৪.ত্রিশূর উদয় মল্লিক চৌধুরী [এম.এল.এ(ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী)]

৫.শ্রী নিত্য নারায়ন ব্যানার্জি [হিন্দু মহাসভা]

৬.শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি [এস. ইউ.সি] প্রমুখ।[51]

বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু গ্রেফতারের আশঙ্কা করেন বিধানসভার স্পিকারের কাছে জোর দাবি জানান যে, তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। তাই তিনি বিধানসভার ভেতরে থাকতে চান। হেমেন্দ্র ঘোষাল ও ডক্টর রণেণ সেনকে নিয়ে তিনি বিধানসভায় থেকে যান। রাজপথে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেদিনের আন্দোলনের প্রবাহ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পর্যন্ত পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

---

[49] সেন, মণিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* পৃ.পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[50] সেন, মণিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[51] Home (Poll) Department Govt. of India 1954 SL. 4, Sub: Application of Preventive Detention Act to Deal with Teachers strike, WBSA

পুলিশের গুলিতে ছাত্র, শিক্ষক আন্দোলনে মারা যায়। পি.ডি.এফ এর মাধ্যমে ৫৪জন শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিধানসভা ঘিরে রেখে আন্দোলন চালানো হয়। বিধানসভা ঘিরে রেখে আন্দোলনকারীরা এম.এল.এ দের বিধানসভায় প্রবেশ করতে বাধা দেন এবং এর ফলে বাজেট পাস করা অসম্ভব হয়।[52]

ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনের চেয়েও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। বামপন্থী নেতারা সরকার বিরোধী বৃহৎ গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। ডক্টর রায়ের সরকার তা বুঝতে পেরে যান। সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য অবশেষে বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু গ্রেপ্তার করেন। এতে সরকার বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার হয়। অবশেষে সরকার ৭০ শিক্ষক ও নেতার মুক্তি দেয় কংগ্রেস সরকার। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামদলগুলো শিক্ষকদের মন জয় করে নেয় এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি বামদলগুলোর হাতে চলে যায়। কংগ্রেস সরকারের শিক্ষানীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় সরকারের এই নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। বামদলগুলোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনের দাবিকে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা সমর্থন জানায়। শিক্ষক সংগঠনগুলো এই দাবি পেশ করে যে সরকার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ব্যর্থতা ঠেকাতে শিক্ষকদের উপর দমনপীড়ন চালায়।

১৯৫৪ সালে সরকার নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৬ সালে বিধান পরিষদ সদস্য সত্যপ্রিয় রায় বলেন যে সরকার যদি ‘নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি’র দাবি না মানেন তাহলে পুনরায় কর্মবিরতি শুরু হবে।[53] সরকার একে ধর্মঘটের আভাস বলেই মনে করেন। সরকার শিক্ষকদের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন এর সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সংগঠনের ২৩তম বার্ষিক অধিবেশন হয়। ‘নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সংগঠন’র বার্ষিক অধিবেশন সরকার বিরোধী অধিবেশনে

[52] Home (Poll) Department Govt. of India 1954 SL. 4, Sub: Application of Preventive Detention Act to Deal with Teachers strike, WBSA।

[53] দৈনিক বসুমতি, ২১ এপ্রিল, ১৯৫৬।

পর্যবসিত হয়। এই সভা উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।[54]

১৯৫৬ সালে সরকার বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কিছু আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেন। কিন্তু আর্থিক সাহায্য কোন মানদণ্ডে বিদ্যালয়গুলো পাবে তা সরকার স্পষ্ট করতে পারেননি। এছাড়া মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিষয়ে কিছুই জানে না। শিক্ষক সংগঠন এ.বি.টি.এ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫৭ সালে ও শিক্ষক কর্মচারী ও গ্রন্থকারের এক সম্মেলনে ৩৫ টাকা মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানায়। সম্মেলনে অবিলম্বে শিক্ষক, করণিক, ও গ্রন্থাগারিকদের বিনা শর্তে ৩৫ টাকা সরকারি মহার্ঘ ভাতা এবং বিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ১০ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার দাবি করেন।[55] শিক্ষকদের আন্দোলন শুধুমাত্র পেশাগত দাবির মধ্যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের দাবিকে সামনে রেখে শুরু হয় ।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন মার্চ মাসে শিক্ষক সম্মেলন দিয়ে শুরু হয়। এই সম্মেলন থেকে মহার্ঘ ভাতা সাড়ে ১৭ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা করার দাবি উঠে। এই সম্মেলনে বলা হয় যে শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভ্রান্ত নয় রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বিভ্রান্ত। শিক্ষানীতি এই রকম বিভ্রান্ত হলে রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বিপথে চালিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার কলেজগুলির বেতন কাঠামো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির উপর ছেড়ে দেয়। বিরোধীরা দাবি করেন যে কতগুলি শব্দ ছাপিয়ে ডক্টর রায় কলেজ শিক্ষকদের চাকরির উন্নয়নের কথা বলেন। সরকার ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলে।

এই সময় রাজ্যজুড়ে শিক্ষকদের ঐতিহাসিক আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছিল।[56] ১৯৫৭ নিরুপায় হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে অনেক আন্দোলন হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী বিধানসভার

---

54 দৈনিক বসুমতি, ২১ এপ্রিল, ১৯৫৬।

55 রায়চৌধুরী, মহিতোষ, সম্পাদক, *শিক্ষক, বৈশাখ, ১৩৬৪, দশম বর্ষ, দশম সংখ্যা।*

56 গণশক্তির পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০০২) শীর্ষক এক বিশেষ *ক্রোড়পত্র* প্রকাশিত অশোক ঘোষের রচিত প্রবন্ধ, ‘বামফ্রন্ট এবং এ রাজ্যের গণ-আন্দোলন’ কলকাতা, প্রকাশকাল, ২০০২, পৃ.-২৩

ভিতর নানা কটুক্তি করলে মণিকুন্তলা সেনগুপ্ত তীব্র প্রতিবাদ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তপ্ত বাক্য হয় পরবর্তী সময়ে মণিকুন্তলা সেনগুপ্তর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে শিক্ষক আন্দোলনের হাত ধরে পশ্চিমবাংলার শক্তিশালী নবীন শিক্ষক সংগঠন তৈরী হয়। বাম দলগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাশাপাশি এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তী কালে বাম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষক সংগঠনগুলোই শ্রেণী ভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি করে, যেমন শিক্ষক সমিতি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি। এই সমিতিগুলি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শক্তি 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র উত্থান গঠাতে সক্ষম হয়। বামদলগুলো ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

সংযুক্তি বাংলা আন্দোলনে বামপন্থীদের অবস্থান

স্বাধীনতার পর ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' গঠন। ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন শুরু হয়। এই রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু। রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাভিত্তিক সীমা নির্ধারণ করলেও এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। সমস্যার সূত্রপাত হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে বিহারের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণ ভারত সরকার পুরুলিয়ার মহকুমার চান্ডিলা ও পতমদা পুলিস স্টেশন বিহারে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[57] এই সময় বাংলা বিহারের মধ্যে সীমন্ত সমস্যা চরমে ওঠে। বাংলা ও বিহারের সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি 'সাব কমিটি' গঠিত হয়। 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি' সাব কমিটি গঠিত হয় ইউ.এন ধেবরের সভাপতিত্বে। এই সাব কমিটিতে ছিলেন পন্ডিত নেহেরু মৌলানা আজাদ প্রমুখ।[58] এতে পশ্চিমবঙ্গবাসী খুবই ক্ষুব্ধ হয় বিশেষ করে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষ এই নীতির জন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকেই দায়ী করে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মানভূম, ধলভূম,

---

[57] Chakraborty, Saroj with Dr.B .C Roy and other Chief Ministers, পৃ. ২৯৮।

[58] সেনগুপ্ত, নীলেন্দু, *বিধান চন্দ্র ও সমকাল,* ২১ শতক, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৬৪।

সাঁওতাল পরগনা, পূর্ণিয়াকে সংযুক্তকরণ এর পক্ষে যথাযথ যুক্তি উপস্থাপনা করে।[59] মানভূম, সাঁওতাল পরগনা পূর্ণিয়ার বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের আইন সঙ্গত ও দীর্ঘদিনের বাংলা সংযুক্তিকরণ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। এই ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তাঁরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

মানভূম বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন সংযুক্তিকরণ এর পক্ষে তাঁদের যুক্তি প্রদান করেন । মানভূম জেলার গেজেটিয়ার অনুসারে এখানকার ৭২ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। এছাড়া আদিবাসীদের ভাষা হল সাঁওতালি। তবে বেশিরভাগ আদিবাসী বাংলা ভাষায় কথা বলে। জামশেদপুর বাদ দিয়ে মহাকুমার অধিকাংশ মানুষের ভাষা হল বাংলা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি গণনা অনুসারে দেখা যায় মানভূমের সদর মহকুমা বাংলা ভাষার একটি প্রধান কেন্দ্র এবং এখানে শতকরা ৮১% বাংলাভাষী। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মানভূমের জনসংখ্যার ১৮,১০,৮৯০জনের মধ্যে ১২,২২,৬৮৬জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা; হিন্দিভাষী সংখ্যা ছিল ৩,২১,৬৯০ ও সাঁওতালি সংখ্যা এবং সমগ্র জেলার বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৭ জন।[60] অর্থাৎ ভাষাভাষীর নিরিখে বিচার করলে অধিকাংশ মানুষেরই মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ এই বাংলাভাষী মানুষদের পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে রাখার পরিকল্পনা করা হয়।

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি খুবই জটিল ছিল। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৫৩ সালের ৭ মে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিশেষ মোশন বিধানসভায় উপস্থাপন করে বলেন- "ভাষা ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানকল্পে এবং বিহারের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি ও উত্তর অধিকার রক্ষার জন্য

---

[59] B.C Roy Papers (Printed Material), Sl. No. 19, শীর্ষক ফাইলে সংরক্ষিত মানভূম বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন পুরুলিয়া, কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ, বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহের পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার দাবি, NMML.

[60] B.C Roy Papers (Printed Material), SL.No.১৯, শীর্ষক ফাইলে সংরক্ষিত মানভূম বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, পুরুলিয়া, কর্তৃক সংকলিত প্রকাশিত গ্রন্থ-বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহের পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার দাবি, NMML.

বাংলার সীমানা বৃদ্ধি এবং বিহারের আয়তন খর্ব করা হউক।[61] পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিলেন।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সভাপতি হেমন্তপ্রসাদ ঘোষ এক বক্তব্যে বলেন -"পশ্চিমবঙ্গের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতক রূপে একে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের অন্যান্য ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা চলে। তিনি আরো বলেন ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাঙালিরা নিজেদের সমাধি রচনা করিবে।[62] ভারত সরকার পরিকল্পনা করে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করতে চাইছেন। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে এই দাবি উঠেছে বাংলা ভাষাভাষি অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনেক বাংলা ভাষাভাষি মানুষ এই নিয়ে আন্দোলন করেছে। বাংলা যুবক বৈদ্যনাথ ভৌমিক দীর্ঘ ২২ দিন অনশন করেন। এরফলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি জোরালো হয়। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বিচলিত হন। প্রদেশ সভাপতি জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো আন্দোলন শুরু করে। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিরূপ আচরণ করছেন। কংগ্রেস সরকার বাঙালিদের ভাগ করেছেন। ব্রিটিশরা ১৯০৫ এটা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই প্রচার তাঁরা করতে থাকেন। বাম দলগুলোর এই দাবিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ডক্টর রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উভয় মিলে বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ এর প্রস্তাব দেয়। বাংলা ও বিহার সংযুক্তির মাধ্যমে একটি প্রদেশ হবে যার নাম হবে পূর্ব প্রদেশ। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ব্যাপারে দেশে যেভাবে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর এস.কে সিংহ এই সময় খুবই বিচলিত ছিলেন।

---

[61] West Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1953, Vol.VII, No.3 WBLAL, পৃ.পৃ. ১০১৬-১০২৭।

[62] West Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1953, Vol.VII, No.3, WBLAL, পৃ.পৃ. ১০১৬-১০২৭; *দৈনিক বসুমতি,* ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৫৩।

বিহারের যোগাযোগ মন্ত্রী ডক্টর সিংহের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর তিনি তাঁর আলোচনার ভিত্তিতে একটি যৌথ বিবৃতি খসড়া প্রস্তুত করেন।[63] বিহার ও বাংলাকে নিয়ে যৌথভাবে একটি প্রদেশ করার প্রয়াস নেওয়া হয়। যদিও এই প্রয়াস ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতিকে সমর্থন করে না। ডক্টর রায় বলেন যে বঙ্গ ও বিহার পরস্পরের পরিপূরক এবং তাদের পুনর্মিলন নিশ্চিত রূপে উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে। বাঙালির বুদ্ধি এবং বিহারের পরিশ্রম যুক্ত হলে দেশ শক্তিশালী হবে।[64] পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী বামদলগুলো রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই সময় ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টি সোচ্চার হয়েছিল।[65] বামদলগুলো ও নেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ করে।

বামদলগুলো দাবি করেন যে বাংলা ও বিহার সংযুক্তি হলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আদর্শের উপর আঘাত হানবে। বাংলা ও বিহার জনসাধারণ এই প্রস্তাবে কখনই গ্রহণ করবেনা। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের সময়ে বাংলা ও বিহার সংযুক্ত করণের নীতিকে বিহার ও বাংলার সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। প্রকৃতভাবে এই প্রস্তাবের মূলে কংগ্রেসের রয়েছে বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব। জ্যোতি বসু এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যে সি.পি.আই বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ নীতিকে গ্রহণ করছে না। তিনি আরো বলেন যে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর পুনর্গঠন শুরু হয়, যা দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে মান্যতা পেলেও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো এথেকে বঞ্চিত হয়। তিনি এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বিধানসভায় বলেন যে,"we should improve the economic condition of the state first. The land which are adjacent to Bengal and where Bengali people are living, demand that places only.....'[66] শুধুমাত্র বামদলগুলোর নয় কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট মানুষ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস সরকার বিরোধীদের দ্বারা এবং নিজেদের পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচনার মধ্যে পড়ে।

---

63 *দৈনিক বসুমতী,* ২৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৬।

64 আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ।

65 দৈনিক বসুমতী, ১৪ই জানুয়ারি ১৯৬৫।

66 Basu, Jyoti, Assembly speech on 9 December 1955.

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রতা বিপন্ন হবে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার এটা একটা অপকৌশল। তাছাড়া এই পরিকল্পনা উভয় রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করবে বলে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেন।[67] বাংলার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এই সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫৬ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারি ১১জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণের প্রতিবাদ জানায়।

১৯৫৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বামপন্থী দল নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি। অপর সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি পরিষদ হরতাল পালন করে। সোস্যালিস্ট পার্টির জ্যোতি সদ্দার, আর.এস.পি যতীন চক্রবর্তী ও একজন মহিলা কর্মী ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, অতুল গুপ্ত এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও প্রতিবাদ জানায়। শ্যামবাজার, ডালহৌসি, প্রভৃতি এলাকায় কর্মীরা প্রতিবাদ জানায়। ডক্টর মেঘনাদ সাহা (এম.পি) এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য- "বাংলা ও বিহার জন সাধারণের মতামত না লইয়া উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন বাঙালি জনসাধারণ তাহা সমর্থন করেন না। সমগ্র ভারতের উপর হিন্দি ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার জন্যই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। এর ফলে বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে'।[68]

১৯৫৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হলে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাখ্যানের দাবি জানানো হয়।[69] লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর যুক্ত প্রতিবাদ পত্র সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৩০ হাজার আইন অমান্য করেন এবং অনেকেই গ্রেপ্তার হন। এই আন্দোলনের ফলে ২০ হাজার আন্দোলনকারী গ্রেপ্তার হন। বাংলা বিহার সংযুক্তকরণ নীতি নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। জনগণ তীব্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে

---

[67] বেরা, অঞ্জন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, প্রথম খন্ড,* কলকাতা, ২০০২, পৃ.পৃ. ১১৬-১২২; বসু, জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৩।

[68] *দৈনিক বসুমতি,* ১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬।

[69] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১956।

উপনির্বাচনী ফলাফলে ও তার প্রভাব পড়ে। কলকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হন ।[70]

বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলন ও তার ঐতিহাসিক সাফল্য সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বলেছেন-"এটি একটি উদ্ভট পরিকল্পনা। আমাদের ছাত্র-যুব, উদ্বাস্তুদের সংগঠন প্রভৃতি এই আন্দোলন গড়ে তোলে। ডক্টর রায় হঠাৎ 'বেঙ্গল বিহার মার্জার' হবে অর্থাৎ একটা 'এস্টেট' হবে বলে ঘোষণা করেন। সেই সময় আমাদের দলের বাইরে পার্টি কংগ্রেস ছিল। আমি ও প্রমোদ বাবু যেতে পারলাম না। কারণ তখন এই আন্দোলনে আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি। আমাদের প্রায় ২০ হাজার লোক এই আন্দোলনে জেলে যায়। আমাকে অবশ্য তখন গ্রেপ্তার করেনি। ডক্টর রায় আমাকে এসে বললেন কি তোমরা আন্দোলন করছ, গ্রেফতার হচ্ছ। সামনেই তো দুটি উপনির্বাচন একটি উত্তর-পশ্চিম কলকাতা এবং অন্যটি বোধহয় বাঁকুড়া না কোথায়। এই দুটি নির্বাচনে ফলাফল থেকেই জেনে যাবে মানুষ কি চাইছে। আমি বললাম না। একটা নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে সমস্তটা বিচার করা যায় না। আন্দোলন যেমন চলছে চলবে এই পরিকল্পনা আপনি উইথড্রো করুন। দুটি উপ নির্বাচনে পরাজিত হল কংগ্রেস। এই প্রথম আমরা কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে জয় লাভ করি। ডক্টর রায় অবশ্য এর পরেই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।"[71]

পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলোর উত্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল বেরুবাড়ী হস্তান্তর সংক্রান্ত আন্দোলন। বেরুবাড়ী বাড়ি সমস্যা ছিল একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা কিন্তু আন্তর্জাতিক সমস্যা হলেও এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্তাল হয়। ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক চুক্তির মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী মৌজার কিছু অংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বামপন্থীরা বাংলার বিধানসভার বাইরে ও ভেতরে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুও অমান্য এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানায়। বিশ্লিষ্ট ব্যাপারটি ভারতের পার্লামেন্টে বিষয় বলে অধ্যক্ষ নাকচ করে দেয় । ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর বামদলগুলো

---

[70] বসু, জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৬।

[71] বসু, জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৬।

হরতালের ডাক দেয়। বামদলগুলো নিয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় প্রতিরোধ কমিটি। ১৯৫৯ সালের ১১ মে সর্বদলীয় কমিটি ডাকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর দাবি পরিবর্তনের ডাক দেওয়া হয়।[72] পশ্চিমবঙ্গের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল বেরুবাড়ী হস্তান্তর তীব্র বিরোধিতা করে।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনর ক্ষেত্রে সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন এক নতুন পথ নির্দেশ করে। বঙ্গ কেন্দ্রিক আন্দোলন অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।[73] ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ যথার্থ ভাবেই এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এই আন্দোলন গণসংগ্রামের ইতিহাসের সাফল্যের একটি নতুন পালক সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছিল।[74] পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী বামদলগুলো অপতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটাতে বামপন্থীরা সমর্থন হয়েছিল। সুদূরপ্রসারী ভাবে এই গণআন্দোলন বামপন্থীদের পশ্চিমবঙ্গে শক্তির ভিত মজবুত করতে সাহায্য করে।[75] বামপন্থীরা বাঙালি আবেগ কাজে লাগিয়ে তাঁদের সংগঠন বৃদ্ধি করে। বাঙালি ভাষার ও সংস্কৃতির দাবিকে সামনে রেখে দক্ষিণ ভারতের মত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ্য হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বাঙালি বিদ্বেষী তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জন-বিরোধী মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য-সংকট বিরোধী আন্দোলন

বাংলার মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিতভাবে খাদ্য আন্দোলন ১৯৬৯ ও ১৯৬৬ সালে সংঘটিতভাবে গণসংগ্রামে পরিণত হয়। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস সরকার বিরোধীদের দ্বারা প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়। খাদ্য সমস্যা ও মূল্যবৃদ্ধি জনিত আন্দোলন ১৯৫৭-১৯৫৮ তে শুরু হলেও তা গণআন্দোলনে পরিণত হয় ১৯৫৯ সালে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। এই খাদ্য সমস্যার

---

[72] *আনন্দবাজার পত্রিকা* ,১২ ই মে, ১৯৫৬।

[73] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার বিধানসভার একশো বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ.২৩৬।

[74] ঘোষ, অশোক, বামফ্রন্ট এবং এ রাজ্যের গণ-আন্দোলন' পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০০২) শীর্ষক বামফ্রন্টের ২৫ বছর পূর্তি *স্মারক রচনাসমূহ, দৈনিক গনশক্তি বিশেষ ক্রোড়পত্র,* কলকাতা, ২০০২।

[75] বসু, জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২৭।

কারণ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়া এই সময়ে প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। কংগ্রেস সরকার এই মানুষদের খাদ্য সমস্যা দূর করতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হয়। কলকাতার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বাড়তে থাকে। মূল্য বৃদ্ধির এতটাই যে শুধুমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই অসুবিধা হয়নি, মধ্যবিত্তরা প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দৈনিক বসুমতির ১৯৫৩ সালের ২৪ আগস্টের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়- "কলিকাতার বাজারে খাদ্যদ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।"[76]

১৯৫৬ সালে দ্রব্য মূল্য চরমে ওঠে। বাম বিরোধী দলগুলো মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। ১৯৫৬ সালের ৫ই জুন কলকাতা ওয়েলিংটন একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা দ্ব্যর্থহীভাবে বলেন যে চাল, ডাল, সরষের তেল প্রভৃতি জিনিস পত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি হাওয়ায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। একটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শেষ হবার পরও জিনিস পত্রের দাম হ্রাস পায়নি উল্টে হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এখানেই দাবি করা হয় মজুতদারদের মজুদ করা চাল সরকারকে অবিলম্বে গুদাম থেকে উদ্ধার করে সস্তায় জনসাধারণের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে।[77] বামদলগুলো ছোট ছোট সভার মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে থাকে।

এই সভা থেকে সরকারের কাছে কিছু দাবি পেশ করা হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের নিশ্চিত করা। এই সময় কালো বাজারি ও মজুদদারী সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৩ই জুন সুন্দরবনের হাড়োয়ার চাপাতলা মাঠে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সমাবেশে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু যে বক্তব্য রাখেন তা হল- "সুন্দরবন এলাকার দুর্ভিক্ষের কারণে ও কৃষকদের জীবনে সর্বনাশের জন্যে সরকারের অপদার্থ, কায়েমি স্বার্থবাদী নীতি দায়ী। ভূমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ

---

[76] *দৈনিক বসুমতি*, ১৪ ই আগস্ট, ১৯৫৩।

[77] *স্বাধীন পত্রিকা*, ৬ জুন ১৯৫৬।

বন্ধ ও সেচের ব্যবস্থা খাদ্য দ্রব্যের দাম হ্রাস প্রভৃতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমি আহ্বান জানাই।'[78]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় সভার আয়োজন করে। সুন্দরবনে সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে ভূমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ শুরু করে সেচ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সভায় সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে সরকার ব্যর্থতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। জ্যোতি বসু বলেন যে "The food movement was a mighty upsurge for food and relief and for the removal of food minister."[79] বামদলগুলো কংগ্রেসের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন খাদ্য সমস্যা সমাধানে যে ব্যর্থ তা প্রচার করতে থাকে। গ্রাম বাংলাতে খাদ্য সংকট প্রকট হতে থাকে। বিরোধী দলগুলো বিধানসভার ভিতরে সরকারকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৯৫৮ সালের বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী সদস্য শ্রী সুনীল দাসের চাল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের উৎপাদন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য মন্ত্রীর জবাবী বক্তব্য -পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন খাদ্য মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন বলেন যে, ১৯৬৬-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের চাল উৎপাদন হয় ৪১৪৫.৭ হাজার টন। অন্যান্য খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয় ১২১.৬ হাজার টন। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৩৩৬.৭ হাজার টন। অন্যান্য উৎপাদিত শস্য হয় ১০৩.৪ হাজার টন। ১৯৫৭ সালের পহেলা এপ্রিল নাগাদ সরকারের কাছে মজুদের পরিমাণ ৩.৩ হাজার টন। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া চালের পরিমাণ ছিল ১১২.৩ হাজার টন। ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্র থেকে কোন গম নেওয়া হয়নি। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১০ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রের কাজ থেকে চাল পাওয়া যায় ১,২১,৫০০ টন এবং গম ১৩৮,০০০ টন।[80]

১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের খাদ্য শস্য উৎপাদন যে পরিমান হয়েছিল তা যোগানের তুলনায় কম ছিল। বাম দলগুলো অভিযোগ আনেন যে সরকার অসাধু ব্যবসায়ী মজুতদারের হাত থেকে কালো বাজারি রুখতে ব্যর্থ। বামদলগুলো আরো অভিযোগ করেন যে

---

[78] বসু, জ্যোতি, যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৮।

[79] Chakraborty, Prafulla, The Marginal Man, Glory Printers, Calcutta, 1999, পৃ. ৩৬৫।

[80] *West Bengal Legislative Assembly Proceeding*, 1958, VOl-XIX, NO.2, পৃ. পৃ.. ১২-১৩।

সকল অসাধু ব্যবসায়ী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা কংগ্রেস পার্টির মদতপুষ্ট। উদ্বাস্তুদের মধ্যেও খাদ্য সমস্যা প্রকট হয় এবং পুনর্বাসন, খাদ্য সমস্যায় তারা সক্রিয় হয়। বিধানসভায় ভেতরে বিরোধীদলগুলো এই নিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১৯৫৫ সাল থেকে খাদ্য সমস্যা ও কর্মসংস্থানের সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জে.বি মিত্র *'ফুড স্ট্রাগেল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'* শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা হল-"since 1955, when the food situation took a serious turn, the distress and suffering of the people have steadily mounted, starvation on a mass scale, starvation death, suicides and the tragictrek thousand off pleasant families to Calcutta and to district town in search of food and employment have become annual features particularly between April September when the food crisis become extremely acute."[81]

সরকার দুর্নীতি বিরোধী কমিটি তৈরি করতে বাধ্য হয়। এই দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সদস্যগণ হলেন পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, ভূমি ও ভূমি রক্ষা মন্ত্রী শ্রী বিমল চন্দ্র সিনহা, আইন এবং উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং সেচমন্ত্রী অজয় মুখার্জি প্রমুখ। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতি নিয়ে মতভেদ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেন যে এই কমিটির মধ্যে মত ও মতান্তর দুইই আছে।[82] এই কমিটির শুধুমাত্র কমিটিতেই পড়ে রইল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। বামপন্থী দলগুলো বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে কংগ্রেস সরকার কোন সদুত্তর দিতে পারে নি।

সরকার খাদ্য সমস্যার জন্য পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দায়ী করতে থাকে। বিরোধীরা দায়ী করেন যে পাঞ্জাবে ও প্রচুর উদ্বাস্তু এসেছে পাঞ্জাব সরকারের পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার জন্য তারা মোকাবিলা করতে পেরেছে । পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাব। কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের বিমাতৃ সুলভ আচরণ করেছে।[83] উদ্বাস্তুদের

---

[81] Mitra, J. Vikas, *Food Struggle in West Bengal,* Nov 1997, পৃ. ৩৩৯।

[82] *West Bengal Legislative Assembly Proceedings, 1958, Vol.-XIX, No.* 2, পৃ. ৬০-৬২।

[83] *দৈনিক বসুমতী,* ৮ জুন, ১৯৫৬।

প্রতি কংগ্রেসের এই আচরণ উদ্বাস্তুদের একত্রিত করে এবং খাদ্য সংকট আন্দোলনের পক্ষ নিয়ে আসেন। উদ্বাস্তুরা বামেদের নেতৃত্বে খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত জায়গায় পাট চাষ হতো। পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলোর পাটের জোগান ঐ এলাকা থেকেই আসতো। কিন্তু বর্তমানে তা না আসায় ধান চাষের জমিতে পাট চাষ করতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া অনেক উদ্বাস্তু পরিবার এখানে আশ্রয় নেওয়ায় এই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রেশন, খাদ্য দিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিল। বেশিরভাগ রেশন ডিলার যে খাদ্য সরবরাহ করতো তা খাবার অযোগ্য ছিল। রেশন ডিলারদের অধিকাংশ ছিল দুর্নীতিবাজ। খাদ্যসামগ্রী কম পরিমাণে সরবরাহ করা হতো। সরকার দুর্নীতি রোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিল। বামদলগুলো ও তার শরিক দলগুলো এই বিষয়ে জোরালো প্রচার করে। এছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কংগ্রেস সরকারকে বাধ্য করে। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি সামনে আসতে শুরু করে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

এছাড়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপারকে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়, তেমনি নিম্নবর্ণীয় উদ্বাস্তুদের বিষয়টি অনীহার সাথে দেখা হয়। বেশিরভাগ তপশিলিরা বাস্তুহীন হয়েই রইল। উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে খাদ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। দক্ষিণবঙ্গে নমঃশূদ্রদের খাদ্য ও পুনর্বাসন আন্দোলনের সঙ্গে রাজবংশীরাও আন্দোলন গড়ে তোলে। উত্তরবঙ্গের বামদলগুলোর উদ্বাস্তুদের আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করে। ফলে সারা বাংলায় খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলন যুক্ত হয়ে গেল। অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী-The Marginal Men গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয় উদ্বাস্তুরা।[84]

খাদ্য আন্দোলন ও ন্যায্য মূল্যের দাবিকে সামনে রেখে বামপন্থী দলগুলো ১৯৫৬ সালেই জনমত সংগঠনের কাজ শুরু করেন। ১৯৫৬ সালের ৯ জুলাই ১০ হাজারের বেশি কৃষক-শ্রমিক উদ্বাস্তুদের ন্যায্যমূল্যের খাদ্য, রিলিফের দাবিতে বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। গ্রামের বহু মানুষ এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। হাজার হাজার মানুষ বিধানসভার দিকে

[84] Chakraborty, Prafulla, *The Marginal Man*, Glory Printers, Calcutta, 1999, পৃ. xxiii.

এগিয়ে এলে পুলিশ তাঁদের আটকায়।[85] বামদলের নেতারা দাবি করে যে খাদ্যমন্ত্রী খাদ্য সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। বিরোধীদের চাপের মুখে সরকার খাদ্য আন্দোলন দমন করার জন্য ৫,৫৩৪ ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলেন। সরকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয় এর ফলে খোলা বাজারে চালের দাম লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য সঙ্কট না থাকলে কেন বিভিন্ন জায়গায় 'গ্রুয়েল কিচেন' খোলা হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে যেখানে যেখানে দাম বৃদ্ধি হয়েছে এবং লোকের ক্রয়শক্তি বাইরে চলে গিয়েছে সেখানে প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং খাদ্যসঙ্কট ছিল তখন একটি বাস্তব ঘটনা[86] সরকারের এই পদক্ষেপ আন্দোলন কিছুটা জব্দ করতে পারলেও খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে তর্কাতর্কি চলতে থাকে। বাম দলের নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সরোজ রায় খাদ্য সংকট নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৫৭ সালের এপ্রিল থেকে ৩রা জুনের মধ্যে ৩লক্ষ মণ চাল ৩২ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান গুলোতে সরবরাহ করে। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন জেলা আধিকারিকরা ১.৫কোটি টাকা পাঠানো হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে অনাহার-অর্ধাহারে আত্মহত্যা সংবাদ আসতে শুরু করে। সরকার সংবাদপত্রের এই দাবিগুলো অস্বীকার করে। মন্ত্রী সরাসরি বলেন যে তিনি এরকম কোন খবর পাননি।[87] ১৯৫৭ সালে খাদ্য সমস্যা আরো প্রকট হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশ দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এই অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ ছিল উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ মানুষ ছিল তপশিলি জাতির। বামদলগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ খাদ্য সমস্যায় বিপর্যস্ত। খাদ্য সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তার পরিবর্তে সরকার খাদ্য সংকটে অস্বীকার করছে। এ প্রসঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য চিত্তরঞ্জন বসু বক্তব্য উল্লেখযোগ্য- "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমে বলতে চাই যে, এই খাদ্য নীতি জনসাধারণের স্বার্থের

---

85 বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৭।

86 West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Vol-XVII, No.3, 1957. Seventeenth Session, WBLAL, পৃ. পৃ. 2-5।

87 West Bengal Legislative Assembly Proceedings, Vol-XVII, No.3, 1957. Seventeenth Session, WBLAL, পৃ.পৃ. ৬৫-৬৭।

বিরুদ্ধে চলছে। এর জন্য আমি বলছি যে, আমাদের দেশে ও সারা পশ্চিমবঙ্গ জেলায় জেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের যখন রিলিফের প্রয়োজন, লক্ষ লক্ষ লোককে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সরকার সে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। সরকার এই সমস্যার ব্যাপকতা এবং বিশালতা নিজেদের মত সহজ করে দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় কথা সরকারের পক্ষ থেকে যে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।'[88]

বিভিন্ন জেলার বি.ডি.ও. (B.D.O) অফিসে খাদ্যের দাবিতে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার রিপোর্টে নানা বিষয় নিয়ে লেখা লেখি দেখা যায়। যে সরকার খাদ্য সমস্যা দূররার জন্য যে কোটি টাকা প্রদান করেন তার মধ্যে অনেক বি.ডি.ও. (B.D.O) ১০ হাজার টাকা প্রদান করে অথচ এই সব বি. ডি.ও. (B.D.O)তে খাদ্য সংকট দূর করার জন্য লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন ছিল। কোথাও আর্থিক অনুদানের পরিমাণ আরো সামান্য ছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রতিবেদন সরকারের ওপর চাপ বাড়ে। বিধানসভার ভেতরেও বিরোধীরা চাপ বাড়াতে থাকে। ১৯৫৭ সালের ১২ই জুলাই খাদ্য মন্ত্রী জানান যে পশ্চিমবঙ্গের চালের দাম ২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[89] সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য সংকটের কথা অস্বীকার করা হলেও, ১৯৫৯ সালে খাদ্য সংকট মহামারীর আকার ধারণ করে। বিভিন্ন জেলায় খাদ্যের অভাবে মারা যাওয়ার খবর আছে। খোলা বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও হয়ে যায়। গ্রামের অধিকাংশ বাজারে চাল পাওয়া যেত না। কিছু জায়গায় বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পাওয়া গেলেও তার বাজার মূল্য ছিল প্রচুর। কৃষক, শ্রমিক, তপশিলি জাতির মানুষদের খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।

সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেয়। সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাট অবরোধ করে জনসাধারণ সস্তা ও ন্যায্য মূল্যের খাদ্য দ্রব্য চেয়েছিল। তার পরিবর্তে তারা সরকারের পুলিশের কাছে থেকে এলো লাঠি। এ প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু স্মৃতিচারণা মূলক রচনায় মন্তব্য করেছেন- "১৯৫৯ সালটি ছিল একটি ঘটনা বহুল বছর। এই বছরে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট চরমে ওঠে, খোলা বাজার থেকে চাল প্রভৃতির ন্যায় অনেকগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্য উধাও হয়ে যায় এবং বহু গ্রামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কৃষক, শ্রমিক এবং

---

[88] West Bengal Legislative Assembly Proceedings, VOl.-XIX.3, 1957, পৃ. পৃ. ৪৩৭-৪৩৮।

[89] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১২৮।

শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়, তারা খাদ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং লাগাতার গণআন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের রাস্তা গ্রহণ করেন। জনসাধারণের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার পরিবর্তে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম দমন-পীড়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জনসাধারণ চেয়েছিল সস্তা দরের পর্যাপ্ত খাদ্য। পরিবর্তে পেলেন লাঠি, কাঁদানে গ্যাস এবং বুলেট।[90] সাধারণ মানুষ আওয়াজ তুলল 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার বাড়বে নাকো।' বিরোধী দলগুলো অতি মুনাফা বিরোধী আইন চালু করার দাবি জানায়। বিধানসভায় সি.পি.আই.(এম) নেতা জ্যোতি বসু খাদ্য সমস্যা গভীর সংকটের অবস্থা বর্ণনা করেন। কিন্তু সরকার খাদ্য সমস্যা গভীর সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দ্বারা সমালোচিত হয়।

১৯৫৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট পেশের প্রথম দিনই বিরোধী পক্ষ থেকে ১৫ টি 'adjournment motions' আনা হয় যার মধ্যে দশটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। ১৯৫৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস নেতা ও বিধানসভার সদস্য শ্রী বিজয় সিংহ নাহার শ্রী জ্যোতি বসুর সমালোচনার উত্তরে বলেন যে-"চীনের খাদ্যের ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে, এগিয়ে গিয়েছে রুশ। এত বছর ধরে কমিউনিস্ট দলের হাতে থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের ব্যাপারে সেরকম উন্নতি হয়নি। যতটা চীনদেশ অল্প সময়ে খাদ্যের ব্যাপারে উন্নতি করেছে রুশ তা পারেনি। সেজন্য হয়তো এবার তিনি রুশ ছেড়ে-চীন ধরেছেন। তবে এটা আমি বলবো যে কমিউনিস্ট নীতি গ্রহণ করলেই সব সময় উন্নতি হয় না এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনে কাজ না করলে উন্নতি সম্ভব হয় না। ভারত, চীন এবং রুশ এর মধ্যে তফাৎ আছে। রুশদেশে যেমন কালো রুটি খায়, কালো রুটি গমের নয়। বাজরা অন্য রকম জিনিসের হয়। আমরা যদি কাল রুটির ব্যবস্থা করি তাহলে ডেপুটেশন হবে এবং জ্যোতিবাবু তা লিড করে বলবেন- সরকার অন্যায় করেছে।[91]

---

[90] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন*, এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬৯।

[91] West Bengal Legislative Assembly Proceedings Feb-march, 1959, vol.XXII,No.I, (9thfeb), WBLAL.

পশ্চিমবঙ্গের চাল ব্যবসায়ীর একটা অংশ ছিল অবাঙালি। ব্যবসায়ীরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীদের একটি অংশ দাবি করলো যে বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে এই অসাধু ব্যবসায়ী। মুনাফারাজ কালো বাজারি মজুতদারদের বিরুদ্ধে কিন্তু কংগ্রেস সরকার আশ্চর্যজনক ভাবে যথেষ্ট কঠোরতা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সাহস হয়নি। এর পিছনে কারণ কি ছিল তা অনুমেয়। কংগ্রেস দলের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকদের অনেকেই এই অসৎ ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে কমিউনিস্ট ও বিরোধীদের অভিযোগ একেবারেই অযৌক্তিক নয়।[92] অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্য দ্রব্যের বাজার ও দখলদারি করছে। অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ ছিল কংগ্রেসের পার্টির যোগানদাতা। পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও অবাঙালি কংগ্রেস ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল।

বাম দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে, কংগ্রেস সরকার শুধুমাত্র উদ্বাস্তু বিরোধী নয় এরা বাঙালি বিরোধী। তাঁরা আরো দাবি করেন কংগ্রেসের সমর্থিত ব্যবসায়ীগণ এই দুর্যোগ দিনে জাতপাত এর বিচার করছে। তৎকালীন সরকার হিসাব অনুসারে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল -১৯৫৬ সালে চার লক্ষ টন, ১৯৫৭ সালে ৩.৪০ লক্ষ টন, ১৯৫৮ সালে ৭.৫০ লক্ষ টন, ১৯.৬০ সালে এই ঘাটতি দাঁড়ায় ৭.৮০ লক্ষ টন। বিরোধীরা দাবি করতে থাকেন যে খাদ্য সংকট ধীরে ধীরে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বামদলগুলো শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দায়ী করলেন না, কেন্দ্রীয় সরকারেরও তীব্র সমালোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট কেন্দ্রীয় সরকার ২লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সময়ে যে খাদ্য ঘাটতি ছিল তার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ লক্ষ টন। খাদ্যের সংকট থাকা কালীন অসাধু ব্যবসায়ীরা পুনরায় মুনাফা অর্জন করে।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদের তীব্র বিরোধিতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে নয়া দিল্লির সংসদ সদস্য সর্বদলীয় কমিটির বৈঠকের আয়োজন করতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য নীতি এই সময় বাস্তব কারণেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। ১৯৫৭ জুলাই মাসে নয়া দিল্লিতে সংসদ সদস্যদের সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির বৈঠক বসে ছিল। সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য রেশনিং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যের যে নমুনা দেখা গিয়েছে কমিটির প্রায় সব সদস্যই

---

92 *আনন্দ বাজার পত্রিকা,* ১৬ ই আগস্ট, ১৯৫৯।

তার কঠোর সমালোচনা করেন।[93] পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা, কালো বাজারি রেশনিং ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ৮ই আগস্ট ১৯৫৯ লোকসভার বিতর্ক চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার কথা উত্থাপন হয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার কথা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রইলো না। এটা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস সরকার দাবি করেন যে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বামদলগুলো এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। এপ্রসঙ্গে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বক্তব্য "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খাদ্য আন্দোলনের কারণ"।[94]

১৯৫৮ সালের ২৪শে অক্টোবর সরকার মুনাফাবিরোধী অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। এই অর্ডিন্যান্স শুধুমাত্র কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে চালু থাকবে।[95] উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো এর তীব্র বিরোধীতা করে। উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে ছিল। কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে বেশির ভাগ শ্রমিক অবাঙালি ছিল। সুতরাং সরকারের এই নীতি উদ্বাস্তু বিরোধী এবং বাঙালি বিদ্বেষী বলে দাবি করা হলো। সরকারের এই অর্ডিন্যান্সে গমের মূল্য ৩৭ পয়সা ধার্য করা হয়। এছাড়া আটা, ময়দা, সুজির উৎপাদন পাইকারি ও খুচরা মূল্য ধার্য করা হয়। কিন্তু চাল, ডাল, তেল, চিনি ওষুধপত্রের দাম নির্ধারণ করা হয়নি ।

এতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। কলকাতার ও শিল্পাঞ্চলের জন্য নির্ধারিত মূল্য ৪০ কেজি ২০ টাকা ৮০ পয়সা। পাইকারি ব্যবসায়ীরা ৪০ কেজি ২১ টাকা ৩১ পয়সায় বিক্রি করতে পারবে। আর খুচরা ব্যবসায়ীরা ৫৬ পয়সায় বিক্রি করতে পারবে। আটা প্রতি ৪০ কেজি পাইকারি ১৫ টাকা। পাইকারি ১৫ টাকা ৫০ পয়সা এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা ৪১ পয়সার বেশি বিক্রি করতে পারবে না। উৎপাদকের কেজি ৪৯ কেজি ২০ টাকা, পাইকারি ৪০ কেজি ২২ টাকা ৫৯ পয়সা এবং ৫৬ পয়সা খুচরা প্রতি কেজি বিক্রি করতে পারবে।[96] সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও বিরোধীরা দাবি করেন যে, বাজারে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে কোনো মিল নেই। কলকাতা দ্রব্যের মূল্য পরিমাণ ছিল প্রচুর। ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর

---

[93] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯ আগস্ট, ১৯৫৯।

[94] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২০ আগস্ট, ১৯৫৯।

[95] *স্বাধীন,* ২৫শে আগস্ট, ১৯৫৯।

[96] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩০ শে আগস্ট, ১৯৫৯।

জ্যোতি বসু বিধানসভায় 'নো কনফিডেন্স মোশন' নিয়ে আসেন।[97] ১৯৫৯ সালের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে সরকারের উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। বামদলগুলো মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ করে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে অবহিত করেন। বামদলগুলো শুধুমাত্র রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলেন না। দেশের অর্থমন্ত্রীর কাছে খাদ্য সংকট মূল্যবৃদ্ধির বিষয় অভিযোগ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট মন্বন্তরের মতই।

ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু সি.পি.আই.(এম) নেতা জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য দলের নেতারা মনে করেন যে কংগ্রেস সরকার খাদ্য সংকট মোচনে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে অনেকটাই ব্যর্থ। জ্যোতি বসু, নিরাঞ্জন সেনগুপ্ত, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন।[98] পরবর্তী সময়ে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি পুনরায় খাদ্য আন্দোলনের ডাক দিতে বাধ্য হয়। মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির দাবি করেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি গুদামে খাদ্য নষ্ট হচ্ছে অথচ খোলা বাজারে সাধারণ জনগণ খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছেনা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গুদামের সামনে প্রতিরোধ কমিটির ডাকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে ২৪ পরগনার মেটিয়াবুরুজের খাদ্যগুদামে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হচ্ছে। সংবাদপত্রে যথাযথভাবে মন্তব্য করা হয় যে, "জীর্ণ অভগ্ন ক্লাইভ জুট' মিলের পরিত্যক্ত কারখানায় মাসিক ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ভাড়া নিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে লক্ষ লক্ষ মণ চাল ও গম রাখিয়া হাজার হাজার মন পচাইতেছে তাহা বুভুক্ষু মানুষের প্রতি চরম উদাসীন ও অবহেলার এক জীবন্ত নিদর্শন।'[99] এতে প্রতিরোধ কমিটির দাবির সত্যতা প্রকাশ পায়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুদামে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হচ্ছে। সরকার নষ্ট খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে তা বন্টন করছে। এই খবর সামনে আসার পর বামদলগুলো বিধানসভার জরুরি অধিবেশনের দাবি জানায়। ১৫ জুন সরকার বিরোধী সর্বাত্মক

---

[97] জ্যোতি বসু, *বিধানসভার বক্তৃতা,* ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

[98] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬৯।

[99] *স্বাধীন,* ১০জুন, ১৯৫৯।

আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।[100] সরকারের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় যে সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্যের কোন অভাব নেই। সরকারি মূল্যে সাধারণের জন্য নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে। বামদলগুলোর পক্ষ থেকে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ডাকা হয় ।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ স্মারকলিপি প্রদান এবং ২৫শে জুন সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হয়।[101] গ্রামীণ এলাকায় কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। শহর এলাকায় শ্রমিক এবং শিল্পাঞ্চলে শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে হরতালকে সর্বাত্মক করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় কৃষি শ্রমিক এবং শহর শিল্পাঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘট পালন করেন। কলকাতাতে কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কয়ারে দুর্ভিক্ষ কমিটির ডাকে সমাবেশ করা হয়। সরকারকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সরকার অবিলম্বে খাদ্য নীতি পরিবর্তন না করলে আন্দোলন তীব্র করা হবে।

সরকার আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য রাজ্যজুড়ে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করেন। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কথা ঘোষণা করেন। বাম দলের শীর্ষ নেতারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মগোপন করেন। এর মধ্যে ১৬ জন বিধায়ক ও অনেক দলীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পি.এস.পি দলের কোনো নেতা গ্রেপ্তার হয়নি। জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখরা খাদ্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মগোপনের পথ বেছে নেন।[102]

শ্রী প্রফুল্ল সেন তাঁর সহনশীলতা অধৈর্য বাংলার বামপন্থীদলগুলো বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজে লাগান। সরকার দমন-পীড়ন শুরু হলে সারা রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল বের হতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের দিকে হাজার হাজার মানুষ যেতে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আইন অমান্য করা হয়। শত শত পার্টিকর্মীর সাধারণ মানুষ গ্রেফতার হয়। ৩১

[100] *স্বাধীন,* ১২জুন, ১৯৫৯।

[101] *স্বাধীন,* ১৬ ই জুন, ১৯৫৯।

[102] *স্বাধীন,* ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৯।

আগস্ট খাদ্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ বিরোধী কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করেন।[103]

বামদলগুলোর পক্ষ থেকে কলকাতার শহীদ মিনারে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। নিরন্ন কৃষক-শ্রমিক হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ ও নারী যোগ দেয়। বামদলগুলোর এই সমাবেশ ঐতিহাসিক সমাবেশে পরিণত হয়। বামনেতারা দাবি করেন যে তারা এই সমাবেশ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য আসেন নি, সাধারণ মানুষের পেট ভরানোর জন্য দু'মুঠো অন্নের দাবিতে এসেছে। সমাবেশ শেষে প্রচুর মানুষ রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে থাকে। পুলিশ গুলিচালায় ৮০জনের বেশি সাধারণ মানুষ মারা যায়। দেড়শ জনের বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়। বাম সংগঠনগুলো ধর্মঘটের ডাক দেয়। বাম ছাত্রসংগঠন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ গুলি চালায়। ১লা সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে ৮ জন মারা যায় এবং অনেকে গুরুতর ভাবে আহত হয়। সেপ্টেম্বর বামদলগুলো আবার আন্দোলনের ডাক দেয়। ২সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের চেহারা নেয়।

কংগ্রেস সরকার আন্দোলনের দাপটে ব্যারাকপুরের সেনাবাহিনীকে কলকাতায় তলব করে এনে মোতায়েন করেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট ২৬জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। প্রায় ১ হাজার লোক আহত হয়। স্টেট বাস অ্যাম্বুলেন্স ও বেসরকারি বাসে অগ্নিসংযোগ হয়।[104] অসংখ্য মানুষ আহত হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর ছাত্ররা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কয়ারে শহীদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী খাদ্য আন্দোলনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৫০ হাজার টন চাল এবং ৮০ হাজার টন গম প্রেরণ করেন।[105] খাদ্য আন্দোলন শ্রেণী আন্দোলনের পথ নেয়। এই আন্দোলনের একপক্ষে থাকে সরকার ও পুলিশ, অন্যদিকে গরিব মেহনতী ও খাদ্যহীন মানুষ।

---

[103] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

[104] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

[105] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

স্বাধীনতার পর প্রান্তিক মানুষ জাতপাতের রাজনীতি কিংবা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে জড়ায়নি। খাদ্য আন্দোলন গ্রাম বাংলার কৃষকদের সঙ্গে শহরের শ্রমিকদের মেলবন্ধন ঘটাতে সহযোগিতা করে। হাজার হাজার ছাত্র-যুব কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এতে শ্রেণী কেন্দ্রভিত্তিক বাম নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। এই শ্রেণী ভিত্তিক নেতৃত্বই পরবর্তী সময়ে বামদলগুলোকে নেতৃত্ব দান করেছে। গ্রামীণ এলাকায় ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, ছোট কৃষকদের নিয়ে সংগঠন তৈরি হয়েছে। আবার শহরের শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুবদের নিয়ে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। আর এই গণআন্দোলন গ্রামবাংলা ও শহরকে একত্রিত করেছে।

খাদ্য আন্দোলনের ফলে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের ৭৫% কৃষক অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার ৮৮৫ জন।[106] এতে গ্রামবাংলার কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক শ্রেণীচেতনার উন্মেষ হয়েছিল। গ্রামের কৃষকরা যে 'শোষিত ও সর্বহারা শ্রেণী' এই চেতনাবোধ তাঁদের একত্রিত করেছিল। ফলে বামদলগুলো গ্রামের কৃষকদের সংগঠন, গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন। খাদ্য আন্দোলনে প্রায় ১৫লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার শিল্পের উৎপাদন অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

প্রচুর শ্রমিক গ্রেফতার হয়েছিল। অনেক শ্রমিক পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিতে মারা যায়। ফলস্বরূপ বামদলগুলো শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনার উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠন জাতপাত কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে নয় বরং শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্তের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল। বামদলগুলোকে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন বামপন্থীদের গণভিত্তি তৈরি করে। মধ্য বাংলার উদ্বাস্তুদের সংগঠনের মধ্যে খাদ্য আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে। ১৯৬২ সালের নির্বাচন পি.এস.পি মাত্র ৫টি আসনে জয়লাভ করে। যেখানে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ২১টি আসন পায়। ১৯৬২ সালে বামদলগুলোর ভোটের শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে বিধানসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

---

106 *স্বাধীন,* ৪সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় খাদ্য আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বামদলগুলোর নেতৃত্বে তা পূর্ণতা পায় ১৯৬৬ সালের গণআন্দোলন সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৬ সালে রাজ্যব্যাপী গণসংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ লাঠিচার চালায়। বসিরহাটের স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় স্কুল ছাত্র নুরুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ লিখেছেন যে-"১৯৫৯ রক্তে সংকল্পবদ্ধ রাজ্যের জনগণের সংগ্রামী চেতনা ক্রমশ আরো শানিত হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে রাজ্যব্যাপী আবার গণসংগ্রাম কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে। খাদ্যের দাবিতে, কেরোসিনের দাবিতে লক্ষ লক্ষ জনতার দীপ্ত মিছিলে রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠলো।’[107] ১৯৬০ এর দশকে কংগ্রেস সরকার খাদ্য সমস্যা দূর করার জন্য জলসেচ ও কৃষি কাজের উন্নতির জন্য দামোদর ভ্যালি প্রকল্প সহ অনেকগুলি বহুমুখী নদীপ্রকল্পনা গ্রহণ করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সরকার বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা বিদেশে থেকে খাদ্য আমদানির তীব্র বিরোধিতা করেন। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানিকে বামপন্থীরা বাধা দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বামফ্রন্ট নেতা জ্যোতি বসুর বলেন যে-৬০-৬১ সালেও নানান ধরনের গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। বিশেষ করে পি এল ৪৮০ গম দেওয়াকে ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ‘ইন্দো আমেরিকান এডুকেশন ফাউন্ডেশন’ গড়ে তোলা হয়েছিল। যার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ বারবার আন্দোলন মুখর হয়েছে।[108] ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের কংগ্রেস বিরোধী খাদ্য আন্দোলন জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সাধারণ জনগণের উপর কংগ্রেস সরকারের দমন নীতি কংগ্রেস সরকারের জনসমর্থন ও জনভিত্তি আলগা হতে থাকে। বামপন্থীদের রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সমর্থনের জমিকে শক্ত করেছিল। জনসমর্থনকে মজবুত করার জন্য বামপন্থীরা খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র

---

[107] ঘোষ, অশোক বামফ্রন্ট এবং এ রাজ্যের গণআন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০০২) শীর্ষক ২৫ বছর পূর্তি *স্মারক গ্রন্থ*, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৬।

[108] বসু, বিমান গণআন্দোলনের পদ বেয়ে বামফ্রন্ট, দত্ত, নারায়ন সম্পাদিত, গণশক্তি পত্রিকার বিশেষ *ক্রোড়পত্র*, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭-২০০২) শীর্ষক ২৫ বছর পূর্তি স্মারক রচনা সমূহ, কলকাতা, ২০০২,পৃ. ১৬।

করে তাঁদের রণকৌশল তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই খাদ্য আন্দোলন বামপন্থীদের ১৯৭৭ সালে ক্ষমতা লাভের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলন ও বামদল

দেশভাগের পরবর্তী সময় সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতের যে দুটি রাজ্যের উদ্বাস্তুদের প্রকোপ আসে তার একটি হল ভারতের পূর্ব দিকের পশ্চিমবাংলা এবং অন্যটি হলো ভারতের পশ্চিম দিকের পাঞ্জাব। বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার মানুষ তাঁদের নিজ বাসভূমি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের (যাকে তৎকালীন সময় পূর্ববঙ্গ হত) প্রচুর মানুষ পশ্চিমবাংলার ফাঁকা জমিতে 'রিফুউজি ক্যাম্প' কিংবা রেলস্টেশন সংলগ্ন জায়গাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশভাগের সময় কিংবা তার পূর্বে কিছু মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন এঁদের বেশিরভাগই ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। রাজনৈতিক কারণে কিংবা দেশভাগের জন্য বাস্তুচ্যুত হলেও এঁরা বেশিরভাগই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশভাগের পর যারা আসেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিল হতদরিদ্র ও জাতপাতে ভিত্তিতে তপশিলি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুচ্যুত এই তপশিলি উদ্বাস্তুরা সরকারি জমিতে ও ফাঁকা জায়গাতে কলোনি স্থাপন করেন ।

মাস	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
জানুয়ারি, ১৯৫০	১,১৫০
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০	১,০০২
মার্চ, ১৯৫০	৭৫,৫৯৫
এপ্রিল, ১৯৫০	১৪,৯৬০
মে, ১৯৫০	২৭,৪৪০

দেশভাগের পরবর্তী সময় পশ্চিমবাংলায় সরকারের আশ্রয় শিবিরে যত উদ্বাস্তু আশ্রয় চেয়েছিলেন তাঁদের সকলে পশ্চিমবাংলায় স্থাপিত আশ্রয় শিবিরে স্থান পায়নি। তাঁদের একটা বড় অংশকে ভারত সরকারের অনুরোধে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার নিজেদের আশ্রয় শিবিরে

স্থান দিয়েছিল। তাঁদের সংখ্যা ২৫ হাজারের কম হবে না। এই তথ্য হতে বোঝা যাবে এই বছর মার্চ মাসে উদ্বাস্তুদের আগমনের হার কি বিরাট আকার ধারণ করেছিল।[109]

দেশ হারা, বাস্তুচ্যুত, খাদ্য অন্নহীন উদ্বাস্তুরা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিজেদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও বসতি স্থাপন করেন। আন্দামান, দণ্ডকারণ্য, নৈনিতাল, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বসবাস করতে শুরু করে। এই উদ্বাস্তুরা কিংবা তপশিলিরা বামদলগুলোর চালিকাশক্তি ছিল না উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানা মতাদর্শের মানুষ ছিল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে জাতপাত, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভেদাভেদও ছিল। বামপন্থীরা এই নানা মতাদর্শের মানুষকে তার প্রতিকূলতা দূর করে একটি মতাদর্শে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চেষ্টা করেন এবং বাম মতাদর্শের দ্বারা বাস্তুচ্যুত মানুষকে সংগঠিত করেন।

সর্বহারা উদ্বাস্তুদের কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস দল উভয়ে একটু বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করে। কংগ্রেস সরকার ভেবেছিল দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা পুনরায় তাঁদের নিজের দেশে ফিরে যাবেন। ফলে তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তের প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-"when the reefugees started pursuing in their thousands after after partition ,the state as well as the central government followed a policy of drift, hoping all the time the the influx would cease and the refugees would go back to their homes when the hurly-burly attending partition was over. This is clear from the report of the chief minister, Dr.P.C. Ghosh to Jawaharlal Nehru. He intimated to Nehru that the refugees would go back to their homes as soon as the situation clamed down a bit. But when the influx showrd no sign of abating, the state government had to you take some measures to cop with the increasingly swelling number of destitute refugees who where accommodated in hastily improvised government relief centres. The policy of the government of West Bengal regarding this

---

[109] বন্দোপাধ্যায়, হিরণময়, *উদ্বাস্তু*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৯২।

homeless man was enunciated binder by the minister, Nikunj Bihari Maity at a press conference held on 13 March 1948.There was no rehabilitation department at that time.[110]

ভারতের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর কংগ্রেস সরকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত জীবনধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিল। সরকারের প্রতি উদ্বাস্তুদের যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয় বামদলগুলো তাকে শ্রেণী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। জবরদখলীকৃত উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে সভ্য সমাজ গড়ার প্রচেষ্টায় শুরু হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনকে বামপন্থীদের মূলস্রোতের আন্দোলনের সঙ্গে মিশে যায়। কংগ্রেসের ধারণা ছিল দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব উদ্বাস্তুরা এ দেশে এসেছেন শান্তি ফিরলে সেই সব উদ্বাস্তুরা আবার নিজ দেশে চলে যাবেন। ফলে উদ্বাস্তুদের জন্য কোনভাবে পরিকল্পনাই করা হয়নি। অথচ পাঞ্জাব, হরিয়ানা কিংবা অন্যান্য রাজ্যে যেসব উদ্বাস্তুরা এসেছেন তাঁদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য কোন দপ্তর তৈরি করা হয়নি। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের বাগেরহাট, বরিশাল, ঢাকা, রাজশাহীতে প্রচুর দাঙ্গা হয়। বহু তপশিলি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের সরকার পাঞ্জাবের শরণার্থীদের প্রতি যে আচরণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সেই আচরণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু বলেন-তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন খান্না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার পাঞ্জাবে কোন লাঠি চলল না, গুলি চললো না, শান্তিপূর্ণ ভাবে সবকিছু হলো। ওদের ওখানে জবরদখল বলে কিছুই নেই আইনের মধ্যে, ওদের জন্য সব কিছু করে দেওয়া হল। অবশ্য কম সংখ্যক রিফিউজি ছিল। অথচ আমাদের এখানে তীব্র লড়াই আন্দোলন করতে হয়েছে।[111]

---

[110] Chakrabarty, Prafulla Kumar, *The Marginal Men*, Glory Printers, Calcutta, 1999, পৃ. পৃ. ১৫-১৬।

[111] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে: রাজনৈতিক আত্মকথন,* এন. বি.এ., কলকাতা, ২০১০।

দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা কংগ্রেস দল ও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে তৎকালীন অন্যতম কংগ্রেসের নেতা ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠিতে জানান যে, "উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার যে ৩কোটি টাকা সাহায্য পাঠিয়েছেন এবং ৫কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে তা পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়।"[112] বাঙালি কংগ্রেস নেতারা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিচলিত হলেও সর্বভারতীয় কংগ্রেস বাংলার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেননি। বরঞ্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর আশাব্যঞ্জক ছিল না। অপর দিকে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বস্তুত বেশির ভাগ হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় মানুষকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তার তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের বহু হিন্দু দেশ বিভাগের পরেও থেকে গিয়েছেন। তাই দুই সমস্যার চরিত্র আলাদা। তাছাড়া কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে যে টাকা পাঠানো হয়েছে তাও খরচ করা হয় নি।[113]

বিরোধী রাজনৈতিক দলের চাপে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দুই দেশের নেতারা চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯৫০ সালে নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি হয। সেই সময় থেকেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার অজুহাত হিসেবে উক্ত চুক্তিকে ব্যবহার করা হয়।[114] তাতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের যে ধরনের পুনর্বাসন দেওয়া হয়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সেরকম সুবিধা দেওয়া হয়নি। তাঁরা ক্ষতিপূরণের থেকে বঞ্চিত ছিল। ভারতে পুনর্বাসন মন্ত্রক পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে পুনর্বাসন দিয়েছিল।

ভারতের 'এস্টিমেট কমিটি' জানায় যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৫.৬৮ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকাতেই নয়, পুনর্বাসন শহরেও দেওয়া হয়। শহরে প্রায় ৪.৩৫ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ২.২০ লক্ষ ব্যক্তিকে

---

112 Chakraborty , Saroj with Dr BC Roy and other Chief Ministers, পৃ.পৃ.140-142।

113 Chakraborty , Saroj with Dr BC Roy and other Chief Ministers, পৃ.পৃ. ১৪৩-১৪৪।

114 রায়, রণজিৎ, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ: কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* কলকাতা, পৃ. ৯৬।

চাকরি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৮০হাজার ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ১২.২৫ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তুরা আসেন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি অবহেলা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো সরকারের এই বিমাতৃ সুলভ সিদ্ধান্ত নীতির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদ করেন।

স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তুরা ভারতে আসেন তাঁদের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে-পূর্ব বাংলা থেকে আগত চেক পোষ্টে উদ্বাস্তু হিসেবে নথিভুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪১.২৭ লক্ষ।[115] তবে এই উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগ এসেছে ১৯৫০ সালে। ১৯৪৬ সালে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৫৮৬০২জন, ১৯৫০ সালে তা ছিল ১১ লক্ষ ৭২৯০৮জন, এবং ১৯৫৬ সালে উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ৫লক্ষ ১০০০ জন। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কংগ্রেস সরকার 'নেহেরু লিয়াকত' চুক্তির মাধ্যমে সরকার অজুহাত দিল যে ১৯৫০ সালের পর যে উদ্বাস্তুরা এসেছে সরকার তাঁদের ত্রাণের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সরকার তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। মেঘনাদ সাহা এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। এই নতুন নীতি গৃহীত না হলে লিয়াকত আলির সহিত চুক্তি সম্পাদনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তারপরে ব্যাপক আকার ধারণ করত এবং তীব্রতর হত।[116] সরকারের এই সিদ্ধান্ত হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রাণের আওতায় এলো। কিন্তু তাঁরা আর পুনর্বাসন পেল না। সরকার সুকৌশলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার নথিভূক্ত ছিল। এঁদের মধ্য থেকে আবার প্রায় ৩০ হাজার পরিবার পুনর্বাসনের অযোগ্য হয়।

নেহেরু লিয়াকত চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। সমস্যা আরো জটিল হয় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের যে পরিমাণ উদ্বাস্তু আসে তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পরিমাণ জমি ছিল না। জমি সংগ্রহ করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের

---

115 রায়, রণজিৎ, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ: কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* কলকাতা, পৃ. ৯১।

116 বন্দোপাধ্যায়, হিরণময়, *উদ্বাস্তু,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৯৬।

বসবাসের জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হতো। এতে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলার মানুষের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আশা উদ্বাস্তুদের একটি অংশ ফাঁকা জমি দখল করে কলোনি স্থাপন করায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। জমি অধিগ্রহণ করার সরকারের ইচ্ছা না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার কিছু জমি অধিগ্রহণ করে।

বাস্তুচ্যুত কিছু পরিবারকে পরিত্যক্ত বাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুরা কিছু জমি দখল করে এবং সরকার কিছু খাসজমিতে কলোনি স্থাপন করে। উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজস্ব উদ্যোগে কিছু কৃষি ও অকৃষি জমি জবরদখল করে নিয়েছিলেন। যার মধ্যে কৃষি জমি ছিল ৫৩৮২৩ একর এবং অকৃষি জমি ছিল ৬৮৩৩৫ একর।[117] বাস্তুচ্যুত মানুষের এই জবরদখল করা সংখ্যায় অনেকটাই কম ছিল। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু জবরদখল করলেও বেশি সংখ্যক অবহেলিত ছিল। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু সরকারি সাহায্য পেলেও, তবে তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। পশ্চিমবাংলার বামদলগুলো দাবি করেন পাঞ্জাবের তুলনায় কংগ্রেস সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি ন্যায়বিচার করছেন না। প্রচুর ছিন্নমূল মানুষ বামদলগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়। বামপন্থীরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এর জন্য দায়ী করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির বামদলগুলো উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাঁদের আন্দোলন সংগঠিত করে। উদ্বাস্তুদের নিয়ে কলোনি তৈরির জন্য তাঁদের সংগঠিত করেন। উদ্বাস্তুদের নিয়ে তৈরি হয় 'ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল' (ইউ.সি.আর.সি)। বামদলের নেতারাই এর নেতৃত্ব প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে যে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী ছিল তারা এক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। সি.পি.আই-এর নেতারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উত্তরবঙ্গে আর.এস.পি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সি.পি.আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বামনেতাদের নেতৃত্বে কলোনি স্থাপিত হয়। কংগ্রেস সরকারের থেকে কলোনির জবরদখল উচ্ছেদের চেষ্টা হলে বামপন্থীরা তার প্রতিরোধ করত। কলোনির লোকদের নিয়ে তৈরি হয় কলোনি কমিটি। এই কমিটির লোকজন পার্টির নেতাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংযোগকারীর ভূমিকায় থাকত। উদ্বাস্তুদের আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো

---

[117] *Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly*, 21st March, 1951, vol-III, No-2, পৃ.পৃ. ৬৯২-৬৯৩।

বেকার সমস্যা। এই বেকারদের ৮০ শতাংশই ছিল বাঙালি। আবার তাঁদের মধ্যে ৭০ হাজার জন ছিল উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮০ শতাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এঁর বিরাট সংখ্যকই কারিগরিবিদ্যা জানা এবং হস্তশিল্পে দক্ষ।[118] উদ্বাস্তুদের একটি অংশ ছিল যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল্প শিক্ষিত উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি আরো ভয়ানক ছিল। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বামপন্থীদের যোগাযোগ এবং এঁদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলায় কংগ্রেস বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। উদ্বাস্তুদের এই সমস্যার জন্য বামপন্থীরা কংগ্রেসকে দায়ী করতে থাকেন। উদ্বাস্তুদের নেতারা কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। সরকার এই সমস্যা দূর করার জন্য উদ্বাস্তুদের একটি অংশকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করেন। সরকার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করেন। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের অনধিকার উচ্ছেদ আইন প্রয়োগ করে। সংগঠনগুলো এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নবগঠিত ৮০ হাজার বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয় দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।[119] বাঙালি উদ্বাস্তুদের একটি বৃহৎ অংশ দণ্ডকারণ্য যেতে অস্বীকার করেন। পশ্চিমবঙ্গের জবরদখলকারী উদ্বাস্তু শিবির ও কলোনিগুলোর জল, শিক্ষার সুযোগ, খাদ্যের যোগান, সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্যাম্পের মানুষকে বাধ্য করা হয় দণ্ডকারণ্যে যেতে। পশ্চিমবাংলার যে ১৬ হাজার ক্যাম্প রয়েছে তাদের দণ্ডকারণ্য হস্তান্তর করা হয়। কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন যে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে উদ্বাস্তুদের সঠিকভাবে অবহিত না করে তাঁদের অন্ধকারে রেখে এভাবে অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দণ্ডকারণ্য পাঠানো ঠিক নয়। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পাঠানো যাবে না। এই নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী নন। ভালো বসতি ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই শরণার্থীদের বাংলার বাইরে যেতে হবে।

---

118 Chakraborty, Saroj, with Dr BC Roy and other Chief Ministers, পৃ.২৬৭।

119 দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার বিধানসভার একশো বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,* কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৫১।

তবে চটজলদি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যথাযথ পরিকল্পনা না করেই দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আপত্তি করেন বিরোধীরা।[120]

এইদিকে ইউ.সি.আর.সি-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে পরিমাণ জমি আছে তাতেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। উদ্বাস্তু কমিটির তরফে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের দাবি জোরালো হতেই, উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। ক্যাম্পের মহিলাদের উপর অত্যাচার করে। অনেককেই অনশন সত্যাগ্রহ করতে শুরু করেন। সরকারের তরফে দাবি করা হয় যে, যে পরিমাণ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছে তাঁদের সকলকে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া হয়। বাকিদের সরকার অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো এর বিরোধিতা করেন। উদ্বাস্তুদের সংগঠন ইউ.সি.আর.সি এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে পাই-"কুপার্স ক্যাম্প পুলিশী সন্ত্রাস, শতাধিক ব্যক্তি গ্রেফতার, বেপয়োরা তল্লাশি। সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া রানাঘাটে এস.ডি.ও (S.D.O) এর নিকট গণ ডেপুটেশন। শ্রী সুহৃদয় মল্লিক রায়চৌধুরী (এম.এল.এ) এবং নদীয়ার বাস্তহারা পরিষদের নেতৃত্বে এস.ডি.ও.'র (S.D.O) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুলিশ অত্যাচার বন্ধ ও উদ্বাস্তুদের দাবি মানিয়া লইবার দাবি জানান।"[121] এই আন্দোলনের জন্য উদ্বাস্তুদের হস্তান্তরের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বামদলগুলো দাবি করেন যে উদ্বাস্তুদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ না করে কংগ্রেস সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

বামনেতা জ্যোতি বসু দাবি করেন যে উদ্বাস্তুদের অবহিত না করেই সরকার এই ধরনের হঠকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৮ সালে পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্না পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট চালু করেন। এই সার্টিফিকেট পাওয়ার শর্ত ছিল যেকোন ধরণের পুনর্বাসন তাঁরা চান না। ১৯৬০ সালে সরকার ঘোষণা

---

[120] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার বিধানসভার একশো বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,* কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৫২।

[121] *স্বাধীন পত্রিকা,* ৪জুলাই, ১৯৬১।

করেন যে সরকারের পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ। কিছু কাজ বাকি তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ইউ.সি.আর.সি'র পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হয়। ১৯৬১ সালে পুনর্বাসন মন্ত্রী কলকাতায় এলে ইউ.সি.আর.সি'র পক্ষ থেকে বিশাল শোভাযাত্রা স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা মূলক প্রবন্ধ তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা শ্যামল মুখার্জী বলেছেন যে -"সরকারের এই নীতিকে নেতিবাচক মনোভাবের পরিচায়ক বলা যায়। এই নীতির বিরুদ্ধে ইউ.সি.আর.সি সংগঠনের নেতৃত্বে লাগাতার সংগ্রাম চালান।[122]

ইউ.সি.আর.সি'র পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দণ্ডকারণ্যে যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করা হয় তার মান খুবই নগণ্য। জমি নেই, সেচের ব্যবস্থা নেই, বসতি নেই। অস্থায়ী শিবিরের মাধ্যমে কুড়ি হাজার পরিবার দুর্বিষহ জীবন কাটায়। উদ্বাস্তু নেতাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার অবশেষে সুকুমার সেনকে সংস্থার চেয়ারম্যান করে পাঠান। দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু জীবন ছিল খুবই দুর্বিষহ। মানুষের জীবন-জীবিকা চাষবাস ছিল না। শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। চাষের জন্য জল ছিলো না। মানুষের খাবার পানীয় জল ছিল না। কিছু অঞ্চল ছিল অরণ্য সংকুল। যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থায় ছিল না। বন্য প্রাণীর আক্রমণের সামনে মানুষকে লড়াই করে বাঁচতে হত।

দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন সময় ডেভলপমেন্ট বোর্ডের যে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়, তাঁদের মধ্যে সুকুমার সেনের সময় অবস্থা খানিকটা উন্নতি হয়। কিন্তু বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার দরুণ পুনর্বাসন ব্যবস্থায় খারাপ অবস্থাতেই থেকেই যায়। শরণার্থীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে সুকুমার সেন ছাড়া বাকিদের সময় তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৫৮ সালে ডেভলপমেন্ট এর জন্য ২৫ টি ওয়ার্কার্স পার্টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আঞ্চলিক গুদাম, পাঁচটি কনজ্যুমার গুদাম তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে শ্রমিকের প্রতিকূলতার অভাবে তা তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।[123] উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজের গতি অনেকটাই হ্রাস পায়। এরমধ্যে কংগ্রেস সরকার ক্যাম্পবাসীদের উপর পুলিশি অত্যাচার শুরু করে। বিভিন্ন জেলাতে তৈরি হয় বাস্তুহারা কমিটি। এই বাস্তুহারা কমিটির পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে উদ্বাস্তুদের উপর অত্যাচারের কথা জানানো

---

[122] Roy, Sanjay K. (ed.), *Refugees and Human Rights*, Calcutta, 2001, পৃ. ১৩৮।

[123] *আনন্দবাজার*, ১৯জুলাই, ১৯৫৯।

হয়। সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দণ্ডকারণ্যে উন্নয়নের কাজ ভালই হচ্ছে। তাই বাকি ক্যাম্পাসকে অতি শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুরা মিছিল-মিটিং এবং প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুরা আন্দামানে যাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু সরকার উদ্বাস্তুদের এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে বিভিন্ন ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের উঠে যাওয়ার জন্য লাঠিচার্জ করে উঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার কোথাও গুলিবর্ষণ করে। ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করেন যে পুনর্বাসন দপ্তর তুলে দেওয়া হবে। বাম বিরোধী দলগুলো দাবি করেন সুকুমার সেনের আমলে কিছু উদ্বাস্তু কৃষক চাষের জমি পেয়েছে। পরবর্তী কালে আর কোনো উন্নতি হয়নি। ফলে পুনর্বাসন দপ্তর বন্ধ হলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটে এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি হয়। বামদলগুলোর উদ্বাস্তু আন্দোলন তাঁদের গণভিত্তি তৈরি হয়েছিল। বামদলগুলোর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কলোনি তৈরি হয়। এই সময় সরকারি কলোনির সংখ্যা সর্বসাকুল্যে মাত্র ১০৮টি। অন্যদিকে জবর দখলই-কৃষি কলোনির সংখ্যা ৩৫০ এবং ষাটের দশকে এই কলোনিগুলির পতন হয়েছিল।[124] কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলাতে কলোনি তৈরি হয়। কলোনির লোকদের নিয়ে তৈরি হয় কলোনি কমিটি। এই কমিটির নেতারা ছিলেন ইউ.সি.আর.সি এর সদস্য। লোকদের নিয়ে এই কমিটি থেকে বাম শ্রেণীভিত্তিক নেতা তৈরি হয়। এই কমিটির নেতারা পরবর্তী কালে জেলাস্তরের আন্দোলনকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। জবর দখলকারী প্রতিরোধ তৈরি হয়- নারী বাহিনী, যুব বাহিনী, এরাই পুলিশের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উদ্বাস্তুদের জবরদখল শুধুমাত্র শহর কিংবা শহরতলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুরা পতিত জমি দখল করে। ২৪ পরগনায়, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদিয়া, মালদহ, জলপাইগুড়িতে অনাবাদি কৃষি জমি দখল করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদিয়া, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি

---

[124] সিংহ, অনিল, *পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী সমস্যা,* পৃ. ৪৯।

জেলায় প্রায় ৩৫০জন উদ্বাস্তু কৃষিজীবী কলোনির পত্তন করেছিলেন।[125] ১৯৬২ সালে নেতাজি নগরে ইউ. সি .আর .সি এর সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউ.সি.আর.সি সাধারণ সম্পাদক সমর মুখার্জি এর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে উদ্বাস্তুদের জন্য কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়।

বামদলগুলো সারাদেশের উদ্বাস্তুদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন পুনর্বাসনপ্রাপ্ত স্থানে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংগঠন তৈরি করেন। বামদলগুলোর থেকে উদ্বাস্তুদের আশ্বস্ত করা হয় যে ক্ষমতায় এলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। উদ্বাস্তুরা কংগ্রেস বিরোধী গণসংগ্রামে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে বামদলের বিভিন্ন নেতারা দণ্ডকারণ্যে যান এবং উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে এসে বামদলগুলোকে ভোটে জেতানোর আহ্বান জানান। ভোটে জয়ী হলে বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়। বামপন্থীদলগুলো উদ্বাস্তুদের দ্বারা বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বাম বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেই অনেক শিক্ষিত, বহু শিল্পী, সাহিত্য বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেন। এই যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বামপন্থী আদর্শ ও মতাদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের শিল্পকলার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ জানায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় এই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিষয়ে মুখর হয়। এই বুদ্ধিজীবী মানুষেরা একপ্রকার কংগ্রেস সরকারের নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। পশ্চিমবাংলার যে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তার রাজনৈতিককরণ হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পর্ব শুরু হয়।

সরকার যেভাবে বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে তা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর নাট্য আইন চালু করা হলো গণনাট্যের মত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক

[125] ঘোষ, চন্দন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *চেতনা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,* পৃ.পৃ.১৪৪-১৪৫।

আন্দোলনের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে।[126] প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হয়। প্রগতিশীল গণনাট্য সংঘ সব পেরিয়ে দেশ, যুদ্ধ চাইনা, পদধ্বনি নাটকগুলো প্রযোজনা করেন। কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে জমিদারদের পক্ষে ছিলেন। ১৯৫৩ সালে গণনাট্য সংঘ আয়োজিত ৫৯টি নাটক ও অনন্য কপি পুলিশ কমিশনার পরীক্ষা করে প্রায় সবকটি অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেয়। মণিকুন্তলা সেন এর বিধানসভায় এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তার শিকার করেন।[127] বাংলার বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক সংঘগুলো জমিদার অত্যাচার বিরোধী নাটক প্রদর্শন করতেন। প্রশাসন গণনাট্য অনেক নাটক প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রাজবন্দীদের পরিবারের সাহায্যের জন্য এক গণনাট্য ও গণসঙ্গীত আয়োজন করেন।

১৯৬৫ সালে ভারত রক্ষা আইনে নাট্যশিল্পী উৎপল দত্ত কে আটক করা হয় এবং প্রেসিডেন্সি জেলে আটক রাখা হয়। উৎপল দত্ত সহ সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিক মুক্তির দাবিতে ১৯৬৫ সালের ২৬শে অক্টোবর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।[128] সরকার বামপন্থী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে সরকার পক্ষের নাট্যদল গঠন করেন। লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে সরকারপক্ষের অনেক নাটক প্রচার করা হয়। লোকরঞ্জন শাখার প্রধান ছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। যিনি ডক্টর রায়ের খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সাহায্যে সরকার তাঁর কাজের ও উন্নয়নের প্রচার কার্য সম্পন্ন করেন। সরকারিভাবে এই কংগ্রেসী সংস্কৃতি প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় লোকরঞ্জন শাখাকে।[129] পশ্চিমবঙ্গের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার ছিল মথুরায়। তিনি মনে করেন যে সরকারের ভাবমূর্তি ঠিক রাখার জন্য জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের সকল বুদ্ধিজীবী সাহিত্য ও শিল্পীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসেবে পঙ্কজ মল্লিক ডক্টর রায়ের পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন যে ডক্টর রায় চান যে শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতজ্ঞ নিজে নিজে ক্ষমতায় এগিয়ে এসে জনসাধারণকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্ভুদ্ধ করুক। অন্যদিকে বাম ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীগণ জনসাধারণের

---

[126] চৌধুরী, দর্শন, *গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, অনুষ্টুপ ত্রৈমাসিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা,* ১৩৮৮।

[127] *West Bengal Assembly Proceedings, 10th November, 1953*, WBLAL.

[128] ঘোষ, চন্দন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *চেতনা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,* কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৮৭।

[129] চৌধুরী, দর্শন, *গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, অনুষ্টুপ ত্রৈমাসিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা,* ১৩৮৮।

বাস্তব সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গান, নাটক, কবিতা রচনা করেন এবং তার প্রচার করেন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এক্ষেত্রে বামপন্থী সংস্কৃতি ও গণনাট্য বিরোধিতা করেছিলেন নিজের শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই এবং সেই জন্যই তিনি বামপন্থী সংস্কৃতির পাল্টা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেন এবং লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে তার রূপ দিতে সচেষ্ট হন।[130]

সরকার এই বামসংস্কৃতির ধারা রক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির প্রচারের উপর জোর দেয়। যে প্রচারের মাধ্যমে জনগণ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। ডক্টর রায় লোকরঞ্জন শাখাতেই এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের দায়িত্ব ভার দেন। ধীরে ধীরে লোকরঞ্জন হয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মোকাবিলার হাতিয়ার। বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক ধারার প্রভাব রক্ষার জন্য ডক্টর রায় সুকৌশলে সাংস্কৃতিক বিভাজন তৈরি করেন। সাংস্কৃতিক জগৎ ও বুদ্ধিজীবীগণ জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শিবিরে বিবেচিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে বাম সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন

বাংলার সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেস সাধারণত জমিদার শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হতো। শ্রমিকদের কিংবা প্রান্তিক মানুষের স্থান ছিল না বললেই চলে। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বাংলার শ্রমিক ও কৃষকদের বামপন্থীদের প্রতি ঝোঁক তৈরি করেছিল। বামেদের লাগাতার আন্দোলনে সবাইকে শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নতুন রাজনৈতিক লক্ষণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর লাগাতার সংগ্রাম এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।[131]

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর হাজার হাজার কর্মচারী পূর্ব বাংলা থেকে এদেশে চলে আসে। কর্মসংস্থান বাসস্থান নিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। কর্মচারীদের মধ্যে ছাঁটাইয়ের ঝুঁকি তৈরি হয়। সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি হয় সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। ছাঁটাই বিরোধী যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সময় ২০টি কর্মচারী সমিতিকে নিয়ে গড়ে

---

[130] মল্লিক, পঙ্কজকুমার, *আমার যুগ আমার গান,* কলকাতা, ১৯৮০,পৃ. ১৪৩।

[131] বিশ্বাস, অনিল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খন্ড,* এন. বি. এ., কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯৯।

উঠলো সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন।[132] সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে সরকারি কর্মচারীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্ট এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন দু'দিন ব্যাপী কনভেনশনের আয়োজন করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কারখানার সামনে শ্রমিক সংগঠনগুলো বিক্ষোভ দেখান।

১৯৫১সালের ১৬ই মার্চ বিড়লা হিন্দমোটর ওয়ার্কার এর সামনে শ্রমিকরা সত্যাগ্রহ পালন করলে, পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করেন এবং গুলিচালায়। পুলিশের গুলিতে দুজন মারা যায় এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। সরকার আন্দোলনের প্রতিরোধে ১৪৪ ধারা জারি করে। এই সময়ে বিভিন্ন কারখানার কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়। বিভিন্ন কারখানার সামনে বিক্ষোভ দেখালে মালিকের নির্দেশে বাম শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেন বাম শ্রমিক সংগঠনগুলো মিলে তৈরি করেন সম্মিলিত ছাঁটাই ও বেকারি কমিটি। ১৩ই মার্চ ১৯৫৩ দিনটি ছাঁটাই অভিযান বিরোধী দিবস পালন করা হয়। শ্রমিক আন্দোলন শুধু কলকাতায় নয় উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিড়ি শ্রমিকরা আন্দোলন সংঘটিত করলে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। ১৯৫৬ সালের ১৭ই অক্টোবর রানীগঞ্জ অঞ্চলের ২৬টি কোলিয়ারির ৫০ হাজার শ্রমিক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট শুরু করেছিল। ১৯৫৭ সালের ৯ডিসেম্বর ১০হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই বন্ধ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে ডুয়ার্স অঞ্চল শ্রমিক আন্দোলনে হাজার হাজার শ্রমিক যোগ দেয়। ফলতা ও কলকাতায় পুলিশ অত্যাচার বাড়তে শুরু করে। ১৯৬০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আমতা বেঙ্গল এনামেল কারখানায় মালিকপক্ষ অন্যায় ভাবে লক আউট ঘোষণা করে। ৩০শে মে কারখানায় দেড়শ শ্রমিক ও স্থানীয় নাগরিকদের এক সভায় দাবি করা হয় যে, অবিলম্বে লকআউট প্রত্যাহার করতে হবে। এই সভায় মালিক পক্ষ ও পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে ফলে বহু শ্রমিক আহত হয় এবং সাত জনকে গ্রেপ্তার করে।[133] সরকারি

---

[132] ঘোষ, চন্দন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *চেতনা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,* কলকাতা, ২০০০,পৃ. ১৩৬।

[133] বসু, জ্যোতি, 'পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী আন্দোলন', দে, শ্রীকৃষ্ণ (সম্পা) *অতিথি, ৩২বর্ষ,* কলকাতা, ১৯৯৯।

কর্মসংগঠনের প্রতিষ্ঠিত সমিতি যৌথভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ডেপুটেশন দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ২৫টি সমিতির সমন্বয় কমিটি প্রদত্ত স্মারক লিপিটি ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের হাতে দেয়।[134] ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা। সরকার পুলিশ মিলিটারি যৌথ উদ্যোগে ২০হাজার কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেন। ১৫জনকে বরখাস্ত করেন এবং ১০ হাজার জনকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। শ্রমিক মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারী বেশি সংখ্যক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন রোজগারের দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব বাম গণতান্ত্রিক ভাবধারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণী চেতনাকে সুদৃঢ় করতে থাকে। শ্রমিক ও কর্মচারী শ্রেণীর এই সর্বোত্তম লড়াই জনগণের মনোবলকে সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ করে। সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাত্মক রাজনৈতিক সংগ্রাম জনসাধারণের মনোভাবকে রূপায়িত ও পরিচালিত করার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।[135] পশ্চিমবঙ্গের সরকার শ্রমিক আন্দোলন বা ধর্মঘট ডাকলে সর্বদা মালিকপক্ষের হয়ে শ্রমিকের উপর অত্যাচার চালাত। ফলে সচেতনভাবেই দুটি পক্ষের সৃষ্টি হয় একটি হলো মালিক পক্ষ, যাঁর সঙ্গে রয়েছে সরকার ও পুলিশ এবং অন্যদিকে শ্রমিক ও কর্মচারী যাঁদের হয়ে লড়াই করে বাংলার বামদলগুলো। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। শ্রমিক ও শিল্প অঞ্চলগুলিতে জাতীয় কংগ্রেসের জনভিত্তি হারায়। শিল্প অঞ্চলের বেশিরভাগ আসনেই বামদলগুলো জয়লাভ করে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে শিল্পাঞ্চলগুলিতে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহাকুমার শিল্পাঞ্চলের ৮টি আসনের মধ্যে ৭টি অধিকার করে বিরোধীরা। যেখানে ১৯৫২ সালে কংগ্রেস একাই এখানে দখল করেছিল ৭টি আসন ।

[134] বিশ্বাস, অনিল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খন্ড,* এন. বি.এ. কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৬।

[135] বিশ্বাস, অনিল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খন্ড,* এন. বি.এ. কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৫৫।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কৃষি আন্দোলন

'আঁধি নয় তেভাগা চাই' বাংলার কৃষক আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল এটাই। অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি, নদীয়া বর্গাদার জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তেভাগাকে সামনে রেখে পরবর্তী সময়ে বাংলায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। তেভাগা আন্দোলন ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ বড় কৃষক আন্দোলন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাজন এর পরেও বিভিন্ন এলাকায় তেভাগার দাবিতে লড়াই চলতে থাকে।[136] কাকদ্বীপ কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় বামদলগুলো। এঁদের মধ্যে চন্দন পিড়ি আন্দোলনে কৃষকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কাকদ্বীপ থানার দারোগা বাবু ৪৫জন পুলিশ নিয়ে চন্দন পিড়ি গেলে কৃষকরা হাতের হাতিয়ার নিয়ে তাদের ঘিরে ধরে। অবশেষে পুলিশ বাহিনী ক্ষমা চেয়ে স্থান ত্যাগ করে। পুলিশের এই নতিস্বীকার বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এতে বাংলার কৃষক আরো সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যেখানে পুলিশ ও জমিদার বাহিনী অত্যাচার করত। কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করত। গ্রাম বাংলার ভাগচাষী কিংবা ছোট চাষিরা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত। এই ধরনের টাকা দিয়ে তাঁরা চাষের বলদ, সার ক্রয় করত। ঋণের টাকা শোধ দিতে না পারলে কৃষক রমণীদের উপর অত্যাচার চলত। বামপন্থীরা এই ভাগচাষীদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে।

১৯৫২ সালে মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম ভাগচাষীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে বর্গাদার আইনের সঠিক প্রয়োগের দাবি জানানো হয়। জমিদাররা এই বর্গাদার আইন যাতে প্রয়োগ করতে না পারে তার চেষ্টা চালায়। ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক কৃষকসভা সেচকর বৃদ্ধি ও জমি জরিপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫৫ সালে কাকদ্বীপে ভাত খাস বোর্ডে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে কৃষক সমাবেশকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৯৫৫ সালে বাংলার হাজার হাজার কৃষক ভূমি সংস্কারের

---

[136] চট্টোপাধ্যায়, কুনাল, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১।

সংশোধনের জন্য কলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে জমায়েত করেন। ১৯৫৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার বিলের ভূমিসংস্কার সংশোধনী দাবি করে ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলা থেকে কৃষক সভার নেতৃত্বে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কলকাতায় বেলা তিনটায় মনুমেন্ট পাদদেশে জমায়েত হন।[137] ১৯৫৮ সালের ২৩শে জুন কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি এলাকার এক ঋণ প্রার্থীর উপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায়। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক বীরেন দে সরকার, রেবতী ভট্টাচার্য সহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার জোতদারা অত্যাচার শুরু করে। অনেক মহিলাকে জোরদারদের বাড়িতে আটকে রাখা হয়।

১৯৬০ সালে ২৪ পরগনা জেলার কৃষক সমিতির এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গ্রামের কৃষক ও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করা হয়। ১৯৬০ এর ৬ই নভেম্বর হাওড়া জেলার আমতা বাজারে ভূমিসংস্কারের দাবিতে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশের মাধ্যমে ভূমিহীন ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বিরোধী ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষিদের মধ্যে জমি বন্টনের দাবি জানানো হয়। বেনামী জমি উদ্ধারে সরকার আগ্রহ না দেখানোয় জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেল। বহু ভূমিহীন ভাগচাষী খেতমজুরের ফলে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হল।[138] পশ্চিমবঙ্গের জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ উদ্বৃত্ত জমি সাধারণ কৃষকের মধ্যে বন্টনের কথা বলা হয় ।

পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির বেশিরভাগ ছিল জমিদারদের হাতে। এই জমি সরকার অধিগ্রহণ করে তা ভূমিহীণদের মধ্যে বন্টনের দাবিকে জোরালো করার জন্য সকল জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান করা হয়। সাধারণ মানুষ ভূমিহীন খেতমজুর এই আহ্বানের উদ্বুদ্ধ হয় এবং বাম দলগুলোর নেতৃত্বে হাজার হাজার গরিব মানুষ যোগদান করেন। বিভিন্ন জায়গায় যখন কৃষকরা আন্দোলন করে তখন পুলিশ তাঁদের উপর অত্যাচার শুরু করে। কাকদ্বীপ, মথুরাপুর, দুর্গাপুর, ২৪ পরগনা পুলিশ সাধারণ কৃষকদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বাম দলের কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার জানান যে, সরকার যতই পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করুক

---

137 ঘোষ, চন্দন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *চেতনা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,* কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১১৪।

138 বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত, *জমিদারি প্রথার অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪,পৃ. ২।

তাঁদের ফলানো ধান রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কৃষকদের রমণীরা ধান প্রতিরোধে এগিয়ে এলে জমিদার বাহিনী ও পুলিশ মহিলা উপর অত্যাচার করে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক রমণীরা, কৃষকরা নাগরিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নাগরিক অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে আবার তাঁদের যোগ্য ভূমিকার প্রমাণ দিয়েছেন।[139]

বামফ্রন্ট সরকারের আধিপত্যের দশক

১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসের পরাজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৪২টি আসনের মধ্যে সি.পি.আই.(এম) ১৭, জনতাদল ১৫, কংগ্রেস ৩, এবং বাম অন্যান্য শরিকদলগুলো ৭টি আসনে জয় লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে সি.পি.আই. (এম)র তরফে বিভিন্নদলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডঃ প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন শেষ পর্যন্ত বাম নেতারা ৫৫ % আসনে জনতা পার্টির প্রার্থীকে মেনে নিতে সম্মত হন। কিন্তু প্রফুল্ল সেনের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আসন সমঝোতা বাস্তবায়িত হলো না। অন্যান্য বামদলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭৭ এর বিধানসভা নির্বাচনে জনতাদলকে মাত্র ২৯টি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দীর্ঘ বাম লড়াইয়ের পর সত্তরের দশকে পশ্চিমবাংলার বামদলগুলো তাদের নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে।[140] কিন্তু রস মল্লিকের মত গবেষক মনে করেন বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি কোন সংস্কার নয়, অগ্রগতির নিশানা এতে নেই; দলীয় আধিপত্য বজায় রাখাই ছিল কর্মসূচিগুলির উদ্দেশ্য।[141]

বামেদের দীর্ঘ লড়াই পরে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতি থেকে অস্থিরতা ও অশান্ত দশকের অবসান হয়। ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ব্যাপক জয়লাভ করে। ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসু দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয় লাভ করেন এবং

---

[139] চন্দ্র, প্রতাপ, *স্মৃতির অলিন্দে,* কলকাতা, ২০০৩, পৃ.২৩।

[140] দত্ত, সত্যব্রত, প্র*বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত,* প্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৯৫।

[141] Mallick, Ross, Development Policy of a Communist Government: West Bengal since, 1977, পৃ. পৃ. ১১৮-১১৯।

বামদলগুলোর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। বামফ্রন্ট এই নির্বাচনে জয়লাভ করে তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে। তবে বামদলগুলোর মধ্যে সি.পি.আই.(এম) এর প্রভাব আধিপত্য বেশি থাকায় শরিকদলগুলোর সাথে তাঁদের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বামফ্রন্টের শরিকদলগুলো মরিচঝাঁপি ও উদ্বাস্তু উৎখাত নিয়ে সি.পি.আই.(এম)কে দায়ী করতে থাকে। শরিকদলগুলো সি.পি.আই.(এম)র কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করে।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়া, বিজন সেতুতে ১৭জন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে হত্যা ঘটনার জন্য সরাসরি সি.পি.আই(.এম)কে দায়ী করা হয়। বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলগুলো সি.পি.আই.(এম)র একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে বাঁচাতে এবং নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য এইভাবে অনেক আভ্যন্তরীণ কৌশল অবলম্বন করে। সি.পি.আই.(এম)র উপর শরিকদলগুলোর আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে রাজনৈতিক হিংসা দমন-পীড়ন ও নৈরাজ্যের পরিস্থিতির অবসান হয়। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনে সুস্থিরতা ফিরে আসে অরাজকতা ও নৈরাজ্য দূরীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যা ছিল সম্পূর্ণ বাম রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে ধীরে ধীরে বাম নিয়ন্ত্রিত দলীয় আধিপত্য গড়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। কংগ্রেস ও বামেদের অন্যান্য শরিক দলগুলোর সি.পি.আই.(এম)র কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়।

১৯৮২ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের আসনসংখ্যা বেড়ে হয় ৫৩ এবং প্রাপ্ত ভোট ১২% বৃদ্ধি পায়।[142] ইতিমধ্যে এই নির্বাচনে সি .পি .আই, ডি.এস.পি, ডাবলু.বি.এস.পি, বামফ্রন্টে যুক্ত হওয়ায় ফ্রন্টের সম্প্রসারণ আরো বৃদ্ধি পায়। দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনীতিতে কংগ্রেস শহরাঞ্চলে সাফল্য লাভ করেন। অন্যদিকে বামফ্রন্ট গ্রামীণ রাজনীতিতে নিজেদের দলীয় সংগঠন বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে গণশক্তি সম্প্রসারিত করেন। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের শতাংশ ৪১.৮০% হলেও আসন সংখ্যা কমে যায়।[143] অন্যদিকে বামদলগুলোর আসন বৃদ্ধি পেয়ে ২৫১টি হয়। বামফ্রন্ট পায় মোট ভোটের প্রায় ৫৩%। কিন্তু ১৯৮৭ সালে লোকসভা

---

[142] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৯৫।

[143] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৯৫

নির্বাচনে কংগ্রেস ১৬টি আসনে জয়লাভ করলেও বিধানসভাতে আশানুরূপ ভালো ফলাফল করতে পারেনি।

পশ্চিমবাংলার বামদলগুলো পূর্ব বাংলা থেকে আগত সারা দেশের উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রচার করেন যে তারা ক্ষমতায় এলে তাঁদের পুনর্বাসন দেবে। ১৯৮৭ সালে প্রায় ১.৫লক্ষ উদ্বাস্তু বসতি স্থাপনের জন্য সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে একত্রিত হয়। মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মরিচঝাঁপিকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রথম দিকে ৩৬জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছে বলে বিধানসভায় বিরোধীরা দাবি করেন।[144] কিন্তু সরকার দাবি করেন যে পুলিশের গুলিতে মাত্র দুজন আদিবাসী মহিলা মারা যান। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তবে কেবলমাত্র বিরোধীরা নয়, বামফ্রন্টের অনেক শরিকদলও এর বিরোধিতা করেন। জনতাদলের নেতা শ্রীকান্ত দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলিচালানোর এবং শত শত নারী নিহত হওয়ার ঘটনা বিধানসভায় বর্ণনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই ঘটনার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। দণ্ডকারণ্য থেকে যে উদ্বাস্তুরা এসেছিল তাঁর অধিকাংশ ছিল নমঃশূদ্র। যারা সুন্দরবনের সমুদ্র তীরবর্তী স্থানের সঙ্গে পেশা ও মানসিকতায় সম্পূর্ণ মানানসই ছিল। ১৯৭০ সালে সতীশচন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে গঠিত হয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি।[145] ১৯৭৪ সালে সমিতির নেতারা মরিচঝাঁপি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। ১৯৭৫ সালে হাজার হাজার উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে এলে খড়গপুর স্টেশন থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় বামপন্থীরা মনে করেন করেন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব। এমনকি সুন্দরবন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হলে বামপন্থী উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো মনে করেন। কিন্তু ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বিশেষজ্ঞ কমিটি জানায় যে সুন্দরবন পুনর্বাসনের উপযুক্ত নয়। এতে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো বামেদের কাছাকাছি আসে এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগেই মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রাম চ্যাটার্জী শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেয়। বামসরকার ক্ষমতায়

---

[144] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৯৯।

[145] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২০১।

আসার পর রাম চ্যাটার্জী সক্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্যের এক জনসভায় দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের এই দুর্বিষহ জীবনের জন্য কংগ্রেস সরকারকে সরাসরি দায়ী করা হয়। এই সভামঞ্চে বাম সমর্থিত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশ চন্দ্র মন্ডল উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন অঞ্চলে দিকে রওনা দিতে ও বসতি স্থাপনের আহ্বান জানান।

প্রথমদিকে দণ্ডকারণ্য থেকে শরণার্থী আগমনের কিভাবে প্রতিরোধ করা হবে বামফ্রন্ট সরকারের তেমন কোন পরিকল্পনায় ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এক সর্বদলীয় প্রতিনিধি দণ্ডকারণ্য যায়। প্রতিনিধিদলের ১০জন সদস্য ছিল। সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা এক বিবৃতিতে জানান যে প্রতিনিধি দল ৮টি সভা করেন। প্রতিনিধি দলের তরফে শরণার্থীদের জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সমস্যার নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্য থেকে প্রচুর শরণার্থী সুন্দরবন অঞ্চলের হাসনাবাদে হাজির হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ তাঁদের রিলিফ বিতরণ করা হয়।

বামফ্রন্ট সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে সুন্দরবন অঞ্চলে নতুন করে বসতি স্থাপন করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। এরমধ্যে অধিকাংশ উদ্বাস্তু নদী পেরিয়ে মরিচঝাঁপিতে প্রবেশ করে। প্রায় ৩২ হাজারের মতো উদ্বাস্তু সতীশ চন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির ছত্রছায়ায় মরিচঝাঁপি রয়ে যায়।[146] একইসাথে তাঁরা সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেন। সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক অবরোধ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উদ্বাস্তুরা পাল্টা পুলিশ ঢোকার পথে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে অনাহার, অপুষ্টি ও চিকিৎসা অভাবে অনেক উদ্বাস্তু মারা যায়। রস মল্লিকের মতে ৪১২৮টি পরিযায়ী পরিবারের প্রায় ১৭০০ মানুষ যাত্রাপথেই অনাহারে মারা যায়।[147] কাশিপুর, কুমিরমারি ও মরিচঝাঁপি পুলিশেরগুলিতে কয়েকশো পুরুষ মহিলা ও শিশু মারা যায়। মরিচঝাঁপি গুলিচালানোর ঘটনায় বামফ্রন্ট সরকারের উপর বুদ্ধিজীবীরা মর্মাহত হয় এবং এর প্রতিবাদ

---

[146] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২০৪।

[147] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতি ইতিবৃত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২০৪।

জানায়। জনতা ও কংগ্রেসদলের নেতারা উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশি অত্যাচার নির্বিচারে গুলি ও কয়েক শত মানুষের মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী করেন। ১৯৮৭ সালের বিধানসভায় বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করলেও তাদের জনশক্তি কমে যায়। ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি.পি.আই.(এম) ১৮৮টি এবং বামফ্রন্ট ২৪৯টি আসন পায়। এই নির্বাচনে সি.পি.আই(.এম) ৩৯.৪৮ শতাংশ ভোট এবং বামফ্রন্ট ৫২.৯৫ %ভোট পায়। ১৯৯১, ১৯৯৬, ও ২০০১ সালে সি.পি.আই.(এম) ১৮৭,১৫৬,১৪৩ আসন পায়। এই নির্বাচনগুলোতে সি.পি.আই.(এম) কংগ্রেসের থেকে কম শতাংশ ভোট পেয়েও আসন সংখ্যা কংগ্রেসের সি.পি.আই.(এম)র থেকে অনেকটাই কম ছিল। তবে ২০০১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান ঘটে। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৬০টি আসন লাভ করে। কংগ্রেসের গরিষ্ঠ অংশ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৩০.৬০ শতাংশ ভোট পায়।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর পদত্যাগ, ভবানীপুর প্রোমোটার প্রদীপ কুন্দলিয়া নির্মিত বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়া, বানতল ইউনিসেফের কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও অভিযান এবং পুলিশের গুলিতে ১৩জনের মৃত্যুর ঘটনা বামফ্রন্ট সরকারকে চাপে ফেলে দেয়। এই ঘটনাগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের মত বিরোধী শক্তির গণভিত্তি তৈরি করে। এছাড়া বামফ্রন্ট সরকারের জমি নীতি, শিল্পনীতি, জ্যোতি বসুর অবসর গ্রহণ ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসিন বঙ্গ রাজনীতিকে আন্দোলিত করে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে খুবই চাপে ফেলে দেয়। আশির দশক মাঝামাঝি সময় এই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়। গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়। পশ্চিমবঙ্গের বামসরকার প্রথম থেকেই গোর্খাল্যান্ড পৃথক রাজ্য গঠনের বিরোধী ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন চলাকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দার্জিলিং শহরে জনসভা করে ঘোষণা করেন যে তিনি বঙ্গভঙ্গ হতে দেবেন না।

১৯৮৮ সালে ২২শে আগস্ট কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং এবং জি.এম.এল. নেতা সুবাস ঘিসিং এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় দার্জিলিং হিলকাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হয়। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদল থেকে রাজীব গান্ধী ও জ্যোতি বসু এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো হয়। ষষ্ঠ

তপশিল সংশোধিত না হওয়ায় দীর্ঘদিন সুবাস ঘিসিং তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসক হিসাবে থেকে যান। সুবাস ঘিসিং এর সহকর্মী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন করে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের আন্দোলন শুরু করেন। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের রাজ্যের আন্দোলন শুরু করলে পাহাড় পুনরায় অশান্ত হয়ে ওঠে।

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুব কংগ্রেসের ডাকে রাইটার্স অভিযান শুরু হয়। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ সমাবেশের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ১৩জন যুব কংগ্রেস সমর্থক মারা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হয়। বাংলা রাজনীতিতে এক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। এছাড়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন বাম সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে এক ধরনের জনমোহিনী রাজনীতির উত্থান ঘটে। বামপন্থীদলগুলোর শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে ২০১১ সালে বামপন্থীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটে।

পর্যবেক্ষণ

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। স্বাধীন ভারতের শাসক হিসেবে কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বাংলায় শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তোলেন। খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বিরোধী আন্দোলন, সংযুক্ত বাংলা আন্দোলন, কৃষি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ও মধ্যবিত্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। অপরদিকে কংগ্রেসের অন্তর্কলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতির কারণে কংগ্রেসের অবক্ষয় হতে শুরু হয়।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে জমিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা বামপন্থীদের সংগঠন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জমিদারি বিরোধী আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদলের পথকে সুদৃঢ় করে। জমিদার, জোরদার, খাজনা ভোগী, ভদ্রলোকদের মূল রাজনৈতিক দল ছিল কংগ্রেস। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে জমিদার, জোরদার এবং

ভাগচাষীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে প্রান্তিক চাষীদের, উদ্বাস্তুদের মধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার বিরোধী বহুমুখী গণআন্দোলনগুলি শক্তিতে, সামর্থে এবং তত্ত্বগত ভিত্তিতে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলি একদিকে যেমন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে, অপরদিকে এই বহুমুখী গণআন্দোলনগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় অন্যদিকে বাম গণভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতা উত্তর দেশের মানুষের তথা রাজ্যের মানুষের চাহিদার সঙ্গে সরকারি নীতির সামঞ্জস্যের অভাবে বিরোধী শক্তি হিসেবে বামপন্থীদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ যে কলকারখানায় কিংবা কৃষিক্ষেত্রে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ ও গ্রামের সাধারণ কৃষকের স্বার্থবিরোধী সেটা বামপন্থীরা প্রমাণ করার চেষ্টায় তাত্ত্বিক বা বুদ্ধিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। একইসঙ্গে বামপন্থীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশকে বামপন্থী রাজনীতির কাছে টেনে নিয়ে এসেছিল। ফলস্বরূপ, ১৯৬৭ সালের বামপন্থীদের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং তাঁরা ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৭ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বামপন্থী রাজনৈতিকদলগুলো ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃদ্ধি পেতে শুরু হয় ও বামপন্থীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটে। সার্বিকভাবে তাই বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য যে শ্রেণীভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে ।

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতির কৌশল: জাতপাত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরণ

সাম্প্রতিক ভারতে যে বিষয়গুলো সবথেকে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা হলো- জাতপাত রাজনীতি, জাতপাত রাজনীতি সংক্রান্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশল, জাতপাত রাজনীতির সক্রিয়তা বৃদ্ধি, সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং জাতপাত নেতাঁদের উত্থান। জাতপাত ব্যবস্থা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। ১৯৭০ এর দশকে 'দলিত প্যান্থার আন্দোলন' ভারতের রাজনীতিকে অন্যমাত্রা প্রদান করে। বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। বিশেষকরে ভারতের উত্তরপ্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। উনিশ-শতকের সাতের দশকে জাতপাত ও অনগ্রসর শ্রেণীগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন ও মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার সিদ্ধান্তে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে সারা দেশজুড়ে যেরকম আলোড়ন গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতীয় বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বাম রাজনৈতিক দলগুলো সমান্তরাল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের বামদলগুলো জাতপাত রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিল তা আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতপাত রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বামদলগুলোর মধ্যে যে বহুকৌণিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে তা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতপাতকে তাঁদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস জাতপাতকে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে বামদলগুলো কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার জন্য জাতপাতের রাজনীতিকে বিভিন্ন কৌশলে ব্যবহার করেছেন। বাম শাসনকালে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত রাজনীতির উত্তরণ না ঘটলেও গ্রামীণ সামাজিক জীবনে জাতপাতের প্রথা ছিল। বাম বুদ্ধিজীবীগণ পশ্চিমবঙ্গের

জাতপাতকে নিজেদের স্বার্থে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জাতপাত ব্যবস্থাকে সরাসরি ব্যবহার না করলেও জাতপাতকে শ্রেণী কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জাতপাতের নেতাগণ পার্টির নির্দেশ বামতাদর্শকে প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ক্ষমতায়নে জাতপাতের নেতাদের প্রাধান্য খুব যৎসামান্যই ছিল। জাতপাতের নেতাঁরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শ্রেণীর কৌশলে 'দলদাস' ও 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে কাজ করেছেন।ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবস্থান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক ঐতিহ্য, জাতপাত, এবং জাতপাত রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দীর্ঘ বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে 'এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির' এবং সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর সংসদীয় গণতান্ত্রিক পরিসরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক ধরনের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী উত্তরণ, বামপন্থীদের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। বাঙালির ভদ্রলোক এই রাজনীতিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বহু গণআন্দোলনের মধ্যদিয়ে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। যা বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ, জাতপাত নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে উত্তরণ ঘটিয়েছে। গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বামপন্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনে কীভাবে জাতপাতের রাজনীতির মিশেল ঘটেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বামপন্থীদের বাম উদারমনস্ক যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে বামপন্থীরা বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। এই অধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে বামপন্থীরা কীভাবে শ্রেণীভিত্তিক 'শ্রেণীর রাজনৈতিক' উত্তরণ ঘটানোর কৌশল অবলম্বন করেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গে বাম সংস্কৃতির উদ্ভব হয়ে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা বোঝার চেষ্টাও করা হয়েছে। 'ভদ্রলোক শ্রেণীর' এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতি প্রশমিত হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যা অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী জাতি-রাজনীতির পটপরিবর্তন

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলার জাতপাত রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল 'পূর্ব-বাংলা'। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাতে বাংলার রাজনীতিতে এবং সামাজিক কাঠামোতে জাতপাতের ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমবাংলার উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের যে আন্দোলন হয় তা ছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। পূর্বে এই আন্দোলন অবিভক্ত বাংলায় শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার দিনহাটাতে নতুন করে রাজবংশী 'ক্ষত্রিয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[1] এক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজ নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি উত্থাপন করেন। মূলত রাজবংশী সমাজ এই দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই দাবিকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় কিছু সংখ্যক রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা তাঁদের আত্মপরিচিতির দাবিকে প্রতিষ্ঠায় বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্ষত্রিয় সমাজ মনে করেন যে রাজবংশী সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আধিপত্য ছিল কিন্তু দেশভাগের পরবর্তী সময় উদ্বাস্তু বহিরাগতদের আগমনে রাজবংশীদের সেই আধিপত্য খর্ব হয়েছে। দিগেন রায় একজন রাজনৈতিক কর্মী। তিনি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তিনি বলেন— রাজবংশীরা একটা সময় রাজার বংশধর ছিল। পূর্বপুরষ সকলেই ক্ষত্রিয়। রাজার শাসনব্যবস্থায় সবাই আনন্দিত ছিল। প্রজারা সকলে রাজারই বংশধর। ক্ষত্রিয় রাজবংশের প্রভাব বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে শুরু করে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে বিস্তার ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং দেশভাগের ফলে 'ভাটির দেশের' লোকেরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও রাজার সম্পত্তি দখল করে নেয়। রাজবংশী সমাজের মধ্যে বহিরাগত সংস্কৃতি সংস্পর্শে আশায় রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি অবক্ষয় শুরু হয়।[2] অন্যদিকে কলকাতার রাজবংশী নেতৃবর্গ রাজবংশীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন।[3] কলকাতা কেন্দ্রিক রাজ্যে অবস্থিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের নেতাগণ মনে করেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেমন রাজবংশীদের দাবি-দাওয়া আছে তেমনই

[1] ১৯৩২ সালের জনগণনা রাজবংশীরা ডিপ্রেস ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না । পরবর্তী সময়ে এই ক্ষত্রিয় সমাজ তপশিলি ভুক্ত হয়।

[2] গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, দিগেন রায়, কোচবিহার, রাজার মাঠ, ২০১৭।

[3] Barman, Rup Kumar, Changing Identities of the Schedule Caste in Colonial and Post-colonial Bengal, in Ray, Sanjay Kumar and Mukhopadhyay, Rajat Subhra eds, *Ethnicity in the East and Northeast India*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2015, পৃ. ১০৫।

তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন। তাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও অনেক রাজবংশী রয়েছে। যাদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও অনেক রাজবংশী যাঁদের জাতির আত্মপরিচয় ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিশেষ করে আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে মানুষ নিজেদের রাজবংশী হিসেবে নিজেদের স্বীকার করে না। অনেকেই রাজবংশীদের এই আত্মবঞ্চনার দাবিকে নতুনভাবে উত্থাপনে উৎসাহ প্রদান করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতির পুনরুত্থান ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। রাজবংশী ভাষা সংরক্ষণ, ভাষার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উত্তরবঙ্গ ক্ষত্রিয় সমাজ ভাষা আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি উঠে আসতে থাকে। ১৯৫৩ সালে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য তৈরি হলে রাজবংশীরা তাঁদের আন্দোলনকে ভাষা ভিত্তিক আন্দোলনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। রাজবংশীদের ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে প্রবাসী রাজবংশীরা ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজবংশীরা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭০, ১৯৮০, ১৯৯০ এর দশকে উত্তরবঙ্গ ও আসামে ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে রাজবংশীদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জোরালো হয়। রাজবংশী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এই দল ও সংগঠনগুলো রাজবংশী মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক দাবি সাধারণ রাজবংশীদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতীয় কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভা (১৯৮৩), কোচ রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮৪), উত্তরবঙ্গ গণপরিষদ, কামতাপুর পিপলস পার্টি (১৯৯৪), গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (১৯৯৮) প্রভৃতি।[4] মিন্টু বর্মণ একজন গবেষক ও রাজনৈতিক কর্মী। তিনি জানান যে—রাজবংশীদের আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি ন্যায় সঙ্গত। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে রাজবংশীদেরও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির রয়েছে। তাছাড়া রাজবংশীদের আলাদা রাজ্য ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাজবংশীদের এই দাবি-দাওয়া ন্যায় সঙ্গত।"[5] সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব বিশেষ কিছু পড়েনি। নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে সাধারণ

[4] বর্মণ,রূপ কুমার, জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, অ্যালফাবেট বুকস, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-৭৩।

[5] সাক্ষাৎকার, মিন্টু বর্মণ, কোচবিহার, ২০১৮।

জনগনের সমর্থন এরা কখনোই পায় নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলোকেই এরা নির্বাচনী রাজনীতিতে সমর্থন করেছেন। রাজবংশীদের এই দাবিদাওয়ার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নমঃশূদ্রদের বিস্তার তফাৎ রয়েছে। এছাড়াও রাজবংশীদের মধ্যেও দাবিদাওয়ার পার্থক্য রয়েছে। সামগ্রিকভাবে তপশিলি রাজবংশী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতা নষ্ট হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম একটি সম্প্রদায় হল 'নমঃশূদ্র'। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নমঃশূদ্র আন্দোলন নতুন ভাবে প্রভাবিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্বে এই সম্প্রদায় মূলত অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের বসবাস করত। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সম্প্রদায় 'চণ্ডাল' নামে পরিচিত ছিল। যা নমঃশূদ্রদের কাছে সামাজিক বঞ্চনার সমান ছিল। উচ্চবর্ণের বর্ণহিন্দুরা 'চণ্ডাল' নামের মধ্যদিয়ে সামাজিকভাবে তাঁদেরকে হেনস্থা করত। এই অপমান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁরা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা স্বরূপ আন্দোলন করতে শুরু করেন। The Namashudras show considerable aptitude for organisation and it was with much pain they succeeded in getting their designation recognised in place of the term chandal to which day objected.[6] প্রাদেশিক রাজনীতিতে এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায় কংগ্রেস জমিদারের তীব্র বিরোধী ছিলেন। পূর্ববাংলার নমঃশূদ্রদের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা তাঁদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে। কারণ তাঁরা ছিল জমিদারদের ভাগচাষী, কৃষি শ্রমিক। তাই তাঁদের উপর সর্বদা দমনপিড়ন চলত। হরিচাঁদ ঠাকুর জমিদার বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। পূর্ব-বাংলার নমঃশূদ্র কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন। তবে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা কংগ্রেস বিরোধী ছিল। কারণ বেশিরভাগ জমিদার ছিল কংগ্রেসের অনুগামী। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আর এক অন্যতম নেতা ছিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার অনুগামী সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তিনি কংগ্রেস নেতা সরল দত্তের ভ্রাতৃষ্পুত্রকে নির্বাচনে নির্দলপ্রার্থী হিসেবে পরাজিত করেন। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র নেতাগণ জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীদের নির্বাচনে পরাজিত করতে থাকেন। In Jessore the Congress candidate Rashik Lal Biswas defeated Amul Ray although he had to concede defeat in Khulna. In letter district Mukunda Bihari Mallick came out Victorious, but Manmatha Ranjan

---

[6] Garrettr, J.A.E., *The Gazeter of Nodia District*, Calcutta, 1990, পৃ. ৪৬।

Thakur loss to a non Congress candidate.[7] অর্থাৎ পূর্ববাংলার রাজনীতিতে নমঃশূদ্ররা কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে আসে। কংগ্রেস উচ্চবর্ণীয় জমিদারদের কাছে যা ছিল অসম্মানের। দেশভাগের পর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু অংশ ভারতে চলে আসে।

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা অনেকটা ভঙ্গুর হয়ে যায়। নমঃশূদ্রদের একটি বৃহৎ অংশ দেশভাগের ফলে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ছিন্নমূল 'বাস্তুহারা' নমঃশূদ্ররা দেশ ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তপশিলিদের একটি বৃহৎ অংশ পূর্ববঙ্গে থেকে যায়। পরবর্তীকালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায় নমঃশূদ্ররা বাধ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইসময় এই উদ্বাস্তু নমঃশূদ্রদের কাছে জাতি চেতনা ছিল খুবই নিষ্ক্রিয়। Rephrasing of the idioms of victim hood and resistance, placingless emphasis on caste and focusing more on the predicament of migration and the struggle of the refugees[8] প্রাথমিক অবস্থায় দেশভাগের সময় এবং পরবর্তীতে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় তাতে মানসিকভাবে তাঁরা বিব্রত ছিলেন। উদ্বাস্তুদের কাছে জাতি চেতনা ছিল নিতান্তই নগণ্য। জাতপাত চেতনা কিংবা জাতি রাজনীতির উত্তরণ ঘটানোর মতো মানসিক অবস্থায় তাঁরা ছিলেন না। বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের কাছে জীবন সংগ্রামই ছিল প্রধান পাথেয়। প্রাথমিক অবস্থায় খাদ্য, বস্ত্র তাঁদের কাছে মূল বিষয় ছিল। নিমাই বরুই উদ্বাস্তু মানুষ। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ হুগলি জেলাতে বসবাস করেন। উদ্বাস্তু হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আসার পরে নানা যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন— "তখন তো পাকিস্তান ছিল। বাড়ির সবাইরে লইয়া রওনা দি। নৌকায় কইরা সবাইরে লইয়া খুলনা চইল্লা আসি। খুলনা দিয়া বনগাঁ বর্ডার হইয়া মসলন্দপুর স্টেশনে পৌছাইটি পুলিশ ধইরা নেয়। ছেলে মেয়ে তিন ছেলে মেয়ে বউ ও বুদ্ধমাকে নিয়ে পুলিশের হাত থেকে কোনরকম বেঁচে পালাই। সেখান থেকে চইলা আসি বর্ধমান। ডিবিসির ধারে অনেক আমাগো দেশের লোক থাকেন। সবার কাছে সাহায্য চাইলো কারো কাছে সাহায্য পাই নাই। দুদিন পরে মাটি কাটার কাজ করতে চলে যাই। দুপুরবেলা টিফিন খাইবো বলে, পাশের বাড়ি এক টিউবওয়েলে

---

[7] Bandopadhyay, Sekhar, *Caste Protest and Identity in Colonial India: The Namashudras of Bengal 1872-1072,* Survey Curzon press, 1997, P-16.

[8] Bandopadhyay, Sekhar, Partition and Ruptures in Identity Dalit Identity in West Bengal, Asian Studies Review, Vol.33, No.4, November 2009, পৃ. ৪৫৬।

হাত ধুইতে যাই। হাত ধুয়ে আসার পর দেখতে পাই এক মহিলা টিউবল ধ্যুইয়া দিচ্ছেন। খাওয়ার পরে মুখ ধুতে গেলে যা কথা বল্লেন তা মুখেবলা যাই না। একজন তো এসে গায়ে হাত দিয়ে দিলেন। বললেন এই হারামজাদাগুলো কোথা থেকে আসে। পেটের খিদার জ্বালায় ওইসব আর কিছু মনই হয়নি"[9]

উদ্বাস্তু নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এইসময়ে উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হয়। উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বগণ উচ্চবর্ণের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করেন নমঃশূদ্রদের প্রতি তা ছিল ভিন্নরূপ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এবং কলকাতার বিভিন্ন বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্চবর্ণীয়দের স্থান দেওয়া হলেও নমঃশূদ্রদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দণ্ডকারণ্য ও ছত্রিশগড়ে এমনকি উত্তরপ্রদেশ বিহার, নৈনিতাল ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। While the upper caste Hindu migrants were mostly sent outside the state of West bengal, mainly to the rocky plateau of Dandakranya in Chattisgarh and Andaman and Nicobar islands where there were little economic opportunities[10] বাস্তুহারা নমঃশূদ্রদের কাছে অর্থনৈতিক সংকট ছিল প্রবল। ফলে খাদ্য বস্ত্র অন্বেষণ করা ও বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদের কাছে মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেসমস্ত জায়গায় তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয় বা পুনর্বাসন দেওয়া হয় তাতে কিছুটা হলেও তাঁদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। সরকারের তরফ থেকে যে, সামান্য আর্থিক সাহায্য করা হয় বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থা হলো তা গ্রহণ করেন।

নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আন্দামানে বসবাস করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অনেককে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। অনেকেই আবার নিজেদের পরিচিত কিছু লোক থাকায় পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে বসবাস করেন। মতুয়াদের বৃহৎ অংশ উত্তর চব্বিশ পরগণাতে বসবাস করেন। উত্তর ২৪ পরগণার বনগা, চাঁদপাড়া, শিমুরালি, ঠাকুরনগর, অশোকনগর প্রভৃতি স্থানে মতুয়া সম্প্রদায় বসবাস শুরু করেন। মতুয়াদের পথ প্রদর্শক ঠাকুর পরিবার ঠাকুরনগরে বসতি

[9] সাক্ষাৎকার, নিমাই বারুই, হুগলি ,২০১৮।

[10] Chatterjee, Joya, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, পৃ. ১৩৬।

স্থাপন করেন। উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগরে গড়ে ওঠে মতুয়াদের আধ্যাত্বিক দেবালয়।[11] উদ্বাস্তু, নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়। 'মতুয়া মহাসংঘ'কে সামনে রেখে এই আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। মতুয়া নমঃশূদ্ররা পুনর্বাসন ও নাগরিকত্বের দাবির মাধ্যমে সংগঠিত হতে শুরু করেন। নমঃশূদ্ররা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে এবং নির্বাচনী রাজনীতির নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে থাকে। নমঃশূদ্র বুদ্ধিজীবী ও মতুয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল তাঁদের রাজনৈতিক সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। মূল স্রোতের সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় নেতাদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীকে এরা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। অথচ তাঁরা যে ভোট দ্বারা নির্বাচিত হলেন তার বেশিরভাগই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়।

বিভিন্ন উচ্চবর্ণের বাস্তুহারারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে জায়গা পেলেও তপশিলি উদ্বাস্তুরা তা পায় নি। কংগ্রেস নেতাগণ তপশিলিদের উদ্বাস্তুদের কৌশলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। অথচ উচ্চবর্ণের উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে বসতি স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। উচ্চবর্ণের নেতৃত্ববর্গ সুকৌশলে তপশিলিদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তপশিলিদের ঐক্যবদ্ধতাকে নষ্ট করে। যাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভদ্রলোকেরা একপ্রকার তপশিলিদের বাধ্য করেন অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য। উদিতি সেনর মতে— ...feels that an active policy segregation was practiced by the upper castes against the lower caste refugees,who were mostly Namasudras'[12] তার উপরে বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে তপশিলিদের উপর নানা অত্যাচার চলতে থাকেন। শহরের কলোনিগুলোতে এঁদের উপর মানসিক অত্যাচার করা হতো। মনোরঞ্জন ব্যাপারী 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' গ্রন্থ লেখেন যে, শহরে কলোনিতে তাঁদের

---

[11] মতুয়া হল নমঃশূদ্র তপশিলিদের একটি অংশ। যারা সকল রকম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী এক আধ্যাত্বিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

[12] Sen, Udity, *The Myths Refugees Live By: Memory and History in the Making of Bengali Refugee Indentity,* Modern Asian Studies, Vol. 48, No.1, January 2014, পৃ. পৃ. ৩৭-৭৬।

বসবাসের অধিকার ছিল না। পার্টির লোকজন ঠিক করতেন কারা জমি পাবে। স্বজাতি নেতাঁদের ধরে জবরদখল কলোনিতে নিজেদের বসবাসের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। জবরদখল কলোনিগুলোতে নিচু জাতের, জেলে, মুচি, নমঃশূদ্রদের পর দেওয়ার নিয়ম ছিল না। কলোনিগুলি স্থাপনের প্রাথমিক শর্ত ছিল এখানে শিক্ষিত ভদ্র লোক ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর কোন প্রতিবাদ করলে তাঁদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হতো।[13]

২০১০ সালে প্রকাশিত যতীন বালা *‘শিকড় ছেঁড়া জীবন’* পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে নিম্নবর্ণের মানুষের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ক্যাম্পের সরকারি কর্মীরা বর্ণহিন্দু তাঁরা আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখলে আনন্দ পায়... তাঁদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে ক্যাশ ঢোল কেটে নিতো। সেই ইতিহাস চিরকাল অজানাই রয়ে গেছে।[14] উচ্চবর্ণের বিভিন্ন নেতৃত্বগণ সুকৌশলে এই অত্যাচার চালাতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তপশিলিরা চলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক শূন্যস্থানের তৈরি হয়। এছাড়াও পূর্ববঙ্গের তপশিলিদের যে নেতৃত্ব ছিলেন তাঁরা দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়ায় সেরকম কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণের জন্য বামপন্থী নেতৃত্বরা বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে থাকেন। প্রধান বিরোধী পক্ষ হিসাবে বামপন্থীরা কংগ্রেসের উদ্বাস্তুদের পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। উদ্বাস্তু বাস্তুহারা ও নির্যাতিত মানুষের দাবি-দাওয়াকে সরকারের সামনে তুলে ধরেন। ফলে উদ্বাস্তু তপশিলিরা বামপন্থীদের পরিত্রাতা হিসেবে দেখতে শুরু করেন। পূর্ববঙ্গের বলিষ্ঠ নেতৃত্বগণ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বকে তাঁরা মেনে নেন। দেশভাগের ফলে যে, সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল বাম রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তা কিছুটা হলেও অবদমিত হয়। জাতপাত রাজনীতির শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতিতে রূপান্তর ঘটে। বামপন্থী মতাদর্শের সঙ্গে জাতপাতের সম্পর্ক যে, উপরিসৌধ তা কৌশলগতভাবে বামপন্থীরা ব্যবহার করেন। For the leaf front

---

[13] ব্যাপারী,মনোরঞ্জন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা,২০১৪।

[14] বালা, যতীন, শেখর ছেঁড়া জীবন: উদ্বাস্তু দলিতের দলিল, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১০।

of West Bengal, just like any commonist political formation class was a more relevant, progressive and legitimate category while the question of caste was only a part of superstructure'[15]

পূর্ববঙ্গ তপশিলিদের মধ্যে উচ্চবর্ণীয়দের নিয়ে বিদ্বেষ বরাবরই ছিল। পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের মধ্যে জমিদার বিরোধী যে, আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মূল প্রতিপক্ষ ছিল এই উচ্চবর্ণীয় জমিদারগণ। দেশভাগের পরেও এই উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বগণের প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা ছিল। উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বগণ কংগ্রেসের অনুগামী হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় তাঁরা তাঁদের বিরোধী ছিলেন। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বাস্তুহারা উদ্বাস্তুরা তাঁদের যে দাবি-দাওয়া এবং অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতে বিকল্প হিসাবে বামপন্থী আন্দোলনে তাঁরা যোগদান করেন। বামপন্থীদের জনভিত্তি তৈরির জন্য যে, দাবিদাওয়াগুলো উত্থাপিত করেন তা তপশিলিদের দাবি হিসেবেই তাঁরা মনে করতে থাকেন। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতির যে, শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল শ্রেণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা তা পূরণ করতে সমর্থ হয়। ফলে তপশিলিদের মধ্যে ধর্ম ও জাতপাত চেতনার থেকে শ্রেণী চেতনা প্রধান হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার অধিকার তাঁদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার থেকে আত্মপরিচিতি বা জাতি পরিচিতি তাঁদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। Under such circumstances, their primary concern could not have been assertion of the identity but survival[16],

এছাড়াও দেশভাগের ফলে যেসব নমঃশূদ্ররা বা তপশিলিরা এসেছিলেন জমিদারের প্রতি তাঁদের মধ্যে একটি সহানুভূতি তৈরি হয়। এই সহানুভূতির একটা আবেগ ছিল। উভয়ই বাস্তুচ্যুত এবং উভয় মাতৃভূমি হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নমঃশূদ্রদের উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারদের প্রতি যে, ঘৃণার মনোভাব ছিল বাস্তুহারা হওয়ায় সেই মানোভাব লঘু হতে থাকে। জমিদার শাসকদের বিরুদ্ধে যে প্রবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল তা প্রশমন ঘটে।

---

15 Bandyopadhyay, Sarbani, Caste and Politics in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.47, No. 50*, December 15, 2012, পৃ. ৭৩।

16 Bandyopadhyay, Sarbani, Caste and Politics in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.47, No. 50*, December 15, 2012, পৃ. ৭২।

দেশভাগের পূর্বে যেসব তপশিলিরা পূর্ববঙ্গে ছিলেন তাঁরা মুসলিম ও তপশিলিরা উভয় জমির প্রজা ছিলেন। Having lost their landed property, the upper caste refugees no longer remained the powerful upper caste manibs or kartaa(masters) receiving the service of the Namasudra's or Muslim praja(tenant) তপশিলি ও মুসলিমরা জমিতে উভয়ে কাজ করার ফলে তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদের থেকে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়। ফলে দেশভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি হলো তপশিলিদের এবং মুসলিমদের সম্পর্ক পূর্বের মতোই বহাল ছিল। দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা হলেও তাঁদের মধ্যে সম্প্রদায়িক চেতনা তেমনভাবে কাজ করেনি। তার থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই তাঁরা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে।

জাতপাতের চেতনার এই অনুপস্থিতি বামপন্থীরা অনুধাবন করতে পারেন এবং তাঁরা বাস্তুহারা উদ্বাস্তুদের খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। যা গবেষণা সন্দর্ভের পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গার উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে, কমিটি গঠিত হয় 'ইউনাইটেড সেন্টাল রিফিউজি কাউন্সিল' বা U.C.R.C তা পুরোপুরি ছিল বামপন্থীদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। U.C.R.C দ্বারা প্রভাবিত আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কংগ্রেস সরকার বিরোধী। This language of progressive political modernty had no place for the backward identities of caste,[17] এই আন্দোলনে বেশিরভাগ তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ যুক্ত হলেও তা জাতি পরিচিতির আন্দোলনে রূপান্তরিত না হয়ে রূপান্তরিত হয় শ্রেণী আন্দোলনে। এছাড়াও উদ্বাস্তুরা যে, সকল জমি দখল করেছিলেন তা পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তবে কংগ্রেস সরকার বিরোধী এই আন্দোলনের প্রধান বিরোধীদল ছিল বামপন্থীরা এবং এঁদের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্যা। As a result, It has been argued that the left front had some vested interests in making the language of caste irrelevant in order to sustain an order of hegemonic control of the

17 Chatterjee, Partha, Partition and the Mysterious Disappearance of the Caste in Bengal, Routledge India,পৃ. ৯৫।

upper caste,[18] উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা বামপন্থীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলনও উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মৎসজীবীদের একটি অংশ মালো জাতি অন্তর্গত। এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তাঁদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালায়। সমবায় সমিতির সঙ্গে শুধুমাত্র মালোরাই যুক্ত নয় এর সঙ্গে অনেক অন্য সম্প্রদায়ও যুক্ত রয়েছে। কিন্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে এঁরা এঁদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালায়। তবে মালো নেতৃত্বরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর ডক্টর ভোলানাথ বিশ্বাস ও হারাধন চন্দ্র বর্মণ বিধায়ক হয়ে প্রবেশ করলেন। পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে তাঁদের উপস্থিতি খুবই সামান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এঁরা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালায়। কিন্তু এই জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের চেতনাকে নতুন দিকে পরিচালনা করে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ও মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাঁরা সব সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তৈরির দিকে।[19] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এঁরা মৎস্যজীবী সমবায় (Co-operative) গঠন করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কাকদ্বীপ, কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার, উত্তর ২৪ পরগনা, হাবরা, বনগাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, প্রভৃতি জেলাতে মৎস্যজীবী সমবায় (Co-operative) গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় মৎস্যজীবীদের সম্মেলন ১৯৬৮ সালে দমদমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। মৎস্যজীবীরা আওয়াজ তোলেন 'জাল যার, মাছ তার'। মালো সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন ধীরে ধীরে শ্রেণী আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের শুধুমাত্র মালোরই নয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীরা যোগদান করেন। এই সম্প্রদায় তাঁদের মহাজনের কাছে যে ঋণের বোঝা মুকুবের

---

[18] Sen, Dwaipayan, An Absent Minded Casteism? in Chandra, Uday, Geir, Heierstad, edited by and Nielsen, Kenneth Bo, *Politics of Caste in West Bengal*, New Delhi, Routledge, 2016, পৃ. পৃ. ১০৩-১২৪।

[19] বর্মণ,রূপ কুমার, জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, অ্যালফাবেট বুকস, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-৭৩।

দাবি জানায়। বাম সংগঠনগুলো মৎস্যজীবীদের দাবি-দাওয়াকে আরো জোরদার করেন। পার্টি নেতা, বিলের মালিক, কিংবা মহাজনের বিরুদ্ধে তাঁরা শোষণ বিরোধী আওয়াজ তোলেন। বাম সংগঠনগুলো একে শুধুমাত্র মালোদের দাবি বলে স্বীকার না করে সমগ্র মৎস্যজীবীদের আন্দোলন বলে মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক বিন্যাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। জেলাভিত্তিক জাতপাতগুলোর অবস্থান বিভিন্ন। জাতপাত ভিত্তিক জনসংখ্যা যে জেলাগুলিতে সংখ্যাধিক্য তা হল উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি বসবাস করে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আধিক্য বেশি। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলাতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে বেশি করে দেখা যায়। এখানে তাঁরা ৫৪ শতাংশ স্থান দখল করে জাতপাত ভিত্তিক দ্বিতীয় জনবহুল গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ৬৩ শতাংশ এবং উত্তর ২৪ পরগনা ১৯.৩৮ শতাংশ পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা বসবাস করেন। এছাড়া বাগদি, বাউরি জাতির মানুষদের বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে জাতপাত ভিত্তিক নেতাগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন এবং তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটেনি এবং সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি। দেশভাগের পর অবিভক্ত বাংলার বর্ণহিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে তপশিলি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ফলে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ আসন পূর্ববঙ্গে থাকায় ঐক্যবদ্ধ জাতি রাজনীতি বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গের তপশিলিরা সংখ্যালঘু হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় কংগ্রেস। সারাদেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস আধিপত্য বিস্তার করে। কংগ্রেস প্রথম থেকেই জাতপাত রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার জন্য জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আবেগকে বেশি প্রাধান্য প্রদান করেন। বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ এর মন্ত্রিসভায় হেমচন্দ্র নস্কর ও রাজবংশী জাতির নেতা মোহিনী মোহন বর্মণকে মন্ত্রী করেন। পরবর্তী সময়ে বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় পৌণ্ড্র জাতির

নেতা হেমচন্দ্র, রাজবংশী নেতা মোহিনী মোহন বর্মণ মন্ত্রিত্ব লাভ করলেও বাগদি জাতির নেতা রাধানাথ দাস সুযোগ পাননি ।

তবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলো শ্রেণী রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রচুর উদ্বাস্তুদের চাপ পড়ে দেশভাগের পূর্বে জাতপাতের রাজনীতির প্রাধান্য থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতের রাজনীতির চেয়ে খাদ্য ও বাসস্থানের লড়াই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন জাতিসংগঠনগুলোর দাবি দাওয়াও ছিল ভিন্নতর। এছাড়া তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ কোন তপশিলি সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ জাতপাতের রাজনীতি নিষ্ক্রিয় থাকলেও তা সম্পূর্ণ বিলোপ হয়নি।

বামপন্থীদের শ্রেণী রাজনীতির উত্তরণ ও ধারাবাহিকতা

পশ্চিমবঙ্গের সরকার জমি অধিকার রক্ষার আইন পাস করে ১৯৫০ সালে। বর্গাদার আইন কোন নীতিতে সরকার উচ্ছেদ করতে পারে, সেই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ভূমি সংশোধনী আইন তা স্পষ্ট করে প্রণীত হয়। ১৯৭২ সালে বর্গাদার আইন যাতে আরো অধিক সুবিধা লাভ করতে পারে তার জন্য ১৯৫৫ সালের আইনের সংশোধনী করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত 'মুখার্জি ও বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশন' রিপোর্টে (১৯৯৩) বর্গাদাররা সর্বত্র আইন অনুযায়ী ফসলের ভাগ পাচ্ছেন না বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[20] সংশোধনী অনুসারে চাষের জন্য জমির মালিক যদি বীজ সার সরবরাহ করেন তাহলে উৎপাদিত ফসল সমানভাগে ভাগ হবে। আর যদি বর্গাদার সার সরবরাহ করেন তাহলে ফসলের ভাগ হিসেবে তারা পাবেন ৭৫শতাংশ আর মালিক শ্রেণীরা পাবেন ২৫শতাংশ। আইন প্রণয়ন হলেও বর্গাদারদের জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি।

গ্রামীণ কৃষক এই আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের একত্রিত করে এবং তারা সংঘবদ্ধ হয়। তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জমিদারগণ বর্গাচাষীদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

[20] Mukherjee, Nirmal and Bandopadhyay, D, *New Horizons for West Bengal Panchayat, Government of West Bengal*, Calcutta, 1993, পৃ. ৪১।

অবলম্বন করে। এই জমিদার শ্রেণীর কংগ্রেসের অনুগামী ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকার কৃষক স্বার্থ রক্ষায় ভূমহীন, ভাগ চাষীরা বামদলের অনুগামীতে পরিণত হয়। গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামো ধনী-দরিদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হয় যায়। একদিকে দরিদ্র, ছোট, মাঝারি চাষী, কৃষক শ্রেণী অন্যদিকে জমিদার। দরিদ্র শ্রেণীর কৃষক যাদের বেশিরভাগই ছিল জাতপাতের ভিত্তিতে তপশিলি এবং মালিক শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল বর্ণহিন্দু। জমির মালিকানা হারানোর ভয়ে জমির মালিকরা বিভিন্ন কৌশলে তাঁদের উচ্ছেদ শুরু করে। এর ফলে জোতদারদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জমিতে বর্গাদারদের পরিবর্তে কৃষি শ্রমিকের দ্বারা আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। বাম নেতাগণ বরাদ্দ দাবি দাওয়া নিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

বৃহৎ জমির মালিকরা গ্রামের শাসক হয়ে ওঠে। বাম রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শগতভাবে এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিল। তাঁরা মনে করেন যে কংগ্রেস এই সামন্ততান্ত্রিক ধারার ধারক-বাহক। শ্রেণী রাজনীতিতে এই জমিদার শ্রেণী ও কংগ্রেস তাঁদের শ্রেণীশত্রু বলে মনে করেন। রাজনৈতিক ভাবে এই শ্রেণী শত্রুর মোকাবিলা। ধনী ও গরিব এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে বামপন্থীরা গরীব শ্রেণী সমাজের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা এই গরীব শ্রেণী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে সহমত। পশ্চিমবঙ্গের সকল বামদলগুলো শ্রমিকদের পক্ষে সংগ্রাম করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। শশধর সরকার একজন গরিব চাষী। পরিবারের ছয় ভাই এক বোন নিয়ে যৌথ পরিবারে থাকতেন। কিন্তু চাষবাসের জন্য অন্যের জমিতে নির্ভর করতে হতো। বামপন্থীদের জমিদার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন-গ্রামের মানুষ আমরা। অভাব ছিল। অন্যের জমিতে লাঙল দিতাম। অন্যের জমি চাষ করে কোনক্রমে দিন চলত। যেটুকু নিজেদের জমি ছিল তা ভাগ হয়ে যাওয়ায় সেই জমি দিয়ে সারা বছরের সংসার চালানো সম্ভব হতো না। একবার জমি বিবাদের জন্য ৪০ দিন জেল খাটতে হয়েছে। এইভাবে বামেদের মতাদর্শের সঙ্গে ও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ৭৭ সালের আগে থেকেই পার্ট মেম্বার হিসেবে কাজ করেছি। চাষীদের হয়ে লড়াই করেছি।[21]

---

[21] সাক্ষাৎকার শশধর সরকার, স্বরূপনগর, ২০২১।

গ্রামীণ এলাকাতে কৃষক, ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক, ভাগচাষী, ভূমিহীন নিয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বাম নেতারা এর নেতৃত্ব প্রদান করেন। বামেদের ক্ষেতমজুর সংগঠন জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণীর লড়াই গড়ে তোলেন। এই শ্রেণীর লড়াই এ দুটি পক্ষ একটি গরিব শ্রেণীর যার নেতৃত্ব প্রদান করেছেন বামদলের সংগঠকরা ও অন্যদিকে ধনীশ্রেণীর জমিদার সহায়ক হলো জাতীয় কংগ্রেস। জমিদার বিরোধী আন্দোলন ও ভূমিসংস্কার এই দুই কৌশলকে সামনে রেখে বাম দলগুলো তাঁদের নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। বামেদের শ্রেণী সংগ্রাম আন্দোলনে শ্রেণী প্রতিপক্ষ হিসাবে কাছে জমিদাররা প্রতিমানও হয়। ভূমিহীন, ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক, ভাগ চাষী, খেতমজুররা জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

গ্রামের কৃষকরা এতে অংশগ্রহণ করতে থাকে। গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ কৃষক হলো তপশিলি জাতি। তপশিলীরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। তাঁরা মনে করেন যে, ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে তাঁরা জমির মালিকানা লাভ করবেন। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের যে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ছিল তাঁরা বেশিরভাগই ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল শিক্ষিত ও শ্রেণী সচেতন। এরা কৃষক সংগঠনগুলোকে রাজনীতি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিল। কৃষক সংগঠনগুলোর প্রধান উপদেষ্টা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা ছিলেন শ্রেণীচেতনা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত কৃষক। এই মধ্যবিত্ত কৃষকের বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু। অথচ কৃষক শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল তপশিলি জাতির শ্রেণী চেতনার উদ্বুদ্ধ কৃষক। যাঁরা ভাগচাষী তাঁরা ফসলের তেভাগার পরিবর্তে সমান ভাগ এর দাবি জানায়। কৃষকদের মধ্যে বিভেদ দূর করার জন্য বামদলগুলো বড় কৃষক, মাঝারি কৃষক, ছোট কৃষক, চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের অভিন্ন কৃষক শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত করে। **১৯৮২** সালে সর্বভারতীয় কিষান সভার আলোচনা সভায় সর্বভারতীয় সভাপতি এসকে সুরজিৎ বলেন- Without raising the the demand of the peasantry as a whole, including rich and middle pleasants and without merging the different currents into one, we can neither advance towards the agrarian revolution nor will be able to raise the movement to the

level of land occupation ।[22] বামদলগুলো তাঁদের কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকদের পক্ষ নেয়।

বামপন্থীরা বিশেষ করে সি.পি.আই(এম) যতটা না রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছেন তার থেকে বেশি তপশিলি নিম্নবর্ণের এবং মধ্যবিত্তদের শ্রেণী উত্তরণকে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন। Kohli has pointed out that like any Political party the CPIM is also motivated by the desire to capture power but unlike Aadhar political parties the CPM seek to a achieve this goal by mobilizing the lower and lower middle classes. [23] সি.পি.আই(এম) দাবি করেন যে, তাঁরা তপশিলিদের নয় বরং নিম্নশ্রেণীর স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পার্টির বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গরিব মানুষের আস্থা অর্জন করে। সি.পি.আই(এম) দশম পার্টি কংগ্রেসে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বলেন যে, কৃষি শ্রমিক এবং বড়ো কৃষকদের মধ্যে বিভেদ দূর হবে সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। প্রাক্তন সি.পি.আই(এম) সেক্রেটারি সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন যে, পরিবর্তন আনতে হলে জাতপাতকে গরিবের ও খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে এবং শ্রেণী চেতনার মাধ্যমে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব হবে।[24]

অতুল কোহলির মতে, সি.পি.আই.(এম.)র দীর্ঘদিনের মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে 'সংগ্রামী' থেকে সংশোধনবাদের মধ্যদিয়ে। সংশোধনবাদীরা শ্রেণীভিত্তিক গতিময়তার যে, চরিত্র বহন করে তা সংশোধনবাদীদের একটি পরিকল্পনা। রাজ্যস্তরে, জেলাস্তরে সি.পি.আই.(এম.) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ‘মধ্যশ্রেণীর’ নেতাদের গ্রামীণ স্তরে কৃষক পরিবারগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করত। অশোক রুদ্রর মতে, At the provincial and district levels, the CPIM was largely dominated by ritually pure middle class leaders having King ship ties and social links with relatively well off rural

---

22 *AIKS,* 1982, পৃ.পৃ. ২৮-২৯।

23 Kohli, Atul, *The State and Property in India: the Politics of Reforms*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, পৃ. ১০৯।

24 Mishra, S.K., An Alternative Approach to Development: Land reforms and Panchayat, Government of West Bengal, Information and Cultural Affairs Department, Calcutta 1991, পৃ. ৯।

pleasant families[25] মাঝারি কৃষক শ্রেণীর নেতাগণ নির্বাচনী রাজনীতির সমঝোতা এবং পার্টির তত্ত্বগত প্রকৌশলেও অংশগ্রহণ করতো। হরেকৃষ্ণ কোঙার পার্টির একজন বৈপ্লবিক নেতা ছিলেন। তিনি পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দিক দেখতেন। তিনি মধ্যবর্তী কৃষক পরিবারেরই নেতা ছিলেন। তিনি বলেন যে, মধ্যবিত্ত কৃষক অবশ্যই সংযোগকারী ভূমিকায় থাকতে হবে অন্যথায় কৃষক শক্তি দুর্বল হবে। এই বোঝাপড়া থেকে এটা স্বীকৃত হয় যে, মধ্যবিত্ত কৃষক ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিল গ্রামীণ এলাকাতে। ১৫ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যা ধনী শ্রেণীর যাদের মধ্যে ৩ থেকে ৪ শতাংশ বামপন্থীদের সমর্থক ছিল। মধ্যবর্তী কৃষক বা মাঝারি কৃষকরা সামাজিকভাবে এবং মানসিকভাবে দরিদ্র ও ভাগচাষীদের কাছাকাছি ছিলেন। মানসিকভাবে মধ্যবিত্ত কৃষকরা এঁদের উৎসাহিত করতেন। এঁদের মতামতকে গুরুত্বের সহিত বিচার করতেন। বিভিন্ন সময় এঁদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন। এতে পার্টির সংগঠন ও সংগঠক হিসেবে গ্রামীণ এলাকাতে মধ্যবিত্ত কৃষকদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকাতে মধ্যবিত্ত কৃষকরা পার্টি সংগঠন চালানোর জন্য যে অনুদান গ্রহণ করতো তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।[26] গ্রামীণ স্তরে বামপন্থী সংগঠনগুলো মধ্য কৃষকদের সহযোগিতার জন্য পার্টি সংগঠন মজবুত করতে সক্ষম হয়। মধ্যবিত্ত কৃষকের উপর দরিদ্র, ভাগচাষী, কৃষি শ্রমিকরা অনেকটাই নির্ভরশীল। গ্রামীণ এলাকাতে জাতপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যবিত্ত কৃষক কিংবা মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত জাতপাতের মধ্যে পড়ে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সদগোপ, মাহিষ্য, আগুরি প্রভৃতি। এঁদের যেরকম কৃষক সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা রয়েছে তেমনি বামপন্থীদের কমরেড হিসেবে ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা ও পার্টির মর্যাদা সমান্তরালভাবে গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বামফ্রন্ট গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জমি আইনের সংশোধনী নিয়ে আসে। বামফ্রন্ট সরকার 'অপারেশন বর্গা' নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে গ্রামীণ বর্গাদার তাঁদের নাম

---

[25] Rudra, Ashok, One Step Forward, Two Step Backward, *Economic and Political Weekly*, *Review of Agriculture*, Vol.16, June 1981, পৃ. ৬১।

[26] Rudra, Ashok, One Step Forward, Two Step Backward, *Economic and Political Weekly*, *Review of Agriculture*, Vol.16, June 1981, পৃ. ৬১।

সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটি গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বেশ বড় পার্থক্য ছিল। বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা জোরদার ও জমিদারদের কাছে সংকটের পরিস্থিতি তৈরি করে। নাম নথিভুক্ত করার সময় বর্গাদার জমিদারদের কাছে কিছু জমি ও অর্থলাভ করে। যাতে কোন বর্গাদার নাম লিপিবদ্ধ না করে বর্গাদারদের আগাম টাকা 'কর্জ' দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় করত। এছাড়া জোতদার ও জমিদারদের মধ্যে মোটামুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কারণ জমির বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা বারবার সংস্পর্শে আসত। আর্থিক নির্ভরশীলতা সামাজিক সম্পর্কের জন্য অনেক বর্গাচাষী বিরুদ্ধে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের জমির ইজারার বিষয় দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ছোট ছোট কৃষকরা জমিদারদের নিকট থেকে জমি ইজারা নিতেন। এই ছোট্ট কৃষকরা তাঁদের মধ্য দিয়ে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করত। জমির পরিমান না বাড়িয়ে ছোট জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জোর দেওয়া হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রযুক্তির ব্যবহারের তুলনামূলকভাবে এঁরা পিছিয়ে ছিল। অন্যদিকে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে কৃষিজমিতে কৃষকরা তাঁদের টিউবওয়েলের চারপাশের জমি ইজারা নেয় এবং কৃষি জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করে চাষবাস করে। এতে জমির উপর তাঁদের আধিপত্য বজায় থাকে। তার ফলে ধনী কৃষকদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

গ্রামের ছোট কৃষকরা সরকারের বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের জল ব্যবহার করতে থাকে। তাঁরা অনেক সময় ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চাষের কাজ করতে থাকেন। তবে বাস্তবিকপক্ষে ডিজেল পাম্পের মালিকদের সংখ্যাও কম। তাই বেশিরভাগ কৃষকরা ভাড়া করে চাষবাস সম্পন্ন করেন। এই ভাড়া করা পাম্পের খরচ টিউবওয়েল বসানোর থেকে অনেকটাই কম। পাম্পের ব্যবহারের ফলে বহু সংখ্যক এর ব্যবহার করতে পারে। এতে বড় কৃষকদের জমি কেন্দ্রিক আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। মাঝারি কিছুকরায় কৃষকরাই বেশিরভাগ পাম্পের মালিক ছিলেন। ভাড়া করাই পাম্পের উপর ছোট কৃষকরা অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে কৃষি কাজকে কেন্দ্র করে তাঁদের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কৃষকরা, বামপন্থীদের কৃষক সংগঠনগুলোর দায়িত্বে থাকায় তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কও তৈরি হয়। এইভাবে বাংলা শ্রেণীভিত্তিক কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অলিখিত রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটে।

বামপন্থী সি.পি.আই.(এম.) পার্টি ঐতিহাসিকভাবে ও প্রথাগতভাবে গ্রামীণস্তরে স্তরায়নের দিকে লক্ষ্য রাখেনি। তাঁরা সর্বদা চেষ্টা করেছে গ্রামীণ স্তরে শ্রেণীর সংযোগমূলক ব্যবস্থা গড়ে

তুলতে। এমনকি মধ্যবিত্ত কৃষকদের সঙ্গে জমিদার শ্রেণী ও জোরদারদেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জমিদার ও জোরদারদের সংস্পর্শে যেহেতু মধ্যবিত্ত কৃষকরা থাকতো ফলে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এইভাবে বামপন্থীরা মধ্যবিত্ত কৃষকদের মাধ্যমে ভূমিহীন, বর্গাদার ও জোতদারদের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৮২ সালের সারা ভারত কৃষক সভায় এইচ.কে. সুরজিৎ বলেন আমরা কখনোই কৃষক সংগ্রাম ও কৃষি বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবো না, যদি না ধনী মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে পারি।[27] বস্তুত সি.পি.আই.(এম.) গ্রামীণ এলাকাতে মাঝারি কৃষকদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেন। মধ্যবিত্ত কৃষকদের পার্টিতে সংগঠনের দায়িত্ব ছিল। যেখানে কৃষি শ্রমিকরা অনেকটাই অবহেলিত। বামপন্থী পার্টি এবং কিষাণ সভা মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। যাঁদের তুলনামূলকভাবে কৃষক মহলে সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের কিষাণ সভা বলে যে, মধ্যবিত্ত কৃষকদের সহযোগিতা ছাড়া এ জয় কখনোই সম্ভব হতো না।[28] ভূমিহীন ও খেতমজুর কৃষকেরা ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যেহেতু ভূমিহীন ও খেত মজুররা মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদের উপর নির্ভর করতেন সি.পি.আই.(এম.) নির্বাচন প্রচার করেন যে, কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের কাজের ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত করতেন। সি.পি.আই.(এম.) পার্টি তার নির্বাচনী ক্ষেত্রে অভিন্ন কৃষককে কৃষক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতেন। .. It was CPIM election agenda to keep both employers and workers on their side)[29] কৃষকদের বাধ্যবাধকতা থেকে নির্বাচনী ক্ষেত্রে অনেক কৃষক তাঁদের ভূমিকা পালন করতেন।

ভূমিসংস্কার রূপায়ণে ও কৃষি খুবই কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি হলো বর্গা অন্যটি হলো পাট্টা। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষী নথিভুক্ত করার সুযোগ পায়। ভাগ চাষীদের জমিতে বৈধতা

---

[27] India Kisan Sabha, *Proceedings and Regulation adopted by the 24th Conference 1982*, Midnapur, 2982, পৃ. ২৮।

[28] West Bengal Pradeshik Kisan Sabha, Pandua, Hooghly 1982, পৃ. ১২২।

[29] Rogly, Ben, Containing Conflict and Reaping Votes: Management of the Rural Labour Relation in West Bengal, *Economic and Political Weekly, vol. 33, No.42/43*, October 17 1988, পৃ. ২৭৩২।

স্বীকৃত হয়। বিধানসভায় আইন পাশের ফলে তাঁদের এই বৈধতা স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন বর্গাদারী চাষব্যবস্থাকে বৈধতা প্রদান করেন। চাষবাসের ক্ষেত্রে মালিক, জমির মালিক কিংবা তার পরিবারের কেউ চাষবাস করতে পারবে। কিন্তু ভাড়া করা শ্রমিকের দ্বারা জমির চাষ বৈধ নয়। ভাগ চাষীদের ফসল ভাগের বিষয়টিও নির্ধারিত হয়। অপারেশন বার্গার অন্য একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পাট্টা। সরকার ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে যে উদবৃত্ত জমি উদ্ধার করেন তা ভূমিহীনদের মধ্যে পাট্টার মাধ্যমে ২ মিলিয়ন বর্গাদারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮১ সালে ১.২ মিলিয়ন বর্গাদার নথিভুক্ত করেন। অপারেশন বর্গা তার পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ব্যর্থ হয়। ৫০ শতাংশ বর্গাদার নথিভূক্ত করতে ব্যর্থ হয়।[30] ২০০০ সাল পর্যন্ত ১.৬ বিলিয়ন বর্গাদার সরকারিভাবে নথিভুক্ত করেন যা কৃষক শ্রেণীর এক তৃতীয় অংশ।[31]গ্রামীণ এলাকাতে জমিদার ও বড় কৃষকরা, বর্গাদার ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। কৃষকরা যেহেতু বড় কৃষকদের জমিতে চাষ করেন তাঁদের উপর নির্ভরশীল। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। তবে পরবর্তী সময়ে বর্গাদার নথিভুক্ত করার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮১ সালে ৭ লক্ষ ১৬ হাজার একর কৃষি জমি ১.৩ বিলিয়ন চাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ১৯৯১ সালে ৯ লক্ষ ১৩০০০ একর জমি ২ বিলিয়ন গৃহীহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ২০০০ সাল পর্যন্ত ১.৩৯ বিলিয়ন একর জমি সরকার অধিক গ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে থেকে ১.০৪ মিলিয়ন একর জমি বিতরণ করেন।[32] পশ্চিমবঙ্গের বর্গা এবং পাট্টা মিলিয়ে একত্রে ৪১.৩ শতাংশ গ্রামীণ কৃষক পরিবার পান। একটি বিশ্লেষণ থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, যত ভাগ বসতবাড়ি পেয়েছেন তার থেকে প্রকৃত জমি কম বিতরণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ যারা জমি পেয়েছেন তা ক্ষুদ্র জমি তুলনামূলকভাবে তার আয়তন ছোট। Most beneficiaries obtained small plots less

---

[30] Khasnabis, Ratan, Operation Borga: limits to the social democratic reformerism, *Economic and Political Weekly,* Review of Agriculture, Vol.16, No. 25 26, June, 20, 1981, পৃ. ৪৫।

[31] Sarkar, Abhirup, Political Economy of West Bengal: A Puzzle and a Hypothesis, *Economic and Political Weekly, Vol. 41, No.4,* January 28, 2006, পৃ. ৩৪৪।

[32] Government of West Bengal, Development and Planning Department, West Bengal Human Development Report 2004, Kolkata Government of West Bengal, May 2004, পৃ. ৩৪।

than one acre in size, substantially below average size of holding.,[33] ভূমিসংস্কার থেকে আরেকটি জিনিস পাওয়া যায় যে, জমির ক্ষুদ্র আয়তন। ১৫ টি জেলায় এই ক্ষুদ্র আয়তনের জমি ৮৯শতাংশ গ্রামীণ কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সার্ভে রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, এদের মধ্যে ৪ শতাংশ কৃষি জমি বিতরণ করা হয় ১৫ শতাংশ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে।[34] প্রান্তিক এবং ছোট জমি ভূমিকা রাখে। ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশি উৎপাদন করেছে। রিপোর্ট থেকে বলা হয় যে, ছোট কৃষকরা ভূমি সংস্কারের ফলে ব্যাপক জমির ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।[35] আনুমানিক ৩ থেকে ৪ শতাংশ অতিরিক্ত কৃষক জমির মালিকদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভূমির আয়তন খর্ব হয়েছে। ভূমি সংস্কারের ফলে দারিদ্র দূরীকরণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার ১৯৭৩-৭৪ সালে ৭৩.১, ১৯৯৯-২০০০ সালে তা হয় ৩১.৮৫শতাংশ। ২০০৪-৫ সালে তা হয় ২৮.৬শতাংশ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্রতা দূরীকরণ হয়। ভূমিসংস্কারের ফলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[36]

লিটনের মতে(Lieten) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের পুনরায় কৃষি ক্ষেত্রে নিয়ে আসলেন। ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার ভূমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করেন। একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্য ১২.৩৬ একর চাষযোগ্য জমি এবং ১৭.৩০ একর অচাষযোগ্য জমি রাখতে পারবেন। বাম সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে জমির ঊর্ধ্বসীমা কমান নি। ফলে অনেক বেশি জমি বন্টনের সুযোগ পেয়েছিলেন।[37] রস মল্লিক

---

[33]Mallick, Ross, Development policy of a Communist Government: West Bengal since 1977, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, পৃ. 88।

[34] Vardhan, Pranab and Mookherjee, Dilip, "Poverty Alleviation Efforts apan West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.39, No.9*, February 28 2004, পৃ. ৯৬৭।

[35] The Report Attribute the Higher Incidence of Land Holding in the Marginal Class to Land Reforms and Mounting Demographic Pressures on Land Government of India, Planning Commission, New Delhi, 2010, West Bengal Development Report 2010, পৃ. ৪৯।

[36] Government of India, *West Bengal Development Report*, পৃ. ৯৫।

[37] Khasnabis, Ratan, Economy of West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.43, No.52*, December 27, 2009, পৃ. ১০৫।

দেখান যে, অধিকৃত ৫ একর জমি ৪৪ শতাংশ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করেন, কৃষি পরিবার উপকৃত হন। বর্গাদার ও ভাড়াটিয়া কৃষক/মজুর ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমিস্বত্ব অধিকার প্রদান করেন। Ross Mallick has estimated that acquisition of land over 5 acres would provided 44%of cultivable land of redistribution and would provide positive gains to 87% of agriculture households.[38] ১৯৭৩ সালে পি. সুন্দরাইয়া জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ ও তাঁদের ভূমিস্বত্ব প্রদানের প্রস্তাব করলে সি.পি.আই.এম. তা গ্রহণ করেন নি। সুন্দরাইয়া পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গের সি.পি.আই.এমের কাছে বলেন যে ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকের সংমিশ্রণ ছাড়া পার্টি তাঁদের সংঘবদ্ধ শ্রেণী হিসেবে গড়তে পারবে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে কিষাণ ফ্রন্ট এবং কেন্দ্রীয় কৃষি প্রস্তাব ১৯৭৩ সাধারণ সম্পাদক পি.সুন্দরাইয়া বলেন যে ভাগ চাষী হলো প্রকৃত জমি চাষ করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।[39] বর্ধন এবং মুখার্জি ফ্রি সার্ভের মাধ্যমে যুক্তি প্রদান করেন যে, বামফ্রন্ট সরকার মতাদর্শগতভাবে ভূমি সংস্কারের বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু গ্রামীণ স্তরে ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ও নির্বাচনী রাজনীতির জন্য তা বিঘ্নিত হয়। রস মল্লিকের মতে ভূমি বন্টনের ছিল তিন লাখ একর।[40] লিটেনের(Lieten's) মতে তা ছিল ৮ লাখ একর।[41]

১৯৬০ এর দশকে যুক্তফ্রন্ট সরকার জমি, চিহ্নিত করেন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে বেনামী জমি উদ্ধারের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য হরেকৃষ্ণ কোঙার চেষ্টা করেন। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন ভূমি সংস্কার কমিশনার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্ত কৃষক সম্পর্কে সি.পি.আই.(এম.) যেভাবে ভাবতো সেরকমই ছিল। ভূমি সংস্কারের প্রথম দফায় বৃহৎ জমির মালিকের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকাতে এই মধ্যবিত্ত

---

[38] Mallick, Ross, *Development Policy of a Communist Government*, পৃ. ৩৯।

[39] Bhattacharya, Dwaipayan, *Government as Practice: Democratic Left in in a Transforming India*, Cambridge University Press, 2017, পৃ. ৭১।

[40] Mallick, Ross, Development Policy of a Communist Government, পৃ. ৪৭।

[41] Bhattacharya, Government as a Practice Phase, পৃ. ৭২।

কৃষকরাই পার্টি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। ভূমি সংস্কারের ফলে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে যে, নির্বাচন সংঘটিত হয় তাতে এই মধ্যবিত্ত কৃষকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[42]

বামপন্থী দলগুলো গ্রামীণ স্তরে বহু শ্রেণীর মধ্যে সফলভাবে সংযোগ ঘটাতে সম্ভব হয়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধতা মধ্যবিত্ত কৃষকদের রাজনৈতিক ভাবে বৈধতা প্রদান করে। কৃষি ক্ষেত্রে যারা শ্রমিক তাঁদের দাবি-দাওয়াকে অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া হয়। যারা বা যে সকল কৃষি শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমদান করতেন তাঁদের আলাদা কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৮১ সালে বেঙ্গল কৃষক সভার পরিবর্তে সর্বভারতীয় কৃষক সভা গঠন করা হয়।[43] এই কারণে মধ্যবর্তী কৃষকরা জমির চাষবাসের সঙ্গে ও রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে যোগ হয়। কিষাণ সভার মধ্যে মধ্যবিত্ত কৃষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সি.পি.আই.(এম.)পার্টি মধ্যবিত্ত কৃষকদের দাবি-দাওয়াকে কৃষি সংস্কারের সঙ্গে বিবেচনা করেন। ২০০২ সাল পর্যন্ত বর্গাদার ও পাট্টাদারদের ৪১.৩ শতাংশ যারা সুবিধা পেয়েছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকার কৃষক।[44] বামপন্থী দলগুলো দাবি করেন যে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বেশিরভাগ কৃষককেই পরিষেবা দিতে তাঁরা সমর্থ্য হয়েছে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ৩০ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমি বন্টিত হয়েছে।[45] অপারেশন বর্গার আগে বর্গাদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের মতে বামফ্রন্ট সফলভাবে অপারেশন বর্গাকে রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে কৃষক সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁরা প্রচার করেন যে, অপারেশন বর্গার মাধ্যমে সর্বহারা (প্রলেতারিয়াত) শ্রেণীর মধ্যে ভূমি বন্টন হয়েছে। ভূমি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ক্ষুদ্র জমি বন্টিত হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে আরো খন্ডিত হয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ভূমি সংস্কারের ফলে জমি বন্টিত হয়েছে। রতন খাসনাবিস দেখান যে, জমি তপশিলি জাতি ও

---

[42] Bandopadhyay, Debabrata, Not a Gramscian Pantomime, *Economic and Political Weekly, Vol. 32, No.12,* March 22, 1997, পৃ. ৫৮১-৫৮২।

[43] Rogly, Containing Conflict and Rieaping Votes, পৃ. ২৭৩২।

[44] Government of West Bengal Human Development Report 2004, পৃ. ৩৪।

[45] Roy, Dayabati, *Rural Politics in India: Political stratification and governors in West Bengal*, Cambridge University Press 2014, পৃ. ৩৬।

উপজাতিদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।[46] পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় ২০০৬-০৭ সাল পর্যন্ত চুয়াল্লিশ লক্ষ্য ৯ হাজার ৫০২ হেক্টর কৃষি জমি বন্টিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৮১ কৃষক পরিবার এর সুবিধা পেয়েছে। যে সকল কৃষক পরিবার সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৩০.৪১ শতাংশ তপশিলি এবং ১৮.৭৫ তপশিলি আদিবাসী।[47] পশ্চিমবঙ্গের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুসারে তপশিলি জাতির ৩০.৫ শতাংশ উপকারী বর্গাদার এবং ৩৭.১ শতাংশ সুবিধা পেয়েছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে সুবিধা পেয়েছে ১১ শতাংশ তপশিলি এবং উপজাতি ১৯.৩ শতাংশ।[48] তপশিলি জাতি, উপজাতিদের মধ্যে ভূমি ব্যবস্থার বন্টন শুধুমাত্র তাঁদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমি সংস্কারের এই সফলতা রাজনৈতিকভাবে কৃষক সভার মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়। ভূমি সংস্কার কমিশন অনুধাবন করেন যে, ১ মিলিয়ন একর কৃষি জমি, ২ মিলিয়ন হীন ও ভূমিহীন গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে। আনুমানিক ০.৫০ মিলিয়ন গৃহহীন ও বাস্তহারার কৃষক বাস্ত জমি পেয়েছে। প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন পরিবার বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের সুবিধা পেয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ২.৫ ভোটার পরিবার, ৮.৭৫ মিলিয়ন ভোটার বাম শাসনের কৃতিত্ব স্বীকার করেন। ১০ মিলিয়ন ভোটার যা মোট ভোটের এক তৃতীয়াংশ সি.পি.আই.(এম.)কে এবং বামফ্রন্টকে সমর্থন করে। এক বৃহৎ সমীক্ষায় দেখা গেছে ২৪০০টি পরিবার তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায় ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে সুবিধা পেয়েছে এবং পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। এর জন্য তাঁরা বামফ্রন্টের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছেন।[49] যদিও ভূমি সংস্কার খুব ধীরগতিতে শুরু হয়েছিল ১৯৮০তে। এই প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৯৯০ দশকে। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের মতে, ৯০ হাজার বর্গাদার নথিভুক্ত করেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে, যা ৯ হাজারে নেমে আসে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৭ সালে। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৯ সালে ৯৫০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ৯৪ একর জমি

---

[46] Khasnabis, Ratan, The Economy of West Bengal, পৃ. ১০৫।

[47] Government of West Bengal, Development and Planning Department, *West Bengal Economic Review* 2006-2007, পৃ. ১০৩।

[48] West Bengal, Human Development Report 2004, পৃ. ৩৫।

[49] Pranabardhan, Sandip Mitra, Dilip Mookherjee and Abhirup sarkar, local Democracy and Clientelisam: Implications for Political Stability in rural West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol. 49, No. 9,* February 28 2009, West Bengal পৃ. পৃ. ৪৬-৫৮।

বন্টিত করা হয় ৬ শতাংশ সর্বমোট বন্টিত জমির। ভূমি সংস্কারের সুফল প্রান্তিক স্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[50] অভিরূপ সরকারের মতে, গ্রামীণ ভূমিহীনদের পরিবারের ৩৯.৬ শতাংশ ১৯৮৭-৮৮ সালে, ৪১.৬ শতাংশ ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে ১৩.২৩ শতাংশ পাট্টাদার এবং ১৪.৩৭ শতাংশ বর্গাদার তাঁদের জমি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।[51] এরফলে ১৯৯০ এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বৃদ্ধি হার কমতে থাকে। কৃষির উৎপাদনশীলতা কমতে থাকায় খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় ৬.৯ শতাংশ, ১৯৮৮ সাল থেকে ০.৮ শতাংশ হারে প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পায়।[52] ১৯৭০ সালের মূল্য বৃদ্ধি কম হলেও ১৯৯০ দশকে ২.৪শতাংশ তা বৃদ্ধি পায়।

আশির দশকে ভূমিসংস্কার ও অপারেশন বর্গা এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। গ্রামীণ এলাকার তপশিলিরা ভূমিসংস্কার করার ফলে ভূমি ও কৃষি জমির আশা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হবে। কংগ্রেসের সময় যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটে। তবে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সম্পত্তি বন্দোবস্ত অপসারিত করে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে বিধানসভার বিধায়করা প্রায় যে, দাবি করতেন তা স্পষ্ট ছিল অতিরঞ্জিত।[53] প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা ভূমির সদ্ব্যবহার করতে অপারগ ছিলেন। তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন ঋণগ্রস্থ। ফলে গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে জমিদার ও মহাজনরা থেকে যান। বিরোধী বিধায়ক সৌগত রায় যখন বিধানসভায় অভিযোগ করেন ভূমি সংস্কারের সাফল্যের দাবি আজকে ক্রমশ বস্তাপঁচা হয়ে যাচ্ছে, ব্রেক থ্রু করার সম্ভাবনা নেই, তখন ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তার প্রতিবাদ হয়নি।[54] পরবর্তী সময় বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা বিধানসভাকে জানান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব ভূমিহীন চাষী জমি

---

[50] Sarkar, Abhirup, Political Economy of West Bengal: A Puzzle and a Hypothesis, Economic and Political Weekly, Vol,41 No.4 January 28, 2006, পৃ. পৃ. ৩৪৪-৪৫।

[51] Mallick, Ross, Development Policy of a Communist Government, Political Economy of West Bengal, পৃ. ৩৪৫।

[52] Khasnabis, Ratan, The Economy of West Bengal, পৃ. ১০৬।

[53] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭০।

[54] Proceedings of the Bengal Legislative Council, 2001, Vol, 117. No. 1, পৃ. ১৪১।

পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২৭ শতাংশই জমি ধরে রাখতে পারেনি।[55] বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষিক্ষেত্র ১৯৮০ দশকে বৃদ্ধি পেলেও তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রাক্তন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বলেন যে, ‘চাষির ব্যাটা আমি। চাষবাসের বিষয়টা ভালই জানি। একটা সময় চাষ করেছি। চাষ করতে হলে কি পরিশ্রম করতে হয় তা জানি। চাষীরাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে। ছোট জমিতে চাষ করলে লাভ কোথায়। তারপর যে হারে ছেলেপুলে জন্মায় তাতে জমি ভাগ হয়ে হয়ে ছোট হয়ে যায়। হালের বলদ, সারের দাম বৃদ্ধি, আর ফসলের দাম না পেলে চাষ করে কোন লাভ নেই। আমি যখন ভূমি দপ্তরের দায়িত্বে আছি তখন লক্ষ্য করেছি অনেক জমি আন্দোলনের সময় যে জমি পেয়েছিল তা ধরে রাখতে পারিনি’।[56]

গ্রামীণ অর্থনীতি ও শ্রেণী রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু নয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতাও জাতপাতের মানুষকে পিছিয়ে দিয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতির কৃষি ফসলের মধ্যে অন্যতম হলো ধান। প্রথাগতভাবে পশ্চিমবঙ্গের তিন ধরনের ধান হয়। শীতকালে আমন, হেমন্তকালে আউশ এবং গ্রীষ্মকালে বোরো প্রধান। সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিকার্যে প্রযুক্তির ব্যবহার হয়। বীজ ও সারের সুবিধা জমিদার ও যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তাঁরাই পায়। অর্থাৎ কৃষক শ্রেণী যাঁদের হাতে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা এই নব প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে। যাঁরা বড় কৃষক তাঁরাই চাষবাসের জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পেরেছেন। উন্মুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষের খরচ অনেকটাই কমতে শুরু করে। তুলনামূলকভাবে ছোট জমিতে চাষের খরচ বৃদ্ধি হয়। এছাড়া ফসলের সহায়ক মূল্য না মেলায় এবং বড় কৃষকের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করা বেশি লাভজনক। অন্যদিকে গরীব কৃষক বর্গাদারদের, যাঁদের অর্থের যোগান ক্ষমতা সীমিত তাঁদের অবস্থার অবনতি হয়। কৃষকরা প্রথাগত কৃষি পেশা ছেড়ে দিতে শুরু করে। বেশিরভাগ তপশিলিরাই ধীরে ধীরে শহরমুখী হতে শুরু করে। দক্ষিণ বাংলায় দুটি জনসংখ্যাবহুল তপশিলি জাতি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্র। তাঁরা এই পরিস্থিতিতে কৃষি পেশা ছেড়ে দিতে থাকে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ এর মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির

---

[55] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭১।

[56] সাক্ষাৎকার, প্রাক্তন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, ভাঙ্গড়, ২০১৯।

কৃষি নির্ভরশীলতা ৫৬.৭শতাংশ থেকে কমে ৩৮.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পৌণ্ড্রদের ক্ষেত্রে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৫ শতাংশ থেকে ৩৫.৩ শতাংশে ।[57]

ঋণের দায়ে অনেকেই জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। প্রফুল্ল দাস পেশায় একজন চাষী ছিলেন। বারো মাস জমিতে চাষ করতেন। তিনি বলেন, দিন দিন ফসলের দাম কমে যাচ্ছে। ফসলের যা দাম পাই তার থেকে ফোরেরা বেশি পায়। কষ্ট করি আমরা, আর লাভ করে অন্যরা। তাছাড়া ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য কোন অনুদান পাওয়া যায় না। তার থেকে কলকাতায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করলে বেশি উপার্জন হয়। তাই কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রাজমিস্ত্রির লেবার (শ্রমিক) হিসেবে কাজ করি।[58] নতুন প্রযুক্তি অনেক কৃষকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে। ধনী ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে তফাৎ তৈরি করে অনেক দরিদ্র কৃষক কৃষি পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করে। অনেক কৃষক পরিবার গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে শহরমুখী হয়। ১৯৯০ এর দশকে ভারতের নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেক ছোট জমির মালিক ও বর্গাদাররা তাঁদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের যেসব মাঝারি কৃষক যাঁরা ভূমির উৎপাদন ব্যবস্থায় লগ্নি করতে পেরেছিলেন তাঁরাই এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষক চেতনা একান্তভাবেই খন্ডিত, নির্জীব, পরাধীন।[59]

পশ্চিমবাংলার ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ধনী চাষী ও টিউবয়েল ও পাম্পের মালিকরা ছোটদের থেকে জমি ইজারা নিয়েছিল এবং নিজেদের দখলে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি ভূমিহীন কৃষক যারা ভাড়ায় জমি নিয়েছিল তাঁরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। গ্রামীণ চাষাবাদ ব্যবস্থায় মাঝারি কৃষকদের ভূমিকা ছিল। বর্গাদার, ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক প্রতিনিধির সঙ্গে সঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থায় এরা বেশিরভাগ তপশিলি না হয়ে তপশিলি উপজাতি। ১৯৯০ দশকের পরে জমির অধিকার রক্ষার দাবি জোরালো হয়। গ্রামীণ ভাগ চাষ, ছোট চাষী, কৃষি শ্রম বর্গাদার একত্রিত হয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

---

[57] দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১০৩।

[58] সাক্ষাৎকার, প্রফুল্ল দাস, চামপাহাটি, ২০১৮।

[59] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ প্রজা ও তন্ত্র, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩, পৃ. ৪৮।

ফলে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও দিনমজুরদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত কৃষকের আয়ের সংঘাত বৃদ্ধি পায়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বহু কৌণিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল যাকে যুক্ত করেছিলেন মধ্যবিত্ত কৃষক, সেই মধ্যবিত্ত কৃষক ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী সংঘাত তৈরি হয়। যার একদিকে মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায় অন্যদিকে প্রান্তিক, ভূমিহীন, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর কৃষক সম্প্রদায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্টিকে এগিয়ে আসতে হয়। পার্টি কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে, শ্রেণী সংঘাত তৈরি হয়েছে তার সামাজিকভাবে নিরসনের প্রচেষ্টা চালায়। বামপন্থী পার্টিগুলো কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শ্রেণী সংঘাত তৈরি হয়েছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণী সংকট মতাদর্শগত ভিত্তি প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দেয়। গ্রামীণ স্তরে বামদলগুলোর যে প্রাথমিক ভিত্তি বর্গাদার, ভূমিহীন কৃষক, ভাগচাষী যারা ছিলেন তাঁদের প্রধান ভিত্তি কিছুটা হলেও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। কৃষক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মধ্যবিত্ত কৃষকদের সঙ্গে ছোট কৃষকদের এবং ভূমিহীনদের মজুরির বিভেদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার ১১০টি গ্রামকে নিয়ে প্রণব বর্ধন ও অশোক রুদ্র একটি সমীক্ষায় দুজন অর্থনীতিবিদ দেখান যে, শ্রমিকদের ভাড়া করা হয় তাঁরা মাঝারি এবং ছোট কৃষক, মধ্যবর্তী কৃষকরা জাতপাতের রীতি মেনে চলায় কৃষি ক্ষেত্রে এঁদের কাজে নিতে অস্বীকার করেন। [60] কৃষি জমির মালিকানা ভুক্ত কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন ও ঐক্যবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায় রাখা বামপন্থী পার্টির কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে অবতীর্ণ হয়। মধ্যবর্তী কৃষকেরা ধীরে ধীরে কৃষি শ্রমিকদের কাছে শত্রু হয়ে ওঠে। বামপন্থী পার্টির কাছে নতুনভাবে একটি চ্যালেঞ্জ আসতে শুরু করে শ্রেণী চেতনা জাগানোর ক্ষেত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে শ্রেণী সংগ্রামকে সংঘটিত করার জন্য। সি.পি.আই.(এম.) পার্টি খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন বুর্জোয়াজি উদ্ভবের জন্য। ভূমিহীন কৃষকরা জমির দাবি শুরু করেন এবং জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। পুনরায় ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পার্টি খুব সমস্যার সম্মুখীন হয়। জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারণ করলে সব থেকে বেশি যাঁদের স্বার্থ ব্যাঘাত ঘটবে তাঁরা হলেন মধ্যবর্তী কৃষক এবং এই মধ্যবর্তী কৃষকের নেতারাই কিষাণ সভা এবং পঞ্চায়েত পরিচালিত করেন। সাথে সাথে এই

---

[60] Bardhan and Rudra, Ashok, Labour Employment and oasis: of the Survey in West Bengal, Economic and Political Weekly, Vol.15, No.45/46, November 8 1980, পৃ. ১৯৪৩।

মধ্যবর্তী কৃষকরা, ভাগচাষীদের দ্বারা নিজেদের জমি চাষ করেন।[61] ভাগচাষীদের ও কৃষি শ্রমিকদের এই মধ্যবর্তী কৃষকদের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নতুন করে উদ্ভূত সমস্যার জন্য নতুন করে পার্টিকে সংগ্রামে অবর্তীণ হতে হয়। পূর্বের অপেক্ষায় পার্টি অনেকটা আধিপত্য বিস্তারকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে পার্টি তত্ত্বগতভাবে শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বললেও পার্টি নির্দেশিত স্বার্থকে রক্ষার জন্য এবং সামাজিক বিন্যাসকে গ্রামীণ স্তরে ধরে রাখার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের তথ্য অবতীর্ণ হন। এর ফলে পার্টি মধ্যবর্তী কৃষক, ভূমিহীন ভাগচাষীদের মধ্যে উদ্ভূত শ্রেণী বৈষম্যকে ও মজুরির প্রশ্নকে সমাধানের জন্য সমঝোতার নীতি অনুসরণ করেন। পার্টির শ্রেণীর রাজনীতির দাবিকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার রাজনীতির নিরিখে বিচার্য হয়ে ওঠে। গ্রামীণ এলাকাতে যে শ্রেণী সংঘাতের তৈরি হয় তার সুস্থ সমাধানের পথকে বেছে নেয়। Partha... in spite of the continued rhetoric of class demands, the actual practice of power, once the old propertied classes had been effectively neutralized consisted in resolving disputes, making consensus and maintaining social peace" [62] গ্রামীণ এলাকার এই সংঘাতকে নিরসন করতে না পারলে তা নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। পার্টি ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনার জন্য এবং কৃষক ঐক্যবদ্ধতাকে সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য পার্টি বিরোধীদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য যুক্তি প্রদান করেন যে, সি.পি.আই.(এম.) পার্টি কৃষক রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মধ্যসত্তার নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের মধ্যে সংযোগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[63] উদাহরণের সাহায্যে তিনি বিশ্লেষণ করেন যে মজুরির ক্ষেত্রে যখন ভূমিহীন ভাগচাষী ও শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন। কৃষি শ্রমিকরা দাবি করেন যে পার্টি

---

[61] Rudra, Ashok, Land and Power, পৃ. ৩৬৮।

[62] Chatterjee, Partha, the Coming Crisis in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.44, No.9*, February 28 2009, পৃ. 88।

[63] Bhattacharya, Dwaipayan, "Politics of Middleness: The Changing Character of the Communist Party of India Marxist in Rural West Bengal (1977 -80) In B, Rogaly, B.H. White, & S. Bose Sonar Bangla? Agricultural Growth and Agranian Change in West Bengal and Bangladesh, Sage, New Delhi, 1999, পৃ. ২৯২।

তাঁদের মজুরি নির্ধারণ করে দিক। পার্টির এই ধরনের ধর্মঘটকে জমি মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। জমির মালিকেরা অদ্ভুত ও পরিস্থিতি নিরসনের জন্য সমঝোতার পথ বেছে নেয় এবং তাঁরা মজুরির বৃদ্ধি যাতে না ঘটে পার্টির সাহায্য দাবি করেন। জমির মালিকেরা, শ্রমিকদের মজুরি যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করেন এবং শ্রমিকরা মজুরির সর্বোচ্চভাবে বৃদ্ধির দাবি জানায়। যারা জমির মালিক এবং ভূমিহীন ভাগচাষী কৃষি শ্রমিকরা পার্টির প্রতি আনুগত্য থাকায় তাঁরা ধর্মঘট স্থগিত রাখে এবং পার্টির সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। অশোক রুদ্র দেখান যে, মজুরি বৃদ্ধির এই আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রামে পর্যবসিত না করে জমির মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংযোগকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এই রাজনৈতিক সহাবস্থানের ভূমিকা পার্টি পালন করে যতক্ষণ না পর্যন্ত এর সুস্থ সমাধান না হয় এবং কৃষকদের মধ্যে যতক্ষণ না ঐক্যবদ্ধতা গড়ে ওঠে।

জমি বন্টনের সময় এবং জমি অধিগ্রহণের সময় বড় জমির মালিকরাই চিহ্নিত হতেন সেই সময় মধ্যবর্তী কৃষক বাম দলের চিহ্নিতকারি ছিল।[64] এই মাঝারি কৃষকরা ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলনের যোগদানে আহ্বান জানান। প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা যৌথভাবে বৃহৎ জমির মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় এবং বৃহৎ জমির মালিকদের 'শ্রেণী শত্রু' হিসেবেই চিহ্নিত করেন। কৃষি ক্ষেত্রে এই শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য একদিকে বৃহৎ জমির মালিক অন্যদিকে মধ্যবর্তী কৃষক, ভূমিহীন ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিক। গ্রামীণ এলাকাতে বামফ্রন্ট এইভাবে ঐক্যবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায় তৈরি করেন। [65] আন্দ্রে বেতেই দেখান যে, ১৯৬০-এর দশকের জোতদারদের চিহ্নিত করা হয় বৃহৎ জমির মালিক হিসাবে এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী আন্দোলন গঠিত হয় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। বৃহৎ সংখ্যক মাঝারি কৃষকরাই জনসংখ্যাকে সচল করার ক্ষেত্রে এবং তাঁদের শ্রেণী চেতনাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। মাঝারি কৃষকরা শত্রু হিসেবে বৃহৎ জমির মালিককে চিহ্নিত করা হয়। জমিদারি প্রথা

[64] Ruud, A. E., *Land and Power: The Marxist Conquest of Rural Berngal, Modern Asian Studies, 46 (4)*, পৃ. ৩৬৪।

[65] Dasgupta, Biplob, Agriculture Labour under Colonial and Semicollo Capitalist and Capitalist Conditions: I study of West Bengal, Economic and Political Weekly, Review of Agriculture, vol.19, No.38, September 1984, পৃ. ১৪৬।

বিলোপের মধ্য দিয়ে জমিদার ও বৃহৎ প্রান্তিক কৃষকের যে দ্বন্দ্ব তা নিরসন হয়। মধ্যবর্তী কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকরা জমিদারদের 'শ্রেণী শত্রু' হিসেবে গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক সংযোগকারী পার্টির এই ভূমিকাকে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য 'মধ্যসত্তার রাজনীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এইভাবে বামপন্থী দল কৃষক শ্রেণীকে সংযোগকারী একক হিসাবে পরিণত করেন এবং এই কৃষক ঐক্যবদ্ধতাকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যাবহার করেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সংযোগকারী ভূমিকায় নিচু জাতির লোকজনকে প্রাথমিকভাবেই কৃষক হিসেবেই গণ্য করেন, কখনোই তপশিলি জাতি হিসেবে বা দলিত হিসাবে দেখেন না। অন্যদিকে রাজনৈতিক আধিপত্যে বামপন্থীরা নির্বাচনী ক্ষেত্রে এদেরকে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যারা ভূমিহীন ও গরিব কৃষক। সি.পি.আই.(এম) পার্টি শ্রেণী সংগ্রামকে সংযোগকারী ভূমিকায় এবং কৃষক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

বাম দলগুলোর রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা

কেন পার্টি সফলভাবে রাজনৈতিক সংযোগকারী ভূমিকা পালন করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বর্তমান তথ্যগুলো বিশ্লেষণ না করে। এখানে বোঝা দরকার যে কোন বিষয়গুলো বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভদ্রলোক শ্রেণীর গ্রামীণ জমিদার ব্যবস্থার মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করেছে। জমি থেকে যে উপার্জন হয় তা দিয়ে তাঁরা শহুরে জীবন যাপন করেন। এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শহরে এক ধরনের উচ্চবিত্ত তৈরি করেন বা তৈরি হয়। এরফলে জমির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কিছুটা হলেও শীতলিত হয়। ভদ্রলোক শ্রেণীর পারিবারিক জমির লঙ্ঘিত হয়। অন্যদিকে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমির মালিকগণ পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। এই শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী শরণার্থী হিসেবে কলকাতা এবং শহরাঞ্চলে বিভিন্ন চাকরির সন্ধান করে। সুশীল সেনগুপ্ত দেখান যে, পশ্চিমবঙ্গের বড় জমিদাররা স্বাধীনতার পরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। ১৯৫৩-৫৪ সালে গড় জমির পরিমাণ ছিল ৩.০ একর যা সারাদেশে ৬.২৫ একর। সারাদেশের মধ্যে ১৫ একর জমি ১০ শতাংশ কৃষকের মধ্যে এবং ৫২.৫১ শতাংশ ভূমিহীন। পশ্চিমবঙ্গের যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল ২.৬ শতাংশ এবং ২৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বড় জমির মালিকগণ দেশভাগের পরে দুর্বল

হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে শরণার্থী চাপ ও উদ্বাস্তুতে চাপে জমির উপর প্রভাব পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন জমি ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে বামেদের ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গা জমি ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গে জমির যে, পরিবর্তন নিয়ে আসে অন্য রাজ্যে তা দেখতে পাওয়া যায় না।

এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীরা শ্রেণীকে বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করে। গ্রামীণ এলাকাতে জমিদার ভদ্রলোকদের দুর্ব্যবহারের কারণে ভূমিহীনদের মধ্যে জমির দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। সামাজিক এই বাস্তবতাকে বামপন্থীরা নিরক্ষন করেন। গ্রামীণ এলাকার এই সামাজিক দাবি যে ভূমিহীন, ঠিকা শ্রমিক ও ভাগচাষীদের মধ্যে উঠেছিল তার বেশিরভাগই হল তপশিলি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় যুক্তি প্রদান করেন যে, শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক কলকাতা কিংবা তার আশেপাশের এলাকাতেই তাঁদের সম্পত্তি এবং বসবাস করতেন। কৃষি গ্রাহকদের ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজনৈতিক সংঘাত থেকে তাঁরা দূরে থাকতেন। Being consumers of agricultural products they have remained immune from the effects any political conflicts over issues related to land and it's produce)।[66] এই ভদ্রলোক শ্রেণী নিরপেক্ষ থাকতেন কারণ তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগের জন্য। এই শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী বাঙালি রেনেসাঁসের এবং উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধারক ও বাহক। এই ভদ্রলোক শ্রেণী নিজেদের দাবি করেন তাঁরা হলো সামাজিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক কর্তৃত্বের এবং জাতিগতভাবে উচ্চবর্ণীয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সর্বদাই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী দ্বারা প্রভাবিত। তিনটি প্রধান উচ্চ বর্ণীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্য যাঁরা বিধানসভার বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক। কিন্তু অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ নেতাগণ আসেন মধ্যবিত্ত/মাঝারি জাতি থেকে। এঁরা কখনোই নিজেদেরকে রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে ভাবেন না। তপশিলিরা সর্বদাই নিজেদেরকে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন। যদিও বাম দলগুলোতে উচ্চবর্ণীয় নেতাগণ তপশিলিদের রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সি.এস.ডি.এস লোকনীতি জাতীয় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি লোকসভা ও দুটি বিধানসভাতে ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় দেখা যায় ৫৩.৫

---

[66] Chatterjee, Partha, *The Present History of West Bengal*, Oxford University Press, New Delhi 1997, পৃ. ৮১।

শতাংশ তপশিলি ভোটার, ৫৩.২৫ শতাংশ তপশিলি উপজাতি ভোটার, ৪৯.৭৫ শতাংশ অন্য অনগ্রসর শ্রেণী ভোটার বামপন্থীদের সমর্থন করেন।[67] এই নিরিখে নিম্ন জাতির ও নিচু শ্রেণীর রাজনৈতিক গতিময়তা সুক্ষভাবে বামেদের পক্ষে ছিল তা বলা যায়।

জাতপাত, রাজনৈতিক সংরক্ষণ ও গ্রামীণ রাজনীতিতে আধিপত্যের শ্রেণী রাজনীতি

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান বিশারদগনের মতে এতে অনেকটাই অস্পষ্টতা বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, নামমাত্র পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই হয়নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা যেমন রূপান্তরিত হয়েছে তেমনি তপশিলি জাতি উপজাতি সমাজের অবস্থানও পরিবর্তন হয়েছে। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন কালক্রমে বেগবান হয়ে উঠলো, তারমধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর জাতীয় ও মানসিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল।[68] সংবিধান নির্দেশিত সংরক্ষণব্যবস্থায় সরকারি চাকরি, উচ্চশিক্ষা, বিধানসভা এবং রাজ্যসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তবে ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কাঠামোতে এই একই ধরনের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তী সময় অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সালের জনতা পার্টি সরকার অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটিই বিবেচনা করার জন্য বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি.পি. মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। প্রধানত দুটি কাজ করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়, যথা-(১) সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসর শ্রেণীর চিহ্নিত করা এবং (২) এই শ্রেণীদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা। সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মোট ১১টি সূচকের উপর ভিত্তি করে কমিশন অনগ্রসর শ্রেণী চিহ্নিত করে এবং সরকারি আধা-সরকারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

---

67 Bhattacharya, Dwaipayan, *Government as a Practice: Democratic Left in a transforming India*, CUP, New Delhi, 2017,পৃ. ১৯।

68 দেশাই, এ. আর., *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, কে. পি. বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২২৫।

২৭ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের ফলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আড়াআড়িভাবে মেরুকরণ ঘটে এবং জাতপাত ভিত্তিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সংরক্ষণের ব্যাপারটি নিয়ে রাজনীতির সৃষ্টি হয়। মেরুকরণ যা শুধুমাত্র ভারতে সমাজেরই নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও মেরুকরণ ঘটিয়েছে।[69] মন্ডল কমিশনের সুপারি নিয়ে কমিউনিস্টরা দ্বিধা বিভক্ত হয়। দলিতদের মধ্যে সম্পন্ন এই (নকশালপন্থী) আন্দোলনগুলি মন্ডল সংরক্ষণকে এক গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে সমর্থন করেছে, আর শহরে শ্রমিকদের মধ্যে দৃষ্টিসম্পন্ন প্রথাগত কমিউনিস্টরা মন্ডল কমিশনের বিরোধিতা করেছে।[70] মন্ডল কমিশনের ইস্যুগুলিকে সি.পি.আই. জনতা দল পুরোপুরি সমর্থন জানায়, এমনকি সুবিধাভোগী স্তর সংক্রান্ত রায় ও তথাকথিত অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ও তাঁরা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। সি.পি.আই.(এম) কখনই মন্ডল সুপারিশের বিরোধিতা করেনি।[71] পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে মন্ডল কমিশনের তরফে জাতপাত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গে সমাজ ব্যবস্থায় ও সামাজিক কাঠামোতে জাতপাতের কোন স্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গে দুটি শ্রেণী বর্তমান। একটি দরিদ্র শ্রেণী, অন্যটি পুঁজিপতি শ্রেণী। বামপন্থীরা সর্বদাই এই পুঁজিপতিদের বিরূদ্ধে লড়াই করে এবং দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে। প্রাক্তন সি.পি.আই.এমের রাজ্য সেক্রেটারি সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন তাঁরা গরীব ও মেহনতী মানুষের পক্ষে এবং গরীব মেহনতী মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের উন্নতি ঘটাতে চায়। ডক্টর মিত্র বলেন, "To bring a change in the correlation of class forces in favour of the poor and working people and and raise class consciousness through a struggle over development."[72] ১৯৭৮ সালে যখন মন্ডল কমিশন বসে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, এ রাজ্যে কোন পশ্চাৎপদ জাতি নেই।[73] গ্রামবাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হল তপশিলি সম্প্রদায় এবং গরিব শ্রেণীর জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। গ্রামীণ মানুষ তপশিলি এবং শ্রেণীতে গ্রামীণ

---

[69] সেন, সুজিত সম্পাদনা, দলিত আন্দোলন প্রশ্নও প্রসঙ্গ, গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৩৯।

[70] সেন, সুজিত সম্পাদনা, দলিত আন্দোলন প্রশ্নও প্রসঙ্গ, গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৩৯।

[71] সেন, সুজিত সম্পাদনা, দলিত আন্দোলন প্রশ্নও প্রসঙ্গ, গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৪০।

[72] Mishra, Suryakant, An Alternative Approach to Development: Land Reforms and Panchayat, Government of West Bengal Information and Cultural Affairs Department, Calcutta, পৃ. ৯।

[73] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, জনপ্রতিনিধি, প্রবন্ধ সংকলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা,২০১৩, পৃ. ৯২।

জনগোষ্ঠী গরীব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সামাজিক কাঠামো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অগ্রগণ্য নয়। ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিম্ন জাতপাতের মর্যাদা কেন্দ্রিক সুফলই নয়, তাঁদের একত্রিত হবার কৌশলও বটে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা তাঁদের গণজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছে ।

বাম শাসনকালে জাতপাত ব্যবস্থা বিলোপ সাধন হয় নি। কিন্তু জাতপাতের চেতনার শিথিলতা হয়েছে। জাতপাতের চেতনাকে শিথিল করে শ্রেণীচেতনাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। বামপন্থী থেকে দক্ষিণপন্থী কোনো রাজনৈতিক দলই পশ্চিমবঙ্গে জাতি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। অথচ ভারতের অন্যত্র জাতি আর শ্রেণীর পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে গত ত্রিশ, চল্লিশ বছরে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে।[74] ১৯৭৭ সাল থেকে একটি সুদীর্ঘ সময় ধরে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের সরকার ও রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে। বাম শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জাতপাত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্য নিয়ে পণ্ডিতদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। বাম শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে এক বামপন্থী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল শিক্ষিত-মার্জিত বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ। এই সংস্কৃতিতে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার কোন স্থান নেই।

বামসংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও গ্রামীণ সমাজের জাতপাত বেশ সক্রিয় ছিল। বাম নীতিগতভাবে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী হলেও এর পরিবর্তে শ্রেণী ব্যবস্থাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবাংলার জাতপাতের সামাজিক প্রক্রিয়া গতিময়তা ছিল। অন্যদিকে তপশিলিভুক্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মূল্যবোধও ছিল। গ্রামীণ সমাজে তপশিলি সম্প্রদায়কে ঘিরে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরার কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। গ্রামীণ এলাকার নির্বাচনী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণহিন্দুরা নিয়ন্ত্রক ছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত তাই পশ্চিমবাংলায় শহরবাসী উঁচু জাতের আধিপত্যের ইমারতে এতটুকুও আঁচড় পড়েনি। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৩১ এর হিসাব থেকে কলকাতা শহরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ,

[74] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, জনপ্রতিনিধি, প্রবন্ধ সংকলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা,২০১৩, পৃ. ৯২।

বৈদ্যদের যে প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল ১৯৭৭ এর পর তা হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।[75]

গ্রামীণ এলাকায় জাতপাত সামাজিক সমস্যা সমাধানের থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তর বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতপাতের সংরক্ষিত আসনে তাঁদের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতো। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিংবা পার্টির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় জাতপাতের নেতাদের কোন স্থান ছিল না। জাতপাত ভিত্তিক গ্রামীণ নির্বাচন যেহেতু তপশিলি প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দলের হয়ে অংশগ্রহণ করত। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হিংসা কিংবা গন্ডগোল হলে তাঁদের মধ্যেই হত। এক্ষেত্রে জাতি চেতনার কোন স্থান ছিল না। রাজনৈতিক দলের আদর্শ ছিল তাঁদের কাছে মূল প্রেরণা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ যা কিনা তপশিলি জাতি ও উপজাতির নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে তা অনেক সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নেয়। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে বামফ্রন্ট আমলের শ্রেণী কেন্দ্রিক রাজনীতি দরুণ এ রাজ্যের দলিত আর আদিবাসীরা কোন বাড়তি সুবিধা তো পাইনি, বরং বহু ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের দলিত আদিবাসীদের তুলনায় বঞ্চিত হয়েছে।[76]

১৯৭৩ সালে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের ত্রিস্তরীও গ্রাম পঞ্চায়েতের আইন পাশ করেন। ত্রিস্তরীও পঞ্চায়েত হল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ। যে সকল প্রার্থী পঞ্চায়েতে নির্বাচিত করবেন তাঁরা রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাবেন। পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন দখল করবেন। গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রথম রাজনৈতিক প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। এর পূর্বে ১৭ বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এর আগে জমির মালিকগণ পঞ্চায়েতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতেন, গ্রামীণ এলাকার গরিব, কৃষক ও

---

[75] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, জনপ্রতিনিধি, প্রবন্ধ সংকলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা,২০১৩, পৃ. ১০২।

[76] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, জনপ্রতিনিধি, প্রবন্ধ সংকলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা,২০১৩, পৃ. ১০২।

জাতপাতের তপশিলিতে পঞ্চায়েতগুলোতে কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো না। উচ্চবর্ণীয় নেতারাই গ্রামীণ রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদান করতেন।

১৯৯৩ সালের আইন অনুসারে তপশিলি জাতি, উপজাতি মহিলাদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত লোকসভা, বিধানসভা আসন সংরক্ষণ করে। নির্দিষ্ট জনসংখ্যা অনুযায়ী তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে আসন বরাদ্দ হয়। এই তপশিলি জাতি উপজাতি মহিলাদের জন্য তিন ভাগের এক শতাংশ আসন রয়েছে, যা কিনা মোট সংরক্ষিত আসনের তিনভাগ। ১৯৯৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত একটি আসনের জন্য ৫০০জন ভোটার নির্দিষ্ট করা হয়। এবং প্রতি দুই আসনে ১০০০ ভোটার ঠিক করা হয়। অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এতে অনেক সাধারণ আসন সংরক্ষিত আসনে পরিণত হয়।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে সংরক্ষণের ফলে রাজনৈতিক উত্তরণের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। এই নির্বাচনে বামদলগুলোর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল জাতীয় কংগ্রেস। অনেক জায়গায় বাম দলগুলোর বিরুদ্ধে বামদলগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিশেষ করে সি.পি.আই(এম) এর বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে আর.এস.পি. এবং ফরওয়ার্ড ব্লক এবং দক্ষিণবঙ্গে সি.পি.আই.(এম) বিরুদ্ধে সি.পি.আই. ও এস.ইউ.সি.আই. প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। সংরক্ষিত আসনগুলোতে জয়লাভ করলেও দেখা যায় যে বোর্ড গঠনের নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা ছিল উচ্চবর্ণের নেতারাই। গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করতো উচ্চবর্ণ নেতারা।

গ্রামীণ এলাকাতে মূলত ভদ্রলোক শ্রেণী হলেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক। এই স্কুল শিক্ষকরা স্থানীয় স্তরে খুবই বিশ্বস্ত ও সম্মানীয়। সামাজিক স্তরে তাঁদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বৈধতা রয়েছে। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার পঞ্চায়েত অফিসার ৪২ শতাংশ প্রধান স্কুল শিক্ষক।[77] গ্রামীণ এলাকার শিক্ষকদের আয়ের প্রধান উৎস হল কৃষি বহির্ভূত কৃষি ক্ষেত্র থেকে তাঁদের কোন চাহিদা নেই। The fact that the main source of the income of the high school teacher was non agricultural also contributed to their political acceptibility since there were not seen as having any vested

[77] Kohli, Atul, *Parliamentary Communism and Agreeneal Reform*, পৃ. ৭৯২।

interest in land. [78] বামপন্থী পার্টিগুলো এই স্কুল শিক্ষকদের বামপন্থী মতাদর্শের ধারায় উদ্বুদ্ধ করে। বামপন্থী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই শিক্ষকগণ সামাজিক ক্ষেত্রে বামপন্থার প্রচার শুরু করেন। গ্রামীণ এলাকাতে গরীব কৃষক এবং তপশিলিদের মধ্যে এঁদের গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতুল কোহলি সহমত পোষণ করেন যে, সি.পি.আই.(এম.) গ্রহণযোগ্য মুখ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকাতে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যেও স্কুল শিক্ষকদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সূচিত হয়নি। অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয় কিংবা নিম্নবর্ণীয়দের অবস্থান একই থাকে। তাহলে যাঁরা ভূমিহীন ভাগচাষী তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান কি? এক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষকরা 'মধ্যবিত্ত কৃষক' নয় কিংবা পেটি বুর্জোয়া প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভুত। এই শিক্ষক সমাজ সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণ যোগ্য। অতুল কোহলি সমীক্ষার সাহায্যে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ৮.৩ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের জমির পরিমাণ ২ একর, ৬৯ শতাংশ ২-৫ একর, ১৯.৪ শতাংশ, ৬ থেকে ১০ একর, ২.৮ শতাংশ ১০ একরের বেশি জমির মালিক নেই বললে চলে। কেউ জমিতে পারিবারিক শ্রমিক ব্যবহার করেন না। ৮৩.৩ শতাংশ ভাড়া করা শ্রমিক ব্যবহার করেন এবং ৬০.৭ শতাংশ ভাগচাষীদের ব্যবহার করেন। [79] পঞ্চায়েতের নেতাগণ বেশিরভাগ মধ্যবর্তী শ্রেণী থেকে উঠে আসছেন এঁরা মূলত মাহিষ্য, সদগোপ, আগুরী। Echeveeri-Gent মেদিনীপুর জেলার সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ৩৬ জন প্রধানের মধ্যে ২৩ জন মধ্যবর্তী জাতি থেকে এসেছে। ১৫জন প্রধানস্থানীয় প্রভাবশালী মহিষ্য সম্প্রদায় থেকে এসেছে। ৩৬জন প্রধানের মধ্যে ২০জন প্রধান স্কুল টিচার।[80] এইভাবে প্রাথমিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে তুলে ধরে উচ্চবর্ণীয়দের সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখে।

১৯৯৩ সালের ৭৩ সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে পঞ্চায়তগুলোতে তপশিলি জাতি উপজাতি ও মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে গ্রামীণ স্তরে ভদ্রলোক পার্টির প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। এঁরা সর্বদাই পার্টির নেতৃত্বকে

---

[78] Bhattacharya, Dwaipayan, Civic Community and Its Margins: School Teacher in Rural West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.36, no.8,* February 24 2001, পৃ. ৬৭৭।

[79] Kohli, Atul, The State and Property, পৃ. ১১১।

[80] Gent, Echeveeri, *Public Participation and Poverty Alleviation*, পৃ. ১৪১১।

উচ্চনেতৃত্ব দ্বারা ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় প্রভাবিত করেন। While making decisions always controlled and guided by party leaders of higher social and ritual status.[81] সুকান্ত ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলির সামাজিক মর্যাদার পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত ৫জন প্রধান আগুরি থেকে এসেছেন। যাঁরা সামাজিক মর্যাদায় মধ্য ও ধনী কৃষক। একজন শুধুমাত্র বাগদি সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়। ২জন বাগদি, ২জন আগুরি এবং ১জন ধোপা নির্বাচিত হয়। ২জন হল কৃষি শ্রমিক, অন্য সকল প্রধানরা ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষক। ১জন বাগদি পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েত প্রধান হন। পঞ্চায়েতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে রাজনৈতিকভাবে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উত্থান ঘটে।[82] কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার উত্তোলন হয়নি। স্থানীয় শাসনব্যবস্থাতে নিচু জাতি ও নিচু শ্রেণীর ধারাবাহিক উত্থান হতে থাকে। দয়াবতী রায় তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, সমসাময়িক গ্রামীণ কাঠামোতে এবং প্রান্তিক স্তরের গণতান্ত্রিক পরিসরে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য উচ্চবর্ণের প্রভাব অন্যভাবে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাঁরা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের কারিগরে পরিণত হন। কালিপুর গ্রামের তপশিলি প্রধান দলীয় নেতৃত্বের প্রতি নির্ভরশীল। শুধুমাত্র পার্টির বিষয়েও নয়, পঞ্চায়েতের কর্ম সম্পাদনার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ পঞ্চায়েত এলাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের এলাকাতে সি.পি.আই.(এম.) জোনাল সেক্রেটারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তপশিলি প্রধানরা শুধুমাত্র অফিসিয়াল প্রধান। কিন্তু পার্টির সেক্রেটারি ও পার্টির সদস্যরা হলেন নির্ণায়ক সিদ্ধান্তর অধিকারী। গ্রামীণ এলাকাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উচ্চবর্ণ দুটোই ক্ষমতাশীল দল বা শাসক দল প্রধান গুরুত্ব পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। The two upper caste leaders from the neighbouring village, one Brahman and another Kayastha exercise power in the village affair though they and the Pradhan held the same position in the ruling party. এছাড়া তপশিলি সম্প্রদায়ের

[81] Acharya, Poromesh, Panchayats and the Lake Politics in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.28, No.22*, May 1993, পৃ. ১০৮১।

[82] Bhattacharya, Sukanto, Caste, Class and Politics in West Bengal, Economic and Political Weekly, Vol.38, No,3, January 18, 2003, পৃ. পৃ. ২৪২-২৪৬।

রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও কম। ঘটক ও ঘটক তিনটি জেলার কুড়িটি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে দেখান যে ১২ শতাংশ ভোটার গ্রাম সভা এবং গ্রাম সংসদে উপস্থিত হন। এঁদের বেশিরভাগ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং নিচু জাতের মহিলা ভোটার, উঁচু জাতের উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে তপশিলিদের থেকে বেশি। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের পদ্ধতিতে মূলত প্রধান নেতৃবর্গের আধিপত্য রয়েছে। গ্রামীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হতো শিক্ষিত সামাজিক ও উচ্চবর্ণীয়। কিন্তু তপশিলিরা নতুন করে রাজনৈতিক উচ্চবর্গে উত্তরণ শুরু হয়। তার প্রধান কারণ হলো শিক্ষাগত ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাঁদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, তপশিলিদের এরকম উত্তরণ ঘটা সত্ত্বেও তাঁরা নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেনি। বরং অন্য দলের ছত্রছায়ায় তাঁদের রাজনৈতিক উত্তোলন ঘটেছে। উচ্চবর্ণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রয়েছে। ভদ্রলোক শ্রেণী গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে সরে গেলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। এই ভদ্রলোক শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থার উপরে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নয়। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার এরা একাধারে পার্টিতে একাধিপত্য বিস্তার করে এবং পার্টির প্রভাবিক ক্ষমতার মাধ্যমে সমাজকে প্রভাবিত করে। এইভাবে বামপন্থী দলগুলো উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্ববর্গের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় এবং গরিব নিম্ন জাতি বামপন্থীদের ও নেতাদের এই নেতৃত্ব কখনোই অস্বীকার করেনি। মুকুলিকা ব্যানার্জি, বীরভূম জেলার ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, উচ্চবর্ণীয় দলীয় নেতৃত্ব নিম্নজাতির সমাজব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

বামপন্থী দলগুলো এইভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং সামাজিক স্তরের প্রত্যেকটি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, স্কুল স্পোর্টস ক্লাব, ট্রেডার অ্যাসোসিয়েশনগুলোর উপর পার্টি কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে পার্টির আধিপত্য বৃদ্ধি পায় যাকে 'পার্টি সোসাইটি' বলা হয়। 'পার্টি সোসাইটি' গ্রামীণ এলাকাতে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তার ওপর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামীণ এলাকায় জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতি

জাতপাতের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে নেই একথা সম্পূর্ণভাবে বলা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত নিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হলেও মানসিকভাবে জাতপাতকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি। জাতপাতের কিংবা শ্রেণীর রাজনীতির বৈচিত্র বর্তমান আছে। গ্রাম বাংলার মধ্যে সব জেলাতে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে তবে এটা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির বৃহৎ অংশ গ্রাম ।

তপশিলিদের বেশিরভাগ মানুষ বাংলার মাছ ধরা, কাঠের কাজ করা, মাছ বিক্রি করা, চর্মকার, মেথর প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত। চর্মকার, মেথর, ধোপা বড় অংশই তাঁদের পেশার সঙ্গে শহরের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। বামশাসনকালে এঁদের পেশার সঙ্গে জাতপাতের রাজনীতি না করে শ্রেণীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গ্রামীণ এলাকার তপশিলিদের তাঁদের পেশার সংযুক্তি না করে এদের কৃষক ও শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হয়। নমঃশূদ্র, রাজবংশী সম্প্রদায় গ্রামীণ কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং এঁদের বেশির ভাগ গ্রামে বসবাস করে গ্রামের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে সামাজিক জীবনে জাতপাতের প্রভাব ছিল। এম.কে. চন্দ্র এর আলোচনায় গ্রামের ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী একই সঙ্গে শহরের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সঙ্গে আন্দোলনের অংশীদারী হয়। নিম্নশ্রেণীর হিসেবে উভয়ই ভূস্বামী, সামন্ত জমিদার, ধনী কৃষক বা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। একই সাথে তিনি দেখান উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষদের একটি অংশ দরিদ্র ও বেকার হওয়া সত্ত্বেও কৃষি কাজে অংশ না নিয়ে বিকল্প কাজের সন্ধান করে।[83]

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিরা হলো গ্রামের প্রাথমিক উৎপাদক। বামদলগুলো এঁদের উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে গণ্য করতো। গ্রামীণ জীবনে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল অর্থাৎ গ্রাম বাংলার তপশিলিদের আলাদা সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। এর সঙ্গে বামদলগুলো তাঁদের মতাদর্শগত নীতি মিশ্রণ ঘটিয়ে গ্রাম বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ তপশিলি জাতির। সুতরাং জাতপাতের শ্রেণীকরণ

---

[83] Chandra, N.K, Agricultural Workers in Burdwan Guha, Ranajit ed. *Subaltern Studies, Vol. II*, OUP, Delhi, 1984.

গ্রামবাংলা থেকে শুরু হয়। গ্রামবাংলার শ্রেণীকরণ হলে শহরের জীবনে জাতপাতের রাজনীতি সম্পূর্ণ বিলোপ হয়েছে তা বলা যায় না।

শহরের মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী মানুষ বসবাস করলেও জাতপাতের বেড়াজাল থেকে তাঁরা কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি। জাতপাতের অল্প সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত চাকরীজীবি হলেও তাঁদের শহরের জীবনের নানা সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল উচ্চবর্ণীয় ধনীশ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাম শহরে বুদ্ধিজীবীরা জাতপাতের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনীতি তৈরি করেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণী জাতপাত বিশ্বাসী নয় কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের জাতপাতের প্রভাব ছিল। বাঙালি রাজনীতি মানেই হলো ভদ্রলোক শ্রেণীর রাজনীতি এই রাজনীতিটা জাতপাত নিরপেক্ষ এবং সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৭৮ সালে হিতেশ রঞ্জন সান্যাল *সোশ্যাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল* (Social Mobility in Bengal) গ্রন্থে দেখান যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বাংলার পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন জাতিগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলে তাঁরা উচ্চবর্ণের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। এমনকি উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য দানের মাধ্যমে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁদের নবলব্ধ সামাজিক মর্যাদার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[84] শহরে শ্রমিকশ্রেণীর যোগান তপশিলিদের দ্বারা পূরণ করা হতো। শহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ, গাড়ি চালানো, মাছ, সবজি বিক্রি, রিকশাচালক প্রভৃতি কাজে তপশিলিরা যোগান দেয়। শহরে ভদ্রলোকের পাশাপাশি এরা নিজেদের সংগঠন তৈরি করে। তবে এই সংগঠনগুলো কখনোই জাতের ভিত্তিতে নয় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন তৈরি হয়। যার নিয়ন্ত্রক হলেন বামদলের শ্রমিক নেতাগন। এই নেতার বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্ণের। শহরের ওদের কাছে এরা ছিল ব্রাত্য ও গুরুত্বহীন। শহরের কলোনি এলাকার বেশিরভাগ মানুষ তপশিলি জাতির উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের অনেকেই ভালোচোখে দেখতো না ।

শহরের কলোনিগুলোতে এঁদের উপর মানসিক অত্যাচার করা হতো। মনোরঞ্জন বেপারী ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন গ্রন্থে লেখেন যে শহরে কলোনিতে তাঁদের বসবাসের অধিকার ছিল না। পার্টির লোকজন ঠিক করতো কারা জমি পাবে। স্বজাতি নেতাদের ধরে জবরদখল কলোনিতে নিজেদের বসবাসের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। জবরদখল কলোনিগুলোতে নিচু জাতের, জেলে,

[84] Sanyal, Hitesranjan, *Social Mobility in Bengal*, Calcutta 1981.

মুচি, নমঃশূদ্রদের দেওয়ার নিয়ম ছিল না। কলোনিগুলি স্থাপনের প্রাথমিক শর্ত ছিল এখানে শিক্ষিত ভদ্রলোক ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।[85] আর কোন প্রতিবাদ করলে তাঁদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হতো। ২০১০ সালে প্রকাশিত যতীন বালা শিকড় ছেঁড়া জীবন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু গুলিতে নিম্নবর্ণের মানুষের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ক্যাম্পের সরকারি কর্মীরা বর্ণহিন্দু। তাঁরা আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখলে আনন্দ পায়... তাঁদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে ক্যাশ ঢোল কেটে নিতো। সেই ইতিহাস চিরকাল অজানাই রয়ে গেছে।[86]

পর্যবেক্ষণ

জাতপাত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের সংবিধানে জাতপাতের অবসানের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির উত্তরণ ঘটেছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জাতপাত রাজনীতি যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতি ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ব্যবস্থা অন্য রাজ্যের মত প্রকট না হলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণীয় বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদগণ পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সামাজিক অংশকে জাতপাতের পরিবর্তে শ্রেণীর ধারণা দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণীর রাজনৈতিক তত্ত্বকে প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে জাতপাতের রাজনীতিকে নিষ্ক্রিয় করেছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতপাতের গোষ্ঠীকে সকল রাজনৈতিক দল নিজেদের নেতা হিসেবে সামনে তুলে ধরেছেন। সব রাজনৈতিক দলই এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে যে সকল তপশিলি সংখ্যায় কম তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সকল রাজনৈতিক দলের দ্বারা অবহেলিত হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় কিছু তপশিলি সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন।

---

[85] ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, কলকাতা পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.পৃ. ৪৮-৪৯।

[86] বালা, যতীন, শিকড় ছাড়া জীবন, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৯৩।

বিশেষকরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও দক্ষিণবঙ্গে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন অন্য তপশিলি সম্প্রদায় তা করতে পারেনি। বাগদি, বাউরি, মুচি, মেথর, মাল ও অন্যান্য তপশিলিরা রাজনীতিতে অবহেলিত হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিদের ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে রাজনৈতিক ক্ষমতা আবর্তিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা ক্ষমতার অলিন্দে যেমন থেকেছেন দক্ষিণবঙ্গে তেমন নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রসম্প্রদায় ক্ষমতা ভোগ করেছেন। ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতা থাকায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিরা নিজেদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়নি। বাম আমলে বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিকগণ শ্রেণী রাজনীতির মাধ্যমে তপশিলিদের নিয়ন্ত্রণ করেছে।

গ্রামবাংলায় কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে শ্রেণীর পার্থক্য থাকলেও তা কখনো জাতপাতের নিরিখে বিবেচিত হয়নি। এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র তপশিলিদের সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। বাম আমলে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ও মন্ত্রিসভায় তপশিলিদের আনুপাতিক অবস্থান ছিল খুবই কম। মন্ত্রিসভায় ক্ষমতায় কয়েকটি সম্প্রদায় কিছু মন্ত্রিত্ব দেওয়া হলেও সামগ্রিক বিচারে বেশিরভাগ তপশিলিরা অবহেলিত থেকেছেন। তাছাড়া রাজনৈতিক শীর্ষে যেসকল তপশিলিরা ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন পার্টির আস্থাভাজন এবং পার্টির নির্দেশিত নির্দেশেই তাঁরা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পার্টি স্বার্থকেই প্রধান শর্ত হিসেবে দেখেছেন। নিজেদের সম্প্রদায়ের বা জাতপাতের স্বার্থকে প্রধান হিসেবে না দেখে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতপাতকে ব্যবহার করেছেন। এতে সার্বিকভাবে তপশিলিদের জাতপাতের উন্নয়ন ও মূল সমস্যাগুলির সমাধান কার্যত অধরা থেকে গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কৌশল

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত আত্মপরিচিতি ও জাতপাত রাজনীতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মপরিচিতি রাজনীতির উত্থান (গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী) ঘটলেও অন্যান্য রাজ্যের মতন তা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি ১.৯০ কোটি তপশিলি যারা মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে জনসংখ্যার দিক দিয়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জাতপাতের 'ভোটব্যাঙ্ক' যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছে তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। বাম কিংবা ডান যে দলই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে তাদের প্রতি জাতপাতের সমর্থন ছিল। অথচ রাজনৈতিক উচ্চপদে কোন নিচু জাতপাতের প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক উচ্চপদ বলতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ 'মুখ্যমন্ত্রী' কিংবা 'উপমুখ্যমন্ত্রী' কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রককে বোঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উঁচু পদে ও নেতৃত্বদানে ভদ্রলোক শ্রেণীকেই দেখা যায়। বামপন্থীদের শ্রেণী রাজনীতিতে ক্ষমতার উচ্চপদে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভদ্রলোক শ্রেণী ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালিত হতো। বাম ভদ্রলোক আধিপত্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ও আত্মপরিচিতির রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বামপন্থীরা কিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য কায়েম করেছেন? জনসংখ্যার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও তপশিলিরা কেন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করতে পারে নি? বাম শাসনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন কি জনকল্যাণমুখী ছিল? কৃষি উৎপাদন পরিকাঠামো ও সংস্কারের সুফল গরিব সর্বহারা শ্রেণীরা পেয়েছিলেন কিনা? গ্রামের তপশিলি সম্প্রদায় কিভাবে এই

কৃষি সংস্কারের মধ্য দিয়ে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

জাতপাত ভিত্তিক জনবিন্যাস

২০১১এর জনগণনার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতিগুলিকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[1] ক. এক লক্ষের বেশি জনসংখ্যার তালিকায় তেইশটি তপশিলি জাতি বিদ্যমান। ক্রমানুসারে এগুলি হল-বাগদি, বাউরি, ভুঁইয়া, চামার, ধোবা, ডোম, হাড়ি, জালিয়া কৈবর্ত্য, ঝালোমালো, কাদরা, কাউড়া, খয়রা, কোনাই, লোহার, মাল, নমঃশূদ্র, পালিয়া, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, রাজওয়ার, শুঁড়ি, তিয়র, চাঁই প্রভৃতি। খ. পঞ্চাশ হাজারের বেশি এবং এক লক্ষের নীচে জনসংখ্যার তালিকায় সাততি তপশিলি জাতির অবস্থান। সেগুলি হল ভুঁইমালি, বিন্দ, দোসাধ, কামি (নেপালি), কেউট, মল্ল, নুনিয়া প্রভৃতি। গ. পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে অবস্থিত তপশিলি জাতির সংখ্যা সাত। এঁরা হলেন- করেঙ্গা, কোটাল, মাহার, পান, পাসি, পাটনি, তুড়ি প্রভৃতি। ঘ. দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে আটটি তপশিলি জাতি-বাইতি, ভোগতা, দামাই (নেপালি), ঘাসি্, কাদার, কোচ, মুশহার, সরকি (নেপালি)- আছে। ঙ. একহাজার থেকে দশহাজারের মধ্যে আছে বাহেলিয়া, বেলদার, চৌপাল, দোয়াই, ঘোনড়ি, হালালখোর, খটিক, কোনওয়ার, নট প্রভৃতি জাতি। চ. এক হাজারের নিচে আছে বানতার, ডাবগার, কাঞ্জর, কুড়ারিয়ার ও লালবেগি জাতি।

২০১১ সালের জনগণনা ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের দলিত সম্প্রদায়ের বন্টন

জনসংখ্যা	জাতির নাম	জাতির সংখ্যা
১,০০,০০০এর বেশি	বাগদি, বাউরি, ভুঁইয়া, চামার, ধোবা, ডোম, হাড়ি, জালিয়া কৈবর্ত্য, ঝালোমালো, কাদরা, কাউড়া, খয়রা, কোনাই, লোহার, মাল, নমঃশূদ্র, পালিয়া, পৌণ্ড্র/পোদ, রাজবংশী, রাজওয়ার, শুঁড়ি, তিয়র, চাঁই	২৩

[1] সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসিএসটি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

৫০ হাজারের বেশি এবং ১,০০,০০০ এর কম	ভুঁইমালি, বিন্দ, দোসাধ, কামি (নেপালি), কেউট, মল্ল, নুনিয়া	০৭
২৫ হাজার থেকে ৫০হাজারের মধ্যে	করেঙ্গা, কোটাল, মাহার, পান, পাসি, পাটনি, তুড়ি	০৭
১০ হাজার থেকে ২৫ হাজারের	বাইতি, ভোগতা, দামাই (নেপালি), ঘাসি, কাদার, কোচ, মুশহার, সরকি (নেপালি)-	০৯
০১হাজার থেকে ১০হাজারের মধ্যে	বাহেলিয়া, বেলদার, চৌপাল, দোয়াই, ঘোনড়ি, হালালখোর, খটিক, কোনওয়ার, নট	০৯
০১ হাজারের নিচে আছে	বানতার, ডাবগার, কাঞ্জর, কুড়ারিয়ার ও লালবেগি জাতি।	০৫

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসসি এসটি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ব্যবস্থার ভৌগোলিক জনবিন্যাস খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তপশিলিরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে। তপশিলিদের দুই-তৃতীয়াংশ আটটি জেলাতে বসবাস করতে দেখা যায়। এই জেলাগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১২.২ শতাংশ, বর্ধমান জেলায় ১০.৪ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৯.৯৭ শতাংশ, মেদিনীপুর জেলার ৮.৫৪ শতাংশ, নদীয়া জেলার ৭.৪০ শতাংশ, জলপাইগুড়ি জেলায় ৬.৭৭ শতাংশ, কোচবিহার ৬.৭৩ শতাংশ, হুগলি জেলায় ৬.৪৪ শতাংশ।[2] জেলাগুলোর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত। এই জেলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকা হলেও কিছুটা শহর অঞ্চল রয়েছে। বর্ধমান জেলার একটি অংশ বিস্তৃত শিল্প অঞ্চল ও অন্য অঞ্চল সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান হিসেবে বিবেচিত। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কোচবিহারে অধিকাংশ গ্রাম এলাকা হলেও

[2] ২০০১ সালে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান এবং ২০১৯ কোচবিহার জেলা আলিপুরদুয়ার জেলা ভাগ করা হয়েছে। এখানে অবিভক্ত জেলার কথা বলা হয়েছে।

কিছু কিছু অঞ্চলে শহর ও ছোট পৌরসভা রয়েছে। সামগ্রিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ তপশিলি জাতির সদস্যরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন।

সারণি:৫.১. পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে জনসংখ্যার বন্টন (মোট তপশিলি জনসংখ্যার শতকরা)

বাউরী	বাগদি	চামার	নমঃশূদ্র	রাজবংশী	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
বর্ধমান	হুগলি	বর্ধমান	নদীয়া	কোচবিহার	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
(৩০%)	(২১%)	(২৪%)	(২৫%)	(২৯%)	(৬৩%)
বাঁকুড়া	বর্ধমান	উত্তর ২৪ পরগনা	উত্তর ২৪ পরগনা	জলপাইগুড়ি	উত্তর ২৪ পরগনা
(২৮%)	(২১%)	(১৪%)	(২৫%)	(২৪%)	(২০%)
পুরুলিয়া	মেদিনীপুর	বীরভূম	জলপাইগুড়ি		
(১৯ %)	(১৪ %)	(১৪%)	(১৪%)		
হুগলি	বীরভূম	নদীয়া	বর্ধমান		
(১০%)	(৯%)	(৯%)	(৭%)		
বীরভূম	বাঁকুড়া				
(৭%)	(৯%)				

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, এসসি এসটি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। রাজবংশী সম্প্রদায় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলায় সংখ্যাধিক্য। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনায় সংখ্যাধিক্য। বাগদি সম্প্রদায় হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ায় সংখ্যাধিক্য। চামার সম্প্রদায় বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, নদীয়া জেলায় সংখ্যাধিক্য। অন্যদিকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি ও বীরভূম জেলায় বাউরি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য। কোন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় সবকটি জেলায় সমানভাবে বিন্যস্ত নয়। অর্থাৎ তপশিলিদের

জনবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এক এক জেলাতে এক এক তপশিলি জাতির জনঘনত্ব ও জনবিন্যাস বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার বৈচিত্র্য রয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় জাতপাতের রাজনীতি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল ও নির্বাচনী রাজনীতিতে কংগ্রেসের বিরূদ্ধে কৌশল গ্রহণ করেছিল। যা ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক রাজনীতি থেকে অনেক বেশি গঠনমূলক ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তফশিলভুক্ত জাতির সংখ্যা বিভিন্ন। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের নথিভূক্ত তপশিলি জাতির সংখ্যা ৫৯ টি। এঁদের মধ্যে ৫ টি তপশিলি জাতির সংখ্যা ৫ শতাংশের বেশি। কিছু কিছু তপশিলির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে এঁদের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৭৬৮। এটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২১.৯৯ শতাংশ। দেশভাগের সময় তপশিলিদের একটি বিরাট অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে আসায় তপশিলি জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগের সময় বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭১ সালে তপশিলিদের আনুপাতিক হার ছিল ১৯.৯০ শতাংশ। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন বাংলাদেশে হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলিদের সংখ্যা ২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তপশিলিদের বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক কারণ থাকলেও বর্ণহিন্দুদের তুলনায় তপশিলিদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি। এছাড়া সরকারি সুবিধা ভোগের জন্য তপশিলি জাতি রূপে অনেকে পরিচয় দিত। পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষ তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

তপশিলি জাতিদের অধিকাংশই গ্রামবাংলায় বসবাস করে। তুলনামূলক হারে গ্রামীণ জীবনে উচ্চবর্ণের বসবাসের সংখ্যা অনেকটাই কম। অপরদিকে তপশিলিদের শহরে বসবাসের সংখ্যা অনেকটা কম। এর মূল কারণ হলো তাপশিলিদের অধিকাংশই কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দিকে পিছিয়ে থাকায় এঁরা অকৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। তবে শহরে তপশিলিদের যে অংশ বসবাস করেন তার অধিকাংশই শ্রমিক, কল কারখানা, গাড়ি চালক, রিকশা চালক, শহরের ময়লা পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার, প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত। শহরের উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের লোকরা অনেকেই সরকারি কর্মচারী শিক্ষক অধ্যাপক ব্যাংক কর্মচারী সাংবাদিক প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীন জনসংখ্যার ৮০.৬ শতাংশ তপশিলি জাতি এবং তপশিলি জাতির ১২.৪ শতাংশ শহরে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসী জনসংখ্যা মোটেই কম নয়। ভারতের

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়ও পশ্চিমবঙ্গের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা অনেকটাই বেশি। মোট জনসংখ্যার ২৬.৪৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করেন। যার অধিকাংশই উচ্চবর্ণীয় উচ্চবিত্ত। শহরে বসবাসকরা তপশিলি জাতির মানুষরা উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণীয়দের শ্রমের জোগানদাতা হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বার্ষিক আয়, মাথাপিছু আয়, মানবিক উন্নয়ন সবদিক দিয়ে তপশিলি অনেকটাই পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মোট শিক্ষিতের হার ৪০.৯ শতাংশ। আর তপশিলিদের শিক্ষার হার ২৪.৩৭ শতাংশ। শহর ও গ্রামের তপশিলিদের শিক্ষার হার গড় শিক্ষার হারের চেয়ে অনেকটাই কম। গ্রামের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শহরের শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে গড়ে শিক্ষিতের হার ৩৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে শহরের তপশিলিদের শিক্ষিতের হার ২২.২৬ শতাংশ। শহর অঞ্চলের শিক্ষিতের হার ৬২.৬৮ হলেও তপশিলি ছেলেদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৩৬.৭৫ শতাংশ।[3]

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা তাদের শ্রেণীর রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই তপশিলি জাতির। তপশিলিদের শ্রমিক সংখ্যা ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫৪৪। অর্থাৎ ২৯.৫৬ শতাংশ তপশিলি শ্রমিক। এঁদের মধ্যে ৪২.৬৫ শতাংশ হলো ভূমিহীন কৃষক ৩০.১৭ শতাংশ হলো ভাগচাষী। গ্রামাঞ্চলের তপশিলিদের একটি অংশ কারখানার কাজ, গৃহ নির্মাণ কাজ প্রভৃতি অসংগঠিত পেশার সঙ্গে যুক্ত। এঁদের সংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ। বাকি ৩১ শতাংশ শ্রমিক বিচ্ছিন্নভাবে ছোটখাটো কারখানা ও দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। তবে যাঁরা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে আবার বেশির ভাগই হলো ছোট ও মাঝারি কৃষক। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে তপশিলিদের একটি সারণি নিচে দেওয়া হল-

বিষয়	সাধারণ	তপশিলি
পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসমষ্টি	৫৪,৫৮০,৬৪৭	১২০০০,৭৬৮
শতকরা হার	৭৯.০১	২১.৯৯
শহরে বসবাসকারী হার	২৬.৪৮	১২.৪০

[3] সমীক্ষার তথ্য

গ্রামে বসবাসকারী	২৩.৫২	৮৭.৬০
শিক্ষিতের হার	৪০.৮৮	২৪.৩৭
শহরে শিক্ষিতের হার	৬২.৮০	৩৬.৭৫
গ্রামে শিক্ষিতের হার	৩৩.০০	২২.৬২

সূত্র: ১৯৮১ সালের জনগণনা

শ্রমিক সংখ্যা	৩,৫৪৭,৫৪৫
জাতের তপশিলি জাতি দের শ্রমিকের শতকরা হার	২৯.৫৬
কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত তপশিলি দের হার	৭২.৮২
ভূমিহীন কৃষক	৪২.৫৭
কৃষক।	৩০.১৭
অন্যান্য শ্রমিক	২৭.১৮

সূত্র: ১৯৮১ সালের জনগণনা

বামপন্থী ও শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব

বামপন্থীরা রাজনীতির দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করেন। রাজনৈতিক কৌশলে তারা শ্রেণীকে অর্থাৎ শ্রেণীর রাজনীতিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। কংগ্রেসের সংকীর্ণ ও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি প্রথা, শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বামপন্থীরা শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি করেন। এই শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে এক অভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ পরিচিতিসত্তার নিরিখে নয়, জাতপাত ধর্ম কিংবা কোন সম্প্রদায়ের নিরিখে প্রতিনিধিত্ব নয় বরং অভিন্ন শ্রেণী হিসেবে তারা প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব তৈরি করতে থাকেন। বামপন্থী নেতা প্রকাশ কারাত মনে করেন যে, "পরিচিতি সত্তা নির্ভর রাজনীতির নিরিখে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণীকে ভাঙা যায়। নারী পুরুষের ভিত্তিতে, দলিত ও অন্যান্য জাতপাতের ভিত্তিতে এবং ভাষার ভিত্তিতে এবং জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতে। তার মানে কার্যত শ্রমিক শ্রেণী অথবা কৃষক, কৃষি

শ্রমিক ইত্যাদির মত অন্যান্য শ্রেণী পরিচয়ের নেতিকরণ”।[4] এই খন্ডীকরণ শ্রেণী রাজনীতির পরিবর্তে বামফ্রন্ট অভিন্ন নেতৃত্ব তৈরির কৌশল অবলম্বন করে। শ্রেণী ঐক্য ও সংঘটিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই বামফ্রন্ট ক্ষমতার রাজনীতিতে আসার পিছনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন ছিল প্রধানত ত্রিমুখী। প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল জাতীয় কংগ্রেস। এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের সি.পি.আই. (এম.), ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. সি. পি. আই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের এই ছয় দলের সাথে কংগ্রেস ও জনতা দলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে জনতা দলের জোট প্রস্তাব থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। এই নির্বাচনে ৩৫.৩৬ শতাংশ ভোট ও ১৭৮ টি আসন সি.পি.আই.(এম.) একাই পায় ।[5]

বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পরে ঘোষণা করেন যে, বামফ্রন্ট সরকার গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের হয়ে লড়াই করবেন। বামফ্রন্ট শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা আসীন করে কিংবা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার পরিচালনা করবে না। বামপন্থীরা যেহেতু শ্রেণীর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাই অর্থনৈতিক অধিকার, শ্রমজীবি ও গরীব মানুষের অগ্রাধিকার দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। ক্ষমতায় আসার পূর্বে বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস আমলের জমিদারি প্রথার বিলোপ ও ভূমি সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সরকার গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পূরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। ভূমি সংস্কার এবং ভাগচাষীদের উচ্ছেদ রোধের জন্য বর্গা নথিভূক্তকরণের কাজ সরকার শুরু করেন। গ্রাম এলাকার সাধারণ মানুষ এতে সরকারের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। গ্রামীণ এলাকায় যেহেতু জাতপাতের বেশিরভাগ মানুষ বসবাস করেন এবং জাতপাতের বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত সেহেতু ভূমি

[4] কারাত, প্রকাশ, *পরিচিত সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩, পৃ. ৩।

[5] Banerjee, Dilip, *Election Recorder: An Analytical Reference West Bengal 1862 2012,* Star Publication House, Kolkata, 2012, পৃ. ৯৭৯।

সংস্কারের আশায় তারা অনেকটাই উৎসাহিত হয়। গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীন মানুষের এবং বর্গাদারের বেশিরভাগই তপশিলি ভুক্ত এবং ভাগ চাষীদের উচ্ছেদ রোধের জন্য বর্গা নথিভুক্তকরণ শুরু হলে গ্রামীণ এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের ভিত্তি আরো মজবুত হয়ে ওঠে। নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন যে, "প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঘোষিত ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে ২১ দফার পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। বাকি ১৫ দফা কর্মসূচি রূপায়ণ করা গিয়েছিল আংশিকভাবে। গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের পথকে সুনিশ্চিত করার জন্য ভূমি সংস্কারের কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছিল। একই সঙ্গে, ভাগচাষীদের উচ্ছেদ রোধের জন্য অপারেশন বর্গা চালু করা, ক্ষেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, গ্রামে মহাজনি প্রথা অবসানের উদ্দেশ্যে কর ও ঋণভারের সুরাহা করার কাজ শুরু হলো"।[6] অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট তাদের সাংগঠনিক এবং মতাদর্শগত দিক গ্রামীণ এলাকায় আরো মজবুত করে তোলে। ১৯৭৮ সালের ৪ ই জুন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনে তিনটি স্তর মিলিয়ে মোট ৫৫ হাজার ৯৫২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।[7] বামফ্রন্ট সরকার শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় নয় পৌরসভাগুলোতে নিয়মিত নির্বাচনে জয় লাভ করেন। ১৯৮১ সালে ৩১ মে রাজ্যের ৮৯ পৌরসভার নির্বাচন হয়। দেশে এই প্রথম ১৮ বছর বয়সীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।[8] বামফ্রন্টের প্রাথমিক শাসন ব্যবস্থাতেই শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রতি জোর দেওয়া হয়।

---

[6] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৪৪।

[7] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে,* কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. পৃ. ৩৩৪-৩৪৫ ।

[8] বসু, জ্যোতি, *যতদূর মনে পড়ে,* কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৫৭।

জাতপাতের রাজনীতি শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তপশিলিদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানান। তারা ঘোষণা করেন যে, বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ফিরে এলে তারা তপশিলি উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। উড়িষ্যা, বিহার, ছত্রিশগড়ের দণ্ডকারণ্য, আন্দামান, মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতালের উদ্বাস্তুদের মধ্যে এক আশার আলো সঞ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ তপশিলিরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন। উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই ছিল নমঃশূদ্র ও মতুয়া। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু তপশিলিরা পুরোপুরি ভূমিহীন ছিল। ফলে তাঁরা পুনর্বাসনের আশা করেছিলেন। বামফ্রন্টের তৎকালীন নেতা কিরণময় নন্দ দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টকে সমর্থনের অনুরোধ জানায়। ক্ষমতায় আসার পরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমতা আনার জন্য কিছু কর্মসূচি চিহ্নিত করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের সুফল বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা তপশিলিরা গ্রহণ করেন। বিনয় চৌধুরী ভূমি সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে বলেছেন “প্রান্তিক কৃষিজীবী পরিবারগুলির হাতে ১.৫ একর জমি এসেছে। মাত্র ৪.২ শতাংশ পরিবারের হাতেই ১০ একরের বেশি জমি রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন ৩৩.৩ কৃষি জমির যার আয়তন ৪.৫৩ মিলিয়ন একর তা ৩৭ লক্ষ ৫১ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।”[9] গ্রামীন এলাকার ভূমিহীনদের শ্রেণীগত উত্তরণ ঘটেছে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীই নয় তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রামীন এলাকাতে স্থানীয় নির্বাচনে এঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন অবস্থা থেকে তাঁরা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছে। অর্থাৎ ভূমি সংস্কার নীতি গ্রামীণ শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি। এই অবস্থার মধ্যদিয়ে জাত, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল কৃষক সম্প্রদায়েরই উত্তরণ ঘটে।

---

[9] Malik, Ross, *Development Policy of a Communist Government: West Bengal Since 1977*, Cambridge, University press, 1993, পৃ. পৃ. ৩৯-৪৯।

গ্রামীণ স্থানীয় নির্বাচন ও শহরের স্থানীয় নির্বাচনে বামফ্রন্ট ব্যাপক জয়লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীরা উদীয়মান শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এর সাথে সাথে ভূমি সংস্কারের ফলে গরিব ভূমিহীন ভাগচাষী উপকৃত হয়েছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমি সংস্কার নীতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক মানদণ্ডে গৃহীত হলেও পশ্চিমবঙ্গে জাতপাতের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। আবার ভূমিহীনদের বেশিরভাগ তপশিলি হওয়ায় তারা এই ভূমি সংস্কারের সুফল গ্রহণ করে। অন্যদিকে এই নীতি গ্রহণের ফলে দীর্ঘদিন কংগ্রেসের জমিদারি প্রথা ও পুঁজিপতিদের দ্বারা তৈরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান ঘটে। জমির সঙ্গে যারা দীর্ঘদিন এ আন্দোলনে ছিলেন সেই জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বর্গের মানুষকে নিয়ে এক শ্রেণীর আন্দোলন সংগঠিত হয়। শ্রেণী আন্দোলনের নেতৃত্বে বাম নেতাগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিধানসভার নির্বাচনই নয়, স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি হয়। ভূমি সংস্কারের এই পরিকল্পনা শুধু ভারতে নয়, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্টের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ১৯৯০ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট বাংলার ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে উল্লেখ করা হয়।[10] ১৯৭১ সালে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার স্থায়ী হয় মাত্র ৯৭ দিন।[11] এই অস্থায়ী সরকারের পক্ষে ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রী কালে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী গুরুপদ ভূমি সংস্কার আইনের একটি সংশোধনী বিল বিধানসভাতে উত্থাপিত করলে তা বামপন্থীদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। এই সময় সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ১৩ লক্ষ একর খাস জমি গরিব ভূমিহীন মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। সরকারের এই দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৪ লাখের কাছাকাছি বর্গাদারকে নথিভুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার দুমাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ ভূমি

---

[10] Bell, Wall, *World Development Report 1990*, Oxford University Press, 1990, পৃ. পৃ.৬৪-৬৬।

[11] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৬৪।

সংস্কার সংশোধনী বিল বিধানসভায় পাস করা হয়। বিধানসভায় এই সংশোধনী আইন পেশ করেন মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী। পূর্বতন সরকারের ভূমি সংস্কারের যে ভুয়ো তথ্য ছিল তাতে গ্রামীণ বর্গাদারের সমস্যা, গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ নীতি সেভাবে অগ্রাধিকার পায় নি। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচিতেও ভূমি সংস্কারের সমস্যা, গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ অগ্রাধিকার পায়।[12] ক্ষমতার আসার পূর্বেই গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীন বর্গাদার ও দরিদ্র মানুষদের ভূমি সংস্কারের সুফলের সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গ্রাম বাংলার বেশিরভাগ তপশিলি ও তপশিলি উপজাতিরা বামপন্থীদের সমর্থন জানান।

জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব

ভূমি সংস্কারের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর নির্ণায়ক ভূমিকা জমিদার ও জোতদারদের হাতেই ছিল। এই জমিদার ও জোতদার শুধুমাত্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত না, এঁরা গ্রামীণ এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রণ করত। কংগ্রেস সরকার এঁদের মাধ্যমে এবং তাঁদের সহযোগীদের দিয়ে গ্রামীণ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। এঁরা বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্ণীয় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী। ভূমি সংস্কারের ফলে জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উৎপাদন ও কৃষির উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়। জমিদারদের হাতে যে জমি ছিল তা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এবং জমিতে ভূমিহীন ও ছোট চাষীরা অধিকার পাওয়ায় কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পায়। এছাড়াও জমির সঙ্গে যুক্ত বর্গাদার, ভূমিহীনদের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্ষমতার অলিন্দে রাজনৈতিক ক্ষমতার নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণকারী জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিবর্তে এখন এক নতুন শ্রেণী ক্ষমতার অলিন্দে উঠে আসে।

গ্রামীণ এলাকার জমিদারেরা মূলত জোতদারদের মাধ্যমে তাদের কৃষিজমি নিয়ন্ত্রিত করত। জোতদারদের গ্রামীণ এলাকার কৃষি জমির অবস্থান সম্পর্কে ধারণা ছিল। জমিদাররা বেশিরভাগই গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে শহুরে জীবনে বসবাস করতেন। তারা জোতদারদের মাধ্যমে জমির নিয়ন্ত্রণ করতেন। জোতদারদের দ্বারা জমির কর, ফসল ও মুনাফা অর্জন করতেন। জোতদারদের

[12] দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৬৫।

সহযোগী মধ্যস্বত্বভোগীরা ছোট ভাগচাষী, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে সমন্বয়কারীর কাজ করতেন। গ্রামীণ এলাকায় এরাই ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রণকারী। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় জমি থেকে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয়। ভূমি সংস্কারের ফলে জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষমতা খর্ব হয়। গ্রামীণ এলাকায় বামপন্থীদের সহায়ক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই নতুন শ্রেণী বামপন্থী কৃষি আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বর্গাদার, ভূমিহীন, ভাগচাষী, ছোট কৃষকদের নিয়ে বামপন্থীরা যে গ্রামীণ এলাকায় কৃষক সংগঠন তৈরি করেছিলেন। এই কৃষক সংগঠন বামপন্থীদের অনুগত সাংগঠনিক নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দীর্ঘদিনের বাম আন্দোলনের নেতা ভোলানাথ বাগ (নাম পরিবর্তিত) বলেন যে, "জমি আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে সংগঠনে স্থান দেওয়া হতো না। সংগঠনের জন্য আলাদা নিয়ম ছিল। সংগঠনের ও পার্টি সদস্য দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। এক্ষেত্রে শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। পার্টি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় গ্রামীণ অঞ্চলে এরাই নিয়ন্ত্রণ করত।"[13] ভাগচাষী, বর্গাদার, ছোট কৃষকরা তপশিলি সম্প্রদায়ের হলেও সাংগঠনিক ক্ষেত্রের নেতাগণ ছিলেন বেশিরভাগই উচ্চবর্ণের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও তারা জাতিগত পরিচয়কে সুপ্ত অবস্থায় রেখে শ্রেণী পরিচয়কে সর্বত্র তুলে ধরত।

উন্নত প্রযুক্তি, কৃষি জমির পরিবর্তন ও নেতৃত্ব

ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষিতে আধুনিকীরণের গতি আসে। ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক, বর্গাদার, পাট্টাদার, ছোট ছোট জমির মালিকরা বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের বহুলাংশে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কৃষি জমিতে উন্নত মানের সার, বীজ ব্যবহার করা হয়। ছোট ছোট কৃষি জমিতে কৃষকরা উচ্চ ফলনশীলের প্রতি জোর দেয়। জমির উপর অধিকার কায়েম হওয়ায় কৃষকরা নিবিড় চাষে মনোযোগী হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ-সংঘাত প্রকট হয়। ছোট ছোট কৃষক যাঁরা জমিদারদের হাতে শোষিত হতেন, তাঁদের অনেকেই পুনরায় ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েন। যে কৃষকরা উন্নত আধুনিক যন্ত্র, বীজ ও সার প্রয়োগ করতে না পারেন, তাঁরা অনেকেই প্রথাগত নীতির মাধ্যমে কৃষিতে চাষাবাদ করেন। উন্নত বীজ ও সার

[13] সাক্ষাৎকার, ভোলানাথ বাগদি, খেয়াদহ, সোনারপুর, ২০১৮।

কেনার জন্য কৃষকেরা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিতে থাকেন। এছাড়াও চাষের বলদের খরচ মেটানোর জন্য অগ্রিম ঋণ ও ফসল বিক্রির প্রতিশ্রুতিতে জড়িয়ে পড়েন। এতে অনেক ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক আরো দরিদ্রতর হতে থাকে। বামপন্থীরা ভূমি সংস্কার আন্দোলন ও ভূমি সংক্রান্ত বিষয়কে বিভিন্ন সংগঠন ও বিরোধীদের কাছে তুলে ধরেন। ভূমি সংস্কার বিষয়ক বেশিরভাগ বক্তব্য রাখেন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিল বিধানসভায় পেশ করে চৌধুরী বলেন মূলত বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষায় চলিত আইনের বিলোপ না করার জন্যই এই সংশোধন।

ভূমি সংস্কারের সাফল্য ও গ্রামীণ কৃষি রাজনীতির নেতৃত্ব

১৯৭৭ সালের পরবর্তী বিধানসভায় ভূমি সংস্কার প্রাপ্তি ও সাফল্য নিয়ে সরকার বিভিন্ন তথ্য পেশ করেন। কতজন বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে, কত একর জমি তাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে, বিলি করা জমি প্রাপ্ত তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা বাস্তবে কত দেওয়া হয়েছে, কত পরিমাণ উপকৃত হয়েছে ইত্যাদি নিয়ে বিরোধীরা সরকারকে হেনস্থা করেন। পোলবা হুগলিতে নির্বাচিত সদস্য বিধানসভায় ১৯৮৩ সালের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে কতজন তপশিলি আদিবাসী জমির পাট্টা পেয়েছে ও বর্গাদার হিসেবে নথিভুক্ত করেছেন জেলাভিত্তিক সেই হিসাব দাবি করেন। সরকার থেকে জেলাওয়ারি যে বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয় তাতে দেখা যায় ১৫টি জেলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতে পাট্টা প্রাপক ও নথিভূক্ত বর্গাদারের সংখ্যাই বেশি।[14] ১৯৭৭ সালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ওপর থেকে সেচ এলাকার ৪ একর, অ-সেচ এলাকার ৬ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যাক্ট' বিধানসভায় পেশ করা হয়। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বিধানসভায় এই বিল পেশ করে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য কমিটির সুপারিশে প্রথমে ৫ বছর পর্যন্ত রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরপরে ১০ বছর পর্যন্ত তা বর্ধিত করা হবে। এই বিলের প্রচারের পক্ষে ভোট দান করেন ২৫ জন, বিপক্ষে ভোট দেন ১১২ জন এবং ভোটদানে বিরত থাকেন ৪ জন। ১৯৮৯ সালের ৩০শে আগস্ট বিধানসভায় বিলটি গৃহীত

[14] Proceedings of The Bengal Legislative Assembly, 1985 Vol. 83, No 2, পৃ. পৃ. ৭৭৭-৭৭৮।

হয়। দীর্ঘ বিতর্কের পরে সামন্ততান্ত্রিক ও ব্রিটিশ কর ব্যবস্থার থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন কর ব্যবস্থা চালু হয়। এই আইন প্রণয়নের দীর্ঘ বিতর্কে সরকার পক্ষ, বিপক্ষ দলগুলোর মধ্যে একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[15]

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির মাধ্যমে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। কৃষি অর্থনীতি যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাই বহুলাংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময়ে বামপন্থীরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেন। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তপশিলি হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তাঁরা অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থ। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন শ্রেণীর রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক এই অর্থনীতিতে পুঁজিপতিরাই অর্থাৎ জমিদার, জোতদার ও মধ্যবিত্ত গ্রামীণ শ্রেণীরাই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রন করেছেন। বলা যেতে পারে, শহরের বাইরে এক অভিজাত উচ্চবিত্তরা গ্রামীণ রাজনীতির নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

রাজনীতির নেতৃত্ব প্রদান ও কর্তৃত্ব এঁদের হাতেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীরা দাবি করেন যে, গ্রামীণ জীবনের সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে এক অভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। জাতপাত, ধর্মনিরপেক্ষ এক অভিন্ন কৃষি অর্থনৈতিক শ্রেণীর নেতৃত্বের মাধ্যমে বামপন্থীরা গ্রামীণ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অনেকটাই জমি কেন্দ্রিক। জমিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বৃত্ত পরিক্রমা হয়। কংগ্রেসকে অপসারণের পিছনে বামপন্থীদের জমি রাজনীতি ও শ্রেণী নেতৃত্ব প্রধান নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ও শ্রেণী কাঠামোর মাধ্যমে নেতৃত্ব

বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গা কর্মসূচি প্রাথমিক স্তরে সাফল্যের দাবি করে। এর মাধ্যমে বেআইনি জমি উদ্ধার, জমির পুনর্বণ্টন, বর্গা ও পাট্টা ইত্যাদির ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনশীলতা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। বামফ্রন্ট দলের থেকে দাবি করা হয় যে গ্রাম বাংলার অন্তত

---

[15] Proceedings of The Bengal Legislative Assembly 1979, Vol. 71 No. 1, পৃ.পৃ. ৩৪-৩৫।

এক তৃতীয়াংশ মানুষ ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন আসে। শাসকদলের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী দাবি করেন যে, ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। চারিদিকে বিরোধীরা দাবি করতে থাকেন যে চাষিরা 'মহাজন' ও ব্যক্তিগত ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন ধরনের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়টি তদারকির জন্য মুখার্জী ও বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশন তৈরি করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিযুক্ত মুখার্জী ও বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশন রিপোর্টে ১৯৯৩ সালের বর্গাদার আইন অনুযায়ী ফসলের ভাগ পাচ্ছেন না বলে মন্তব্য করা হয়।[16] পরবর্তী সময়ে ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন জমি যে কৃষকরা পেয়েছিলেন তাঁদের প্রায় ২৭ শতাংশ নিজেদের জমি ধরে রাখতে পারেনি। এই কৃষক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিল তপশিলি। তপশিলিদের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ পুনরায় ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। রাজনীতিতে এক নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যারা পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক শ্রেণীর গোড়াপত্তন করেন।

কৃষি অর্থনীতির সংস্কার ও ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরিতে কৃষকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় এসে অপারেশন বর্গার উদ্যোগ নেয়। এতে বর্গাদার ভাগচাষীদের সরকারিভাবে নথিভুক্ত করার আইন বাস্তবায়িত হয়। এই উদ্যোগের ফলে দীর্ঘকালীন ভূমি সংস্কার ও ভূমি বন্টন সম্পর্কিত বামফ্রন্টের অঙ্গীকারগুলো সার্থকভাবে রূপায়ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। গ্রামের সংখ্যাধিক্য বর্গাদার, ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত হয়। এছাড়া বামেরা ক্ষমতায় এসে গ্রামীণ ভূমিকে কেন্দ্র করে সর্বহারা একশ্রেণীর উত্তরণ ঘটান। গ্রামের বেশিরভাগ প্রত্যাশিতভাবেই বাম দলগুলো অপারেশন বর্গাকে সামনে রেখে স্থানীয় স্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। এই শ্রেণী

---

[16] Mukherjee, Nirmal and Bandopadhyay, D., New Horizons for West Bengal Panchayat, (Government of West Bengal) Calcutta, 1993, পৃ. ৪১।

রাজনীতির সমীকরণ ও অর্থনৈতিক নীতিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বার বার নির্বাচনে জয় লাভ করতে থাকে। আর এই জয় নিশ্চিত করতে গ্রামবাংলার ভোটাররাই মুখ্য ভূমিকার পালন করে।

বামফ্রন্টের বিগত দশক পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নির্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গবেষণাতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি সম্বন্ধে দাবি করা হয়ে থাকে যে, ভূমি সংস্কার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। শুধুমাত্র আমূল পরিবর্তন নয়, গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক জীবন সুকৌশলে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে বামফ্রন্টের শাসনের সময় পশ্চিমবঙ্গের কৃষির উৎপাদনে কি শ্রেণী শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে? কৃষি উৎপাদনের ও সংস্কারের সুফল কি গরিব সর্বহারা মানুষ পেয়েছেন? গ্রামের তপশিলি সম্প্রদায় কিভাবে এই কৃষি সংস্কারের মধ্য দিয়ে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন? ১৯৭০ এর দশকের সুদীর্ঘ সময়ের নিষ্ক্রিয়তার পরে আশির দশকে বামফ্রন্টের সময় কালে বাংলার কৃষি অর্থনীতি পুনর্জীবিত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয় পশ্চিমবঙ্গের সাথে সর্বভারতীয় স্তরে এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনা করলে তার ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। সাহা ও স্বামীনাথন সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার গণনা করেন। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের উৎপাদন হওয়ার ছিল বছরে ০.৬ শতাংশ। সেই সময় ভারতের গড় উৎপাদনের হার ছিল ২.২ শতাংশ। কিন্তু সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৮১-৮২ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের হার ১০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় বছরে ৬.৫ হারে। ১৭টি বড় রাজ্যের মধ্যে এটিই ছিল সর্বাধিক বৃদ্ধির হার। একইভাবে অভিজিৎ সেন ও রঞ্জা সেনগুপ্তর গণনা অনুযায়ী ১৯৮১-৮২থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য শস্য বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ৬.৯ শতাংশ। একই সময়ে বিহারের উৎপাদনের হার ছিল ৩.৩ শতাংশ, ওড়িশার হার ছিল ৪.৭ শতাংশ।[17] উৎপাদনের নিরিখে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। গ্রামের বড় ও মাঝারি কৃষকরা সুফল বেশি ভোগ করেন।

---

[17] বসু, শর্মিলা, *জ্যোতিবাবুর পশ্চিমবঙ্গ একটি অধঃপতনের অধ্যায়,* আনন্দ, কলকাতা,২০১২, পৃ. ২৫

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ নেতৃত্ব

বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকের কৃষি উৎপাদনের উন্নতিতে বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কারের তেমন কোনো সমর্থনযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্য অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উন্নত বীজ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ছিল অন্যতম। ১৯৮০'র দশকে কৃষি ফসলের মধ্যে আমন চাষে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আমন চাষে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োগ করা হয় এর সাথে বোরো চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই দুই প্রকার ধানের চাষের ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় যে নলকূপের ব্যবস্থা করা হয় তাতে চাষ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। নলকূপের মালিকগণ নলকূপের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ইজারা নিয়ে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার করে উৎপাদন অনেকটাই বৃদ্ধি ঘটায়। ছোট ও মাঝারি মাপের জমিতে ছোট কৃষকরা উৎপাদনে অনেকটাই ব্যর্থ হয়। এই ছোট ও মাঝারি তপশিলি কৃষকরা অনেকেই চাষাবাদ পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। টিউবওয়েল উন্নত প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলায় একশ্রেণীর উত্তরণ ঘটে। এই শ্রেণীরা পার্টি সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কৃষকদের চাষবাস সংক্রান্ত বিষয়, জমি ও ফসল বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে এঁরাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিলেন। কৃষকদের সাথে এঁরা যোগাযোগ স্থাপন করতেন।

গদার ও সেনগুপ্ত তাঁদের লেখায় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঘটকের একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক গবেষণার উল্লেখ করেছেন। এখানে ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ধান চাষের উৎপাদনের শতাংশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে বোরো চাষের প্রসার ও আমন চাষে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার দিয়ে।[18] তবে এই উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জলসেচ প্রসার। জলসেচ ব্যবস্থার বিনিয়োগ, আমন ও বোরো চাষের উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার পুরোটাই হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তবে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার বলতে প্রকৃত পক্ষে কি বোঝানো হয়েছে এবং এর ফলে কিভাবে এক নতুন শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

[18] গদার ও সেনগুপ্ত, এগ্রিকালচারাল গ্রোথ এন্ড রিসেন্ট ট্রেনড ইন ওয়েল্ডিং ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল, হারিস হোয়াইট বসুর সম্পাদিত সোনার বাংলা?

বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার বলতে বোঝায় জমির বন্টন, ভাগচাষি সংক্রান্ত আইন বলবৎ-এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ স্থানীয় স্তরে শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরি করা। গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে গবেষকরা জমি বন্টনের বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি ও তাদের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এড়িয়ে যান।

বামফ্রন্ট সরকারের সময় পশ্চিমবঙ্গে যে জমি বন্টন হয়েছে তা শুধুমাত্র চাষের জমি নয়। পশ্চিমবঙ্গে যত জমি বন্টন করা হয়েছে তা চাষযোগ্য জমির মাত্র ৬ শতাংশ এবং তার অর্ধেক ষাটের দশকেই বন্টিত হয়েছিল। কংগ্রেস আমলে জমি বন্টন হয়েছিল। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বামফ্রন্টের সময় বর্গাদার নাম নথিভুক্ত করার সময় জমিদারদের চাপের কাছে অনেকটাই নতি স্বীকার করেন। জমিদাররা বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত না করার জন্য চাপ দেন। তারা প্রচার করেন যে অপারেশন বর্গাতে নাম নথিভুক্ত করা যে সুযোগ সুবিধা পাবেন তার থেকে অধিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। গ্রামের বড় ও মাঝারি কৃষক ক্ষমতার অলিন্দে থেকে যান। এছাড়া অনেক ছোট ও দরিদ্র কৃষক জমিদারদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে অনেকেই এই অপারেশন বর্গাতে নাম নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। বামফ্রন্ট সরকার অপারেশন বর্গাকে অতিরঞ্জিত ভাবে তুলে ধরে সুগত বসু লিখেছেন, "During the late 70s the left front government loudly trumpeted it's operation barga,a drive to record the names of shares croppers. An amendment to the land reforms act in 1970 had raised the crop sharing ratio to75:25 in favour of the sharecroppers and made their right to cultivation hereditary. Operation barga directed by the bureaucracy rather than pleasant front organisations, was designed to enable share-croppers to claim their statutory rights."[19] তিনি মনে করেন যে অপারেশন বার্গার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার বৃহত্তম কৃষক শ্রেণীর উন্নতি ঘটেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বড় কৃষকরা অনাবাদি জমি বন্টনের মধ্য দিয়ে মাঝারি কৃষকে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চায়েত রাজ ও পার্টি

---

[19] বসু, সুগত, *প্লেভার এন্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটালস: রুরাল বেঙ্গল সিন্স ১৯৭০,* নিউ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৮।

সংগঠনে এঁদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অপারেশন বর্গা প্রচার মাধ্যমে সি.পি.আই,(এম.) গ্রামবাংলায় অনেকদিন ধরে ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারে। বর্গাদাররা গ্রাম বাংলার একটি ছোট অংশ মাত্র এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের একটি অংশ উপকৃত হয়েছে মাত্র। তার থেকেও সি.পি.আই.(এম.) গ্রাম বাংলার ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। সুগত বসু লিখেছেন যে সি.পি.আই.(এম.) ভাগ চাষীদের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর কথায় undue emphasis on sharecroppers who constituted well under 10% of the rural workforce.[20] ভাগ চাষীদের বিষয়টি কৃষক সভার মাধ্যমে এমনভাবে প্রচারিত হয় যা সকল কৃষক সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা বড় কৃষক থেকে মাঝারি কৃষকের হাতে রূপান্তরিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ও ও সংসদ সুশোভন রায় (পরিবর্তিত নাম) বলেন যে, সি.পি.আই.(এম.)'র অপারেশন বর্গা নিয়ে যে প্রচার আমি বিধানসভায় বলেছি, এসব বস্তা পচা গল্প। ওদের যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে এর প্রতিবাদ জানাতো। আমি ১০০ টা উদাহরণ দিতে পারতাম গ্রামের কৃষকরা অনাবাদি জমি ছেড়ে দিয়ে মাঝারি কৃষক হয়েছে। আর বেনোজল এর মত ওদের পার্টিতে ঢুকে পড়েছে। এসব আর কিছুই নয় ওই নতুন পাত্রে পুরনো জল ঢালার মত। ক্ষমতাভোগীরা নতুনভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। শুধুমাত্র চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে।[21]

গ্রামীন অভিজাত শ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে তবে বামফ্রন্টের আমলে গ্রামবাংলায় কাদের লাভ হয়েছে? বাম দলগুলোর সর্বহারার দলের শাসনে গ্রামের তপশিলি দরিদ্র মানুষের ভাগ্যে কি ঘটেছিল এবং সি.পি.আই.(এম.)'র নির্বাচনী কৌশলের সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায়? গ্রাম বাংলার উপর গবেষণামূলক বিশ্লেষণগুলিতে দেখা যে বামফ্রন্ট যতই সাফল্যের দাবি করুক না কেন তাদের এই সংস্কার নীতি না ছিল বৈপ্লবিক না সর্বহারা বঞ্চিত তপশিলি শ্রেণীর উদ্দেশ্যে রচিত। সুগত বসু সি.পি.আই.(এম.)'র স্ট্রাটেজি এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "... Its repeated electoral

[20] বসু, সুগত, *ফ্লেভার এন্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটালস: রুরাল বেঙ্গল সিন্স ১৯৭০,* নিউ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৮ ।

[21] সাক্ষাৎকার, সুশোভন রায় (পরিবর্তিত নাম), কলকাতা, ২০১৭।

successes have been asind achived only by nurturing a pleasant smallholder base of of support ant not delivering anything of substance to the poorest of the landless rural poor... It's modest land redistribution program amounted to the little more then the the redistribution of provery।”[22]

সি.পি.আই.(এম.)’র অপারেশন বর্গার সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। দরিদ্রতম মানুষের সার্বিক কল্যাণ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বামফ্রন্ট তথা বাম দলগুলোর গ্রামীণ স্ট্র্যাটেজি থেকে কে লাভবান হবে তা ঠিক করতে সি.পি.আই.(এম.) ‘ওরা বনাম আমরা’ নীতি অনুসরণ করেছিল। গ্রামের সংস্কার বা উন্নয়ন থেকে কে কি পাবে তা স্থির করা হয় দলীয় রাজনীতির আনুগত্যের ভিত্তিতে, প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নয়। দলীয় রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী ছিলেন এবং যারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিলেন তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। গ্রামের তপশিলিরা যতটা সহযোগিতা পেয়েছেন তার থেকে শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যায় কম উচ্চবর্ণ বেশি সুবিধাভোগ করেছেন। নীল ওয়েবস্টার পশ্চিমবঙ্গের গবেষণা থেকে দেখিয়েছেন যে, কৃষিতে বোরো চাষের প্রাধান্য বাড়ায় কৃষি ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় জমির মালিকেরা গ্রামের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে। তারা বোরো চাষের জন্য জমি লিজ করে নিয়েছে। ওয়েবস্টার সাবধান করে দেন যে নলকূপের মালিকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলার সামাজিক জীবনে অসাম্যের সৃষ্টি করে। বেক আবিষ্কার করেন যে কর্মসংস্থান ও মজুরিতে কিছু উন্নতি না ঘটলেও নলকূপের মালিকদের উপার্জন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। গ্রাম বাংলার নলকূপের মালিকরা যেন একটি ছোট অভিজাত গোষ্ঠিতে পরিণত হচ্ছিল। এই অভিজাত শ্রেণী অর্থাৎ নলকূপের মালিকগণ পার্টির নেতৃত্ব স্থানীয় নেতা ছিলেন। এরাই গ্রামবাংলার কৃষি অর্থনীতি, কৃষক সম্প্রদায় ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। শ্রেণীভিত্তিক সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের মধ্যে অভিজাত শ্রেণী তৈরি হয়। এই অভিজাত শ্রেণীর বৃহৎ অংশ ছিল উচ্চবর্ণ ও মধ্যবর্তী বর্ণের কৃষক।

রোগালি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, তিন দশকেরও বেশি ক্ষমতায় থাকার সময় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষেতমজুরদের কাজের শর্তাধীন বিষয় কার্যকারী আইন অনুমোদন করে উঠতে

---

[22] বসু, সুগত, *ফ্লেভার এন্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটালস: রুরাল বেঙ্গল সিন্স ১৯৭০,* নিউ ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৮।

পারেনি। সংখ্যা অনুযায়ী ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা কত সেই বিষয়ে তথ্য প্রায় নেই বললেই চলে। বামফ্রন্টের সময় যে হারে উৎপাদন বেড়েছিল সে হারে মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। ন্যূনতম কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ক্ষেত মজদুর সংগঠনগুলো তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানালে পার্টির নেতাগণ মজুরিকে কেন্দ্র করে ক্ষেতমজুর ও জমির মালিকের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করেন। এই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিগণ ছিলেন পার্টির নেতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। ১৯৯০'র দশকের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ক্ষেতমজুরদের জন্য সরকার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এই সময় রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে নলকূপের মারফত জলসেচের প্রভাব ও প্রসার বাড়তে থাকে। নলকূপের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে যেমন স্বাবলম্বী হয় অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবেও তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পার্টির নেতৃত্বগণ মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের 'পলিটিক্স অফ মিডল মিডিলনেস' গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে-"The CPI(M) excelled in what maybe regarded as the the politics of middleness." সি.পি.আই.(এম.) তিন দশকের যে রেডিক্যাল রাজনীতি থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখার জন্য মধ্যপন্থার সংযোগকারী এক নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সি.পি.আই.(এম.) সর্বহারা গরিব মানুষের প্রতিনিধিত্বের দাবি থেকে সরে আসতে। It was in its attitude to the class of agricultural labourer that the CPI(M)s change of the emphasis(or metamorphosis) becomes most Galaring.[23]

সংগঠন ও মধ্যস্থতাকারী নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ক্ষেতমজুর সংগঠন খুবই মজবুত ছিল। এই ক্ষেত মজদুর সংগঠনের বেশিরভাগ কৃষক ছিল তপশিলি সম্প্রদায়। ক্ষেতমজুর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। গ্রামীণ এলাকার কৃষকরা বড় কৃষকদের জমিতে চাষ করতেন। অনেকেই মজুরি খাটতেন অনেকে আবার জমির ইজারা নিয়ে চাষ করতেন। ভূমিহীন কৃষকরা বড় কৃষকদের

[23] ভট্টাচার্য্য, দ্বৈপায়ন, পলিটিক্স অফ মিডিল নেম চেঞ্জিং ক্যারেক্টার অফ দা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মারক্সিস্ট) ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৭৭-৯০), পৃ. ২৮৯।

জমির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। যে কৃষকরা অন্যের জমিতে শুধুমাত্র শ্রম দিতেন তাদের কাছে মজুরের প্রশ্ন সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বামফ্রন্ট সরকার মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারি কোন নিয়ম বা আইন তৈরি করেননি। গ্রামীণ এলাকার মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পূর্ণ ক্ষেতমজুর সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করত। বড় কৃষকের জমিতে যেসব ভাগচাষী ছোট কৃষক ও দিনমজুররা কাজ করতেন তারা মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগঠিতভাবে চাপ সৃষ্টি করতেন। বৃহত্তম জমির মালিক ও বড় চাষীরা মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। ফসল কাটা ও রোপনের সময় দিনমজুরদের চাহিদা বৃদ্ধি পেত। প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম থাকায় শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পিয়ালী গ্রামের কৃষি শ্রমিক চিত্ত মন্ডল বলেন যে, "প্রতিবছর জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের জোন (শ্রম) দেওয়ার দাম আর বৃদ্ধি পায় না। এ বিষয়ে কথা বললে যে বড়লোকদের জমিতে সারা বছর কাজ করি, তারা আর কাজে নিতেন না।" এরাই কৃষক সংগঠনের মাথায় বসে ছিলেন। গ্রামের সালিশি এরাই করতেন। যার গরু ধান খেয়েছে তাকে যদি আপনি বিচার করতে দেন তাহলে কি হয়। আমাদের মত জন দেওয়া লোকদের এরকমই অবস্থা ছিল।"[24]

এছাড়াও গ্রাম অঞ্চলে চাষবাসের সময়কাল প্রায় একই। অর্থাৎ ফসল রোপণ ও ফসল কাটার সময় সব কৃষকদের মজুরের প্রয়োজন হয়। সংগঠিত ভাবে মজুররা ও ছোট চাষীরা মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করলে ক্ষেতমজুর সংগঠন বেশিরভাগ সময়ই মধ্যস্থতাকারী ভূমিকায় পালন করত। ক্ষেত মজদুর সংগঠন সর্বহারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে যেমন বলতেন তেমনি বড় কৃষকদের যাতে ব্যাপক অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। অর্থাৎ বড় চাষীদের একটু মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারাই দিনমজুরদের পক্ষ নিয়ে এক মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা পালন করতেন। অন্যদিকে ছোট কৃষকদের সেচ ব্যবস্থার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তারা বড় কৃষকদের সেচ ব্যবস্থার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলেন। অনেকেই আবার বড় কৃষকদের কাছে জমির ইজারা দিতেন। বড় কৃষক ছোট কৃষকদের মধ্যেও গ্রামীণ এলাকায় দ্বন্দ্বের পরিবেশ তৈরি হয়। ছোট, মাঝারি কৃষক, বড় কৃষক ও দিনমজুরদের মধ্যে বাম ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলো সর্বদাই সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতেন। তবে এই নেতৃত্বদানকারী সকল কৃষক

---

[24] সাক্ষাৎকার, চিত্ত মন্ডল, পিয়ালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১৮।

সংগঠক নেতারাই কৃষক সম্প্রদায়কে একটি অভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ছোট-বড় ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যে বৈরিতা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করেন। গ্রাম বাংলার কৃষকদের জাতপাত, ধর্ম ও ছোট বড় নির্বিশেষে এক অভিন্ন কৃষক সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত করে এবং তাদের মধ্য থেকে পার্টির নেতৃত্ব তৈরি করতে থাকেন। গ্রামীণ এলাকার এই কৃষক সম্প্রদায়ের নেতারাই গ্রামীণ এলাকার রাজনীতিকে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে চালিত করত।

দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য্য বাম সময়কালের সি.পি.আই.(এম.) ক্ষেতমজুরদের জন্য আলাদা আলাদা সংগঠনের দাবি করতেন, তা অস্বীকার করেছেন। সি.পি.আই.(এম.)'র ক্ষেতমজুরদের জন্য আলাদা কোন সংগঠন করেন নি বরং এই সংগঠনের আড়ালে বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ক্ষেতমজুর সংগঠন সর্বদাই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে মজদুরদের স্বার্থরক্ষা হচ্ছিল না। Paradoxically, and this is important, the real (though seldom articulated) objective was to protect the interests of the middle classes, and note of the the agricultural labourer."[25] সি.পি.আই.(এম.)'র দ্বারা বঞ্চিত এই শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল তপশিলি সম্প্রদায়। গ্রাম বাংলার কৃষি অর্থনীতির এঁরাই ছিল মূল ভিত্তি। বাংলার অর্থনীতির প্রাথমিক উৎপাদক গোষ্ঠী ছিলেন এই তপশিলি সম্প্রদায়। সংখ্যার বিচারে তপশিলিদের জনসংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশের বেশি।

সর্বহারা এই গরিব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেয়ে বড় ও মাঝারি কৃষকদের ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল ক্ষেতমজুর সংগঠনের কাছে মূল লক্ষ্য। বরং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠায় এঁরা মূল ভূমিকা পালন করতেন। জমিদারদের ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং অনন্য কৃষকদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য গ্রামীণ এই নেতাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বাম সময়কালে ক্ষেতমজুর, ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষকদের বাদ দিয়ে গ্রাম বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন শ্রেণীর নেতার উদ্ভব হয়। তারা গ্রাম বাংলার রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার রাজনীতি নয় এরা শহরে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ শহরের তাত্ত্বিক নেতা ও গ্রামের

---

[25] ভট্টাচার্য্য, দ্বৈপায়ন, পলিটিক্স অফ মিডিল নেম চেঞ্জিং ক্যারেক্টার অফ দা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মারক্সিস্ট) ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৭৭-৯০),পৃ.পৃ. ২৮৯-৯০।

সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে সংযোগের কাজ এঁরাই করেন। সি.পি.আই.(এম.) গরিব কৃষক ও সর্বহারার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের মতে, "The CPI(M) was identified lesson Les with the under privileged".[26]

বঞ্চিতদের বঞ্চিত করা কিংবা সর্বহারাদের পক্ষ অবলম্বন না করা এই রাজনৈতিক কৌশল সি.পি.আই.(এম.)'র সর্বহারা দলের সঙ্গে বেমানান ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক সাফল্যে এই কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রাম বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থীরা রাজনৈতিক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে দীর্ঘ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছেন এবং গ্রামবাংলায় সংখ্যাধিক্য তপশিলি ব্যতিরেকে এক ধরনের নেতৃত্ব তৈরি করেছেন। এই নেতৃত্ব সর্বদাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এরা রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে জাতপাত নিরপেক্ষ শ্রেণী তৈরির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে চান। বামেরা এই ব্যাপারে গ্রাম বাংলার গরিব তপশিলিদের স্বার্থের থেকেও নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের মতে- "Irrespective of its claims to the the contrary, the CPIM has brought about a gradual de radicalisation in the character of redistributive reforms in rural West Bengal over the 1980s."

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে অপারেশন বর্গা, ভূমি সংস্কারের সফল কর্মসূচি প্রচার করা হয়। বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ১৯৯৪-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ১২.৭১ লক্ষ একর জমি বন্টন করেছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি আরো পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান যে ২০০৪-২০০৫ সাল পর্যন্ত বন্টিত জমির পরিমান ১৩.৯৬ একর। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে বাংলার ৭০ শতাংশ জমি প্রান্তিক কৃষকদের হাতে রয়েছে যারা গ্রাম বাংলার ৮৩ শতাংশ মানুষ, যেখানে নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের প্রান্তিক কৃষিজীবীদের হাতে রয়েছে মাত্র ৪০ শতাংশ জমি।[27] তবে একথা বললে অতিরঞ্জিত হয়না যে, বর্গাদারদের

---

[26] ভট্টাচার্য্য, দ্বৈপায়ন, পলিটিক্স অফ মিডিল নেম চেঞ্জিং ক্যারেক্টার অফ দা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মারক্সিস্ট) ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৭৭-৯০),পৃ. ২৯৩।

[27] দাশগুপ্ত, অসীম, *রাজ্যের গ্রাম অঞ্চল ও কৃষির প্রসঙ্গ: বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও ও প্রকৃত ঘটনা,* উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সমস্যা সম্ভাবনা, কলকাতা, যুব শক্তি প্রকাশনী, 2008, পৃ. ৫২।

নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে পার্টি সর্মথকরা নথিভূক্ত বর্গাদারদের অগ্রাধিকার দিয়েছিল। গ্রাম অঞ্চলের রাজনৈতিক সমীকরণ বর্গাদারদের জমির পাট্টা বিলিকে কেন্দ্র করে 'আমরা ও ওরা' দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষি অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত পার্টির ক্যাডারগণ পাট্টা বিলের ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুর সংগঠনের সদস্যদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। পাট্টা জমির বিতরণের ক্ষেত্রে সমর্থকদের প্রতি অধিকার প্রদর্শন করা হয় ও অতঃপর কর্মসূচির গতি স্তিমিত করে দেওয়া হয়।[28]

গ্রাম অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিকে ও অপারেশন বর্গা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক সফলতা লাভ করে। গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতে সর্বহারার প্রতিনিধিত্ব খুব কমই দেখা যায়। বামফ্রন্ট সরকার অভিন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তাদের হাতে পঞ্চায়েতের মূল ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। ১৯৭৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন কৃষক, ওদের অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য ছিল। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ প্রতিনিধি ছিলেন ক্ষেতমজুর শ্রেণীর। শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতা তৈরিতে গ্রামীণ রাজনীতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও ভূমিহীন মজদুর শ্রেণী, ভাগচাষীদের প্রতিনিধিত্ব খুব কমই ছিল। অন্যদিকে তপশিলিদের বাইরে সংগঠনের নিয়ন্ত্রক ছিলেন মাঝারি কৃষকদের ৫০ শতাংশ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি। একইভাবে ১৯৮৩-১৯৮৮ নির্বাচন লক্ষ্য করা যায় যে এই নির্বাচনগুলোতে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে মধ্যশ্রেণীর কৃষকদের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। গ্রাম বাংলার স্বল্প শিক্ষিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে। বিকেন্দ্রীকৃত করে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে, মানুষকে উন্নয়নকর্মে সামিল করার বামেদের এই পরিকল্পনাকে রস মল্লিক পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পঞ্চায়েতগুলি ক্রমে দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই তথ্য পার্টির উপর মহলের কাছেও তথ্য

[28] Begman, Theodor, *Agrarian Reform in India*, Agricole Publishing Academy, New Delhi, 1984, পৃ. ১৫২।

ছিল।[29] গ্রামীণ রাজনীতিতে শুধুমাত্র তপশিলিরা বঞ্চিত হয়েছে তা নয়। শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরিতে মধ্যবর্তীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। এছাড়াও এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিল জাতপাতের নিরিখে উচ্চবর্ণের। এই উচ্চবর্ণের নেতৃত্বগণ সর্বদাই ভূমি নকশা ক্ষেতমজুর তপশিলিদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছেন। শুধুমাত্র তপশিলি ভূমিহীন কৃষকই নয়, বিরোধী দলগুলোর উপরও এরা এঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। গ্রাম বাংলার রাজনীতি সি.পি.আই. (এম.) এক লাগামহীন শ্রেণী কর্তৃত্ব তৈরি করেছিল। সুমন্ত ব্যানার্জী বলেছেন পার্টি নেতৃত্বের তাত্ত্বিক অস্থিরতা ‘ক্যাডার কুল’ এর মার্কসীয় ধারায় প্রশিক্ষণের অভাব এবং কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার তাগিদে সি.পি.আই.(এম.) বিরোধীদের দমনের নীতি নিয়েছিল। উচ্চ নেতৃত্বের তাত্ত্বিক অন্তঃসারশূন্যতা এই প্রবণতাকে অনেক বিস্তৃত করে। যার প্রভাব সামগ্রিক বাম শাসনের ওপর পড়েছে। তাঁর ভাষায় “the CPIM record as a ruling party in West Bengal is a sad story”[30]

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত গ্রাম বাংলার উঁচু জাতের আধিপত্য অটুট ছিল। গ্রামের উচ্চবর্ণীয় জমিদার, জোতদার ও বড় কৃষকদের গ্রামের রাজনীতিতে আধিপত্য ছিল। শুধুমাত্র গ্রামবাংলা নয়, শহরের রাজনীতিতেও উঁচু জাতের প্রাধান্য অটুট ছিল। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের প্রধান আধিপত্য ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব এঁদের হাতেই ছিল। ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর পরিমাণ উদ্বাস্তু আসায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা দিনমজুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অনেক উদ্বাস্তু শহরের শিল্প শ্রমিক, ছোট ব্যবসা ও দিনমজুরের জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। অপরপক্ষে উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বিভিন্ন চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক

---

[29] Mallick, Ross, Development Policy of a a Communist Government: West Bengal since 1977, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, পৃ. পৃ. ১২৪-১৭০।

[30] Banerjee, Sumanta, *Marxism and the Indian From Interpreting India to'changing'it West Bengal: Violence without Ideology,* Purbalok Publication Kolkata, 2012, পৃ. পৃ. ১২২-১২৪।

নেতৃত্ব স্থানীয় দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৭ সালের ভূমি সংস্কার ও বর্গাদারী আইনের পর উচ্চবর্ণের মানুষের বসতি গ্রাম অঞ্চলে কমতে থাকে। তবে গ্রামে বসবাস করা উঁচু জাতের মানুষরা রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন।

কৃষক সভায় তপশিলি নেতৃত্বের অভাব

বামফ্রন্ট সরকার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতিতে বিশ্বাস হলেও এঁদের মধ্যে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ছিল। এর ফলে নেতৃত্ব স্থানীয় কোন জায়গাতে তপশিলিদের স্থান খুবই কম ছিল। অন্যান্য রাজ্যের রাজনীতিতে তপশিলিদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু ক্ষেত্রেই এঁদের স্থান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগুরু তপশিলি হলো রাজবংশী সম্প্রদায়। দক্ষিণবঙ্গের তিনটি তপশিলি জাতি হল নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ও বাগদি সম্প্রদায়। শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে নমঃশূদ্ররা অনেকটাই এগিয়ে। ফলে অন্যান্য তপশিলি জাতির তুলনায় নমঃশূদ্রদের কৃষি পেশার বাইরে অন্য পেশায় যোগদানের হার বেশি। ১৯৯১ থেকে ২০০1 এর মধ্যে নমঃশূদ্র জাতির কৃষি নির্ভরতা ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ৩৮.৩ শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে নেমেছ ৬৯.৫ শতাংশ থেকে ৩৫.৫%। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নমঃশূদ্রদের বৃহৎ অংশ শহরে বসবাস করতে শুরু করে। এঁদের একটি বৃহৎ অংশ অ-কৃষি পেশার সঙ্গে নিজেদের একাত্মবোধ করেন। কৃষি ছাড়াও সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী প্রভৃতি পেশায় এঁদের তুলনামূলক অংশগ্রহণ অনেক বেশি। অপরদিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক নির্ভর জীবিকাতে বেশির ভাগ নিয়োজিত। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজবংশী সম্প্রদায় বেশিরভাগই কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজবংশী সম্প্রদায় অনেকটাই পিছিয়ে। রাজবংশীদের ১৯৯১ ও ২০০০ মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ১০% কমেছে এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষেতমজুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামগ্রিকভাবে কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত তপশিলিদের কৃষি পেশা থেকে অ-কৃষি পেশায় যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপারেশন বর্গা ও ভূমি সংস্কারের প্রকৃত সুফল তপশিলিরা পায়নি। গ্রামবাংলায় তপশিলিদের জাতপাত কেন্দ্রিক নেতৃত্ব তৈরির পরিবর্তে শ্রেণী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে তাতে উচ্চবর্ণের আধিপত্য বেশি ছিল। উচ্চবর্ণের বেশিরভাগ মানুষ অ-'কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও

যে অল্পসংখ্যক মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে ছিলেন। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি তপশিলি জাতিদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। শুঁড়ি, জেলিয়া কৈবর্ত, ডোমদের সংখ্যা কমতে থাকে। অনেকেই তাঁদের প্রথাগত পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করেন এবং নিজেদেরকে তপশিলি জাতির পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন। গ্রাম বাংলার ও শহরের স্থানীয় রাজনীতিতে উচ্চবর্ণীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। দলীয় শ্রেণীর রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তপশিলি জাতির মানুষদের রাজনৈতিক সুবিধা অনেকটাই কমতে থাকে। জাতপাতের চেয়ে শ্রেণী রাজনীতির পরিচয় দিতে অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। জাতি বৈষম্যকে শ্রেণী সাম্যের ভাবাদর্শ নিয়ে আড়াল করার পেছনে বামপন্থীদের এক সুকৌশল ছিল। জাতি বৈষম্য যে শ্রেণী সাম্যের সঠিক ভবিষ্যৎ দিশা নির্ণয় করতে পারে না এ বিষয়ে অনেকেই অবহিত ছিলেন না। বামপন্থীরা জাতি ও জাতপাত পরিচয়কে লুকিয়ে রেখে শ্রেণী পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এক মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে সার্থক ভাবে সফল হয়েছিল।

৫.১৫. জাতপাত বিরোধী ও শ্রেণী সংগ্রামে বামেদের অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি সম্প্রদায় হল মুখ্য উৎপাদক শ্রেণী। অর্থনীতি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে এঁরা শোষিত শ্রেণীর রূপে বিবেচিত। তপশিলিরা বেশিরভাগই গ্রামীণ জীবন ও কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা ফসল উৎপাদন ও খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র তপশিলি কৃষকরা সামাজিক জীবন ও শ্রেণী রাজনীতিতে বঞ্চিত অবহেলিত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বঞ্চিত অবহেলিত দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি ও মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গেও শ্রেণী রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ জীবনে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা মহাজনী প্রথা বর্গাদারী চাষ ব্যবস্থা তপশিলি কৃষকদের ন্যায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং জাত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতি কাঠামোর মধ্য দিয়ে তপশিলিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটানো সম্ভব বলে বামপন্থীরা মনে করেন। তবে তা বাস্তব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী পলিটব্যুরোর সদস্য ও তাত্ত্বিক নেতা টি.ভি. রনদিবে 'ক্লাস কাস্ট অ্যান্ড প্রপার্টি রিলেশনশিপ' গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে কৃষি বিপ্লবের জন্য, মালিকদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সংগ্রামের কথা বলেছেন। সমাজতন্ত্রে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই শেষ কথা বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেছেন যে, জাতিভেদ

প্রথা বিরোধী সংগ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে চালানো যেতে পারে না। এই সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী সংগ্রামের অংশ হিসেবে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পত্তির সম্পর্কের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পত্তির সম্পর্ক জাতপাত ব্যবস্থা ও শ্রেণী নিপীড়ন দুটোকেই প্রভাবিত করে। তিনি মনে করেন যে জাতিভেদ প্রথা সমস্যার সমাধান হচ্ছে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলা।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ৩৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো ভূমি সংস্কার। দরিদ্র কৃষকদের জীবনের উন্নতি ও ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ দেওয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত বেনামি জমি ভূমিহীন কৃষক ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। জমির বিভিন্ন ধরনের মালিকানা দূর করে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে তা বন্টনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলির মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। কৃষকদের দুর্দশার অবসানের জন্য দীর্ঘদিন যাবত কৃষকদের যে বকেয়া ঋণ তা বাতিল করে দেওয়া হয়। নামমাত্র সহজ সরল সুদে নতুন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মজুতদারদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভূমিহীন ও ছোট কৃষকরা যাতে ঋণ ফাঁদে না পড়েন তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় ছোট কৃষকদের বিশেষ করে খাজনা মকুব করে দেওয়া হয়। বামপন্থী দলগুলি ভূমিহীন কৃষকদের সারা বছর যাতে কাজ পেতে পারেন এবং জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মজুরির ব্যবস্থার উপর জোর দেন। বাম দলগুলো তৎকালীন সময়ে জীবন ধারণের জন্য নির্ধারিত হার থেকে তাদের নিম্নতম মজুরির হার বৃদ্ধির দাবি রাখেন। ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ করতে হবে এই মর্মে তার স্মারকলিপি পেশ করেন।[31] এই সকল সুবিধা যাতে তপশিলিরা পায় এবং বেশিরভাগ মানুষ যাতে উপকৃত হন, সেদিকে তারা নজর দেন। ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষিজমির বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬.৭৩ লক্ষ একর। বিলি করা হয় মোট ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৭৬ জন কৃষকদের মধ্যে। এঁদের মধ্যে তপশিলি জাতি ভুক্ত কৃষকের সংখ্যা হল ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৬ জন। যা তপশিলিদের ৩৭ শতাংশ।

[31] সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪।

আদিবাসী কৃষকদের সংখ্যা হল ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৯৫ জন। যা হলো আদিবাসীদের ১৯.৪৮ শতাংশ। অর্থাৎ মোট কৃষকদের ৫৬.৪৮ শতাংশ যদিও এঁদের মোট জনসমষ্টি হল ২৮.৫ শতাংশ।[32] ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বর্গাদার হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় প্রায় ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৪০জনকে। এঁদের মধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯০৭ জন। যা শতকরা অনুসারে ২৯.৫৪ শতাংশ এবং আদিবাসীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ ০ হাজার ৬১৫ জন। যা শতকরা হারে ১২.১৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুভিটা অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৪৩ জন ক্ষেতমজুর কারিগরকে কৃষি জমি ও মৎস্যজীবীকে বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এই প্রাপকদের মধ্যে প্রায় ৭১ হাজার জন তপশিলি জাতি এবং ৩৪ হাজার জন আদিবাসীরা ছিলেন। শতকারা হিসেবে তাঁদের প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ২৯.৩৪ শতাংশ।[33] রবি চাষের জন্য ঋণদান কর্মসূচিতে যে ৫ লক্ষ ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হয় তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের লোক।[34] সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় উপকৃত ব্যক্তিদের প্রতি ৫ জনের ২ জন হলো তপশিলি এবং ১ জন হলো আদিবাসী।

তপশিলিদের সংসদীয় নির্বাচন রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির যাত্রা শুরু হয় ১৯৫২ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অনেক রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল যেমন ছিল তেমনি পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোও

---

[32] সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪।

[33] সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪।

[34] সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪।

অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় দলগুলো এই নির্বাচনী রাজনীতিতে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে গণতন্ত্রের উৎসবে কংগ্রেসীদের আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়।

সারণি:৫.২. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা (১৯৫২-১৯৭২)

রাজনৈতিক দল	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭১	১৯৭২
কংগ্রেস	১৫০	২১৬	১৫৭	১২৭	৫৫	০	১৫২
কংগ্রেস (আর)	০	০	০	০	০	১০৫	০
কংগ্রেস(ও)	০	২	০	০	০	২	০
বাংলা কংগ্রেস	০	০	০	৩৩	৩৩	৫	০
সি.অই.আই	২৯	৩৫	৫০	১৫	৩০	১৩	৪৬
সি.পি.এম	০	১৪	০	৪৪	৮০	১১৩	০
এফ.বি.এম	১২	০	০	১	১	২	৮
ফরওয়ার্ড ব্লক	০	০	১৩	১৩	২১	৩	০
ফঃ ব্লক(আর)	২	০	০	০	০	০	০
এম.এফ.বি	০	১	০	০	০	০	০
আর.এস.পি	০	২	৯	৬	১২	৩	৩
কে.এম.পি.পি	১৫	০	০	০	০	০	০
পি.এস.পি	০	২১	৫	৭	৫	০	০
আর.সি.পি.আই	০	০	০	০	২	১	০
ডবল্যু.পি.আই	০	০	০	২	১	২	১
বি.বি.সি	০	০	০	০	০	২	০
ডি.এস.পি	০	০	০	০	০	১	০
জি.এল	০	১	২	২	৪	০	২

এস.এস.পি	০	০	০	৭	৯	২	০
এস.এউ.সি	১	২	০	৪	৭	১	১
এস.এউ.সি.আই	০	০	০	০	০	৭	০
এম.এল	০	০	০	০	০	৬	১
জে.কে.পি	০	০	০	০	০	২	০
জে.এস	৯	০	০	১	০	১	০
এস.ডবল্যু.এ	০	০	০	১	০	০	০
আই.এন.ডি.এফ	০	০	০	০	১	০	০
এল.এস.এস	০	০	৪	৫	৪	০	০
আই.এন.ডি.(এস.আর.পি)	১	০	০	০	০	০	০
ডবল্যু.পি	০	০	০	০	১	০	০
নির্দল ও অন্যান্য	১৫	১৮	২২	১২	১১	৫	৫
সর্বমোট	২৩৮	২৫২	২৫২	২৮০	২৮০	২৭৯	২৮০

সূত্র: Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৩০৭- ৫০২। এই সূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে তপশিলদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে তপশিলিরা বিভিন্ন নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতেন। স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নির্বাচন সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালে। এই নির্বাচন সম্পূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশ ও জনগণের রায় দান ছিল। প্রাদেশিক নির্বাচনের মতো এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৪০টি আসনের মধ্যে ৫৪টি আসন সংরক্ষিত ছিল।। দলগুলোর মধ্যে তপশিলি জাতির জন্য ৪০টি আসন তপশিলি উপজাতিদের জন্য ১১টি আসন এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত ছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংরক্ষিত আসনগুলোতে ভারতের সাংবিধানিক সংরক্ষণ নীতি অনুসারে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে এই নির্বাচনে তপশিলি জাতি, উপজাতিদের কাছে

পশ্চিমবঙ্গের অন্য ১৮৬টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগও ছিল। প্রাদেশিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক সময় সাধারণ আসনে তপশিলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। স্বাধীনতার পরে নির্বাচনী রাজনীতিতে তপশিলিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তপশিলিদের ৪০টি সংরক্ষিত আসনের সঙ্গে সঙ্গে আরো ছটি অসংরক্ষিত আসনে অর্থাৎ সাধারণ আসনে তপশিলিরা জয়লাভ করেছিল।[35]

[35] Banerjee, Dilip, *Election Recorder: An Analytical Reference,* Kolkata, Star Publishing House, 2012.

সারণি:৫.৩. তপশিলিদের নির্বাচিত সদস্য (১৯৫২-২০১৬)

ক্রমিক নং	বৎসর	সাধারণ	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি	নির্বাচিত বিধায়কের মোট সংখ্যা	আংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত আসন
১.	১৯৫২	১৮৬	৪০	১২	২৩৮	২
২.	১৯৫৭	১৯৪	৪৩	১৫	২৫২	৪
৩.	১৯৬২	১৯৪	৪৩	১৫	২৫২	৪
৪.	১৯৬৭	২০৯	৫৫	১৬	২৮০	৪
৫.	১৯৬৯	২০৯	৫৫	১৬	২৮০	২
৬.	১৯৭১	২০৯	৫৫	১৬	২৮০	১
৭.	১৯৭২	২০৯	৫৫	১৬	২৮০	১
৮.	১৯৭৭	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
৯.	১৯৮২	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১০.	১৯৮৭	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১১.	১৯৯১	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১২.	১৯৯৬	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১৩.	২০০১	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১৪.	২০০৬	২১৮	৫৯	১৭	২৯৪	১
১৫.	২০১১	২১০	৬৮	১৬	২৯৪	১
১৬.	২০১৬	২১০	৬৮	১৬	২৯৪	১

সূত্র: ১৯৫২ থেকে ২০১৬ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical*

Reference, Star Publishing House, Kolkata, 2012*,* পৃ.পৃ. ৩০৭- ৮৮১; ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তথ্য।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের আবেগকে সামনে রেখেই নির্বাচনে জয় লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রায় ২৭টি আসনে জয় লাভ করেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল বাম দলগুলো। বাম দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সি.পি.আই., আর.এস.পি., মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি.এস.পি., প্রজা পার্টি প্রভৃতি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীরা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ হয়। দেশভাগের ফলে আগত আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া উদ্বাস্তুদের একটি বৃহৎ অংশ বামপন্থীদের সমর্থক ছিল। আর্থ সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা দরিদ্র তপশিলিরাই বামপন্থীদের মূলভিত্তি হয়ে ওঠেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১১টি সংরক্ষিত আসনে তপশিলিরা জয়লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীরা এক শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী ২টি নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে বামপন্থীরা উঠে আসেন। এই নির্বাচনগুলোতে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয় লাভ করেন। তপশিলিদের একটি বৃহৎ অংশ কংগ্রেসের অনুগামী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। তপশিলি আসনের মধ্যে ৭৯ শতাংশ আসনে কংগ্রেসের সাফল্য লাভ করেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে জাতপাতের রাজনীতি দেশীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। জাতপাতের রাজনীতি কিছুটা হলেও স্থিমিত হয়ে পড়ে।[36] ১৯৬২'র নির্বাচনে তপশিলিদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ থেকে ৪৫ হয়। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের তুলনায় তপশিলি জাতিদের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা কমে যায়। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়। পূর্ব বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ উদ্বাস্তু শরণার্থীদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে আমুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের

[36] ১৯৬২ সালের নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গবেষক নিজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Banerjee, Dilip, Election Recoorder: An Analytical Reference, Star Publishing House, Kolkata, 2012.

রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বামপন্থী দল ভেঙে সি.পি.আই.(এম.) তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তুরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের ফলে এবং বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে এক জোট রাজনীতির উদ্ভব হয়। রাজনীতিতে তপশিলি ভোটব্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন সংখ্যা ২৫২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮০টি। আসন বিন্যাসের ফলে সাধারণ আসন বৃদ্ধি পাওয়ার তপশিলি জাতিদেরও আসন সংখ্যা বেড়ে যায়। তপশিলি জাতির নিরিখে তপশিলিদের আসন বৃদ্ধি পেয়ে মোট আসন হয়ে দাঁড়ায় ৫৫টি। এই সময় বামপন্থী দল সি.পি.আই.র বিভাজনের ফলে সি.পি.আই.(এম.) তৈরি হলে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে তপশিলিরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তপশিলিদের একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু শ্রমিক, কৃষক তাই এঁদের মতাদর্শগত ভাবে মিল থাকায় সি.পি.আই.(এম.)'র কাছে এঁরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। এই সময় প্রাক্ নির্বাচনী রাজনীতিতে দুটি জোট গঠিত হয়। যার একটি ছিল সংযুক্ত বামপন্থী জোট। যেখানে ছিল সি.পি.আই.(এম.), আর.এস.পি., এস.ইউ.সি. অন্যদিকে ছিল কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সি.পি.আই.(এম.) ও ফরওয়ার্ড ব্লক।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের আধিপত্য ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তপশিলি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশভাগ ও স্বদেশীয়ানার ভাবাবেগের চেয়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এগুলো তপশিল ও উদ্বাস্তু মানুষের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নির্বাচনী রাজনীতিতে জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে তপশিলি গরিব মানুষ জোটবদ্ধ হয়। ফলত এই নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে যায়। ৫৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৩৩টি আসন পায়। যা শতকরা হিসেবে ৪৪.৮০ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের তপশিলি আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৪টি আসন পায়। মুর্শিদাবাদের ২টির মধ্যে ২টি, কলকাতায় ১টির মধ্যে ১টি, মেদিনীপুরে ৫টির মধ্যে ৩টি, বীরভূমে ৪টির মধ্যে ৩টি, বাঁকুড়ার ৪টির মধ্যে ২টি এবং বর্ধমানের ২টি তপশিলি আসনে তারা আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে বামেদের জোট শরিক সি.পি.আই.(এম.), এস. ইউ. সি. আই., যথাক্রমে ১টি করে তপশিলি আসনে জয়লাভ করেন।

এছাড়াও জনসংঘ, পি.এস.পি. ১টি করে আসনে জয়লাভ করেন। নির্দলরাও ১টি আসনে জয়লাভ করেন।

সারণি:৫.৪. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তপশিলি বিধায়ক সংখ্যা (১৯৭৭-২০০৬)

পার্টির নাম	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯৬	২০০১	২০০৬
সি.পি.আই.এম	৩৯	৪২	৪৩	৪০	৩৭	৪৪
ফরোয়ার্ড ব্লক	৫	৫	৪	৫	৫	৫
ফরোয়ার্ড ব্লক (এম)	১	২				
সি.পি.আই (আর)	১	১	৫			
আর. এস. পি	৩	৩		৪	৪	৪
সি.পি.আই	৩	১	১	১	১	
ডবলু.ডি.বি.এস.পি						১
এস.ইউ.সি	৩	১	১	১		১
জনতা	৪					
আই.এন.সি	৩	৩	৩	৮	৩	২
নির্দল		১	১		১	
এ. আই. টি.এম.সি					৭	২

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮০৭।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভদ্রলোক রাজনীতিতে তপশিলি জাতি কংগ্রেসের বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইউ. এল. এফ. ও পি. ইউ .এল. এফ. একজোট হয়ে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। কংগ্রেসের সময় আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, ক্ষমতার অলিন্দে বেশির ভাগই উচ্চবর্ণ। সংরক্ষিত আসন গুলোতে তপশিলিরা জয়লাভ করলেও মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে এঁদের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই কম। এছাড়া কংগ্রেসের সাংগঠনিক রাজনীতি ও সংগঠনের উচ্চপদে তপশিলিদের তেমন স্থান ছিল না। পরে তপশিলিদের অনেক নেতাই কংগ্রেস বিরোধী বাম দলগুলোর সঙ্গে নিজেদের

একাত্ম করে নেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাম দলগুলোর মধ্যে আর.এস.পি.,এস. ইউ.সি., ফরওয়ার্ড ব্লক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পেয়েছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হরেকৃষ্ণ কোঙার সি.পি.আই.(এম.)'র ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, হেমন্ত কুমার বসু ফরওয়ার্ড ব্লকের পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯ জনের মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের বিধায়ক বিধায়ক সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।[37] তপশিলিরা ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এবং সংরক্ষিত আসনে বিধায়ক হিসেবে জয়ী হয়েও মন্ত্রীসভায় এবং দলীয় সংগঠনের উচ্চপদে তাঁদের অবস্থান ছিল খুবই সীমিত। চারুমিহির সরকার বাংলা কংগ্রেস দলের হয়ে হাঁসখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে জয়লাভ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন নমঃশূদ্র। এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক প্রতিপত্তি অন্যান্য তপশিলিদের থেকে অনেকটাই বেশি ছিল। এছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে নমঃশূদ্রদের যে অংশটি এসেছিল তাঁদের অনেকেই শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন। নমঃশূদ্রদের চাপে হাঁসখালির বাংলা কংগ্রেসের বিধায়ক চারুমিহির সরকারকে মন্ত্রীসভায় শ্রমদপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ছিল খুবই। নমঃশূদ্রদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ায় রাজবংশীরা সরকারের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। ফালাকাটার বিধায়ক জগদানন্দ রায়কে রাজবংশী সম্প্রদায় থেকে তপশিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের পদ দেওয়া হয়েছিল। তপশিলি জাতিদের আনুপাতিক হারে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়নি। ক্ষমতার রাজনীতিতে জাতীয় কংগ্রেস ভদ্রলোক শ্রেণীকে, উচ্চবিত্তদের সর্বদায় গুরুত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে রেখেছিলেন।

১৯৬৭ সাল ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক অরাজকতার সময়। এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। বাংলার উচ্চবর্ণীয় কোন নেতাগণ নেতৃত্ব প্রদান করবেন সেই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৬৭ সালের ২রা নভেম্বর ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৭ জন বিধায়ক নিয়ে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট তৈরি করেন। এই ফ্রন্ট মূলত অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন তপশিলি জাতির বিধায়কগণ বিভিন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ২১শে নভেম্বর অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকার গঠনে এগিয়ে এলেও তপশিলি

[37] ১৯৬৭ সালের নির্বাচনী তথ্য।

ও অন্যান্য বিধায়করা সমর্থন না করায় এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭০ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস ৩৩টি আসন পায় এবং বামপন্থীরা দলগতভাবে সাফল্য লাভ করে।[38]

বামপন্থীরা তপশিলি আসনগুলোতে তাদের অবস্থান শুধুই রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এই নির্বাচন থেকে কংগ্রেস তপশিলিদের সমর্থন হারিয়েছিল। নির্বাচনে কংগ্রেসের উপর দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ ওঠে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র ১২টি তপশিলি আসনে জয়লাভ করেন। বাকি ৪৫টি আসনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হন। বামপন্থীদের মধ্যে সি.পি.আই.(এম.) ১০টি, আর.এস.পি. ১টি, এস.ইউ.সি. ৩টি, বাংলা কংগ্রেস ১১টি, সি. পি. আই. ও ফরওয়ার্ড ব্লক ৮টি আসনে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে বামেদের অভূতপূর্ব উত্থান ঘটেছিল। তবে বামপন্থীদের মধ্যে এইসময় শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্বদানের প্রবণতা তৈরি হয়। পার্টির অভ্যন্তরে ও নির্বাচনী রাজনীতিতে শ্রেণীভিত্তিক নেতাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এর ফলস্বরূপ বামেদের নির্বাচনে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব ও ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়নের উপর জোর দেওয়া হয়। বামপন্থীদের বিভিন্ন কৃষক নেতারা গ্রাম অঞ্চলের তপশিলিদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। প্রচার করতে থাকেন যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি তপশিলি ও ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। বামপন্থীদের বিভিন্ন নেতারা গ্রামবাংলায় প্রায় ১০লক্ষ একর খাস জমি চিহ্নিত করতে থাকেন। বামপন্থীরা গ্রামীণ এলাকার খাস জমি চিহ্নিতকরণ ও ভূমিহীন তপশিলি কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে তা বন্টনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই আন্দোলন কর্মসূচির বেশিরভাগ নেতৃত্ব দিয়েছিল উচ্চবর্ণীয় পার্টি ক্যাডাররা। ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করলে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী বামেদের খাস জমি চিহ্নিতকরণ ও তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের বিরোধী ছিলেন। তার কারণ হলো অজয় মুখার্জীর মন্ত্রীসভায় ও বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই বড় মাপের জমির মালিক ছিলেন। যারা এই ভূমি সংস্কার উদ্ভুত জমি বন্টনের বিরোধিতা করেন। একদিকে বামপন্থীদের চাপে অন্যদিকে পার্টির অভ্যন্তরের চাপের কারণে অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

[38] ১৯৭০ সালের নির্বাচনী তথ্য।

১৯৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পড়তে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রচুর পরিমাণে উদ্বাস্তু ও তপশিলিরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে উদ্বাস্তু ও তপশিলিদের বিষয় নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। কংগ্রেস বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ও সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য কংগ্রেসে নিজেদের সাফল্য বলে দাবি করতে থাকেন। অন্যদিকে বামপন্থীরা উদ্বাস্তু ও তপশিলিদের শোষণ ও তাদের এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করতে থাকেন। এই নির্বাচনে সি.পি.আই.(এম.) ও তার সহযোগী দলগুলি ১২৩টি আসনে জয়লাভ করেন।[39] এই নির্বাচনে সি.পি.আই.(এম.) ও তার সহযোগী দলগুলি ২৭টি তপশিলি সংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করেন। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী কংগ্রেস, আর. এস.পি., পি.এস.পি. ও মুসলিম লীগকে নিয়ে সরকার গঠন করেন। অজয় মুখার্জী মন্ত্রীসভায় পি.এস.পি.'র জগদানন্দ রায়কে সমবায় দফতরের ও গোবিন্দচন্দ্র নস্ককে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর স্থান দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলা কংগ্রেস, কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে বামপন্থীদের ভরাডুবি হয়। সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস জোট ৫১টি তপশিলি আসনে জয় লাভ করেন। এঁদের মধ্যে কংগ্রেস ৪০টি এবং সি.পি.আই. ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে তপশিলিদের ব্যাপক সমর্থন কংগ্রেস লাভ করেন। তপশিলি জাতির আসনগুলোর মধ্যে ৯৩% আসনে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সরকার সমর্থন লাভ করেন। ব্যাপকহারে তপশিলিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করা সত্ত্বেও একমাত্র গোবিন্দচন্দ্র নস্কর প্রতিমন্ত্রীর পদ ছাড়া অন্যকোন তপশিলি বিধায়কদের আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয় নি। কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় উচ্চবর্ণীয় নেতারাই বেশিরভাগ মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

সারণি:৫.৫. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা (১৯৫২-১৯৭২)

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭১	১৯৭২

[39] ১৯৭১ সালের নির্বাচনী তথ্য অনুসারের প্রস্তুত করা হয়েছে।

১	কংগ্রেস	১৫০	২১৬	১৫৭	১২৭	৫৫	০	১৫২
২.	কংগ্রেস (আর)	০	০	০	০	০	১০৫	০
৩.	কংগ্রেস(ও)	০	২	০	০	০	২	০
৪.	বাংলা কংগ্রেস	০	০	০	৩৩	৩৩	৫	০
৫.	সি.অই.আই	২৯	৩৫	৫০	১৫	৩০	১৩	৪৬
৬.	সি.পি.এম	০	১৪	০	৪৪	৮০	১১৩	০
৭.	এফ.বি.এম	১২	০	০	১	১	২	৮
৮.	ফরওয়ার্ড ব্লক	০	০	১৩	১৩	২১	৩	০
৯.	ফঃ ব্লক(আর)	২	০	০	০	০	০	০
১০.	এম.এফ.বি	০	১	০	০	০	০	০
১১.	আর.এস.পি	০	২	৯	৬	১২	৩	৩
১২.	কে.এম.পি.পি	১৫	০	০	০	০	০	০
১৩.	পি.এস.পি	০	২১	৫	৭	৫	০	০
১৪.	আর.সি.পি.আই	০	০	০	০	২	১	০
১৫.	ডবল্যু.পি.আই	০	০	০	২	১	২	১
১৬.	বি.বি.সি	০	০	০	০	০	২	০
১৭	ডি.এস.পি	০	০	০	০	০	১	০
১৮.	জি.এল	০	১	২	২	৪	০	২
১৯.	এস.এস.পি	০	০	০	৭	৯	২	০

২০.	এস.এউ.সি	১	২	০	৪	৭	১	১
২১.	এস.এউ.সি.আই	০	০	০	০	০	৭	০
২২.	এম.এল	০	০	০	০	০	৬	১
২৩.	জে.কে.পি	০	০	০	০	০	২	০
২৪.	জে.এস	৯	০	০	১	০	১	০
২৫.	এস.ডবল্যু.এ	০	০	০	১	০	০	০
২৬.	আই.এন.ডি.এফ	০	০	০	০	১	০	০
২৭.	এল.এস.এস	০	০	৪	৫	৪	০	০
২৮.	আই.এন.ডি.(এস.আর.পি)	১	০	০	০	০	০	০
২৯	ডবল্যু.পি	০	০	০	০	১	০	০
৩০	নির্দল ও অন্যান্য	১৫	১৮	২২	১২	১১	৫	৫
	সর্বমোট	২৩৮	২৫২	২৫২	২৮০	২৮০	২৭৯	২৮০

সূত্র: ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৩০৭-৫০২।

কংগ্রেসী নিয়ন্ত্রণে তপশিলিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তপশিলিরা সর্বদাই তাঁদের প্রতিনিধিত্বের বিচারে পিছিয়ে ছিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তপশিলিরা যেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সেরকম কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উদ্ভব হয় নি। অন্যভাবে বলা যায় কংগ্রেস থেকে বামপন্থীদের কেউই তপশিলিদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি হতে দেয়নি।

বাবাসাহেব ডক্টর. বি. আর. আম্বেদকর এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য আন্দোলনকারীরা সরকারের মধ্যে তথাকথিত পিছিয়ে পড়া জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবি করেছিলেন। সেই অভাব অভিযোগ শোনার মত দৃষ্টি কোন সরকারেরই ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের অবস্থান দেখি তাহলে দেখব যে, সরকারে তাঁদের দুর্বল অবস্থান রয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের মত নেতৃত্ব উঠে এলেও স্বাধীন বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে এমন নেতৃত্ব উঠে আসেনি, যাঁরা দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে জাতপাত স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তপশিলি জাতির মাত্র ২জন মন্ত্রীর অস্তিত্ব ছিল। এই ২জন মন্ত্রী হলেন হেমচন্দ্র নস্কর ও মোহিনী মোহন বর্মণ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় কংগ্রেস দীর্ঘসময় পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা ভোগ করলেও উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বগণ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মন্ত্রীসভা ও দলীয় নেতৃত্বের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। ড. বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫২ নির্বাচনের পর হেমচন্দ্র নস্করকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং সতীশ চন্দ্র সিংহ রায়কে পরিবহন দপ্তরের উপ-মন্ত্রীর স্থান দিয়েছিলেন। যা তপশিলিদের আসন সংখ্যার নিরিখে এবং তাঁদের জনসংখ্যার নিরিখে নিতান্তই কম ছিল। এই সময় আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, উচ্চবর্ণীয়রা মন্ত্রীসভায় সংখ্যাধিক্য ছিল। এই সময় মন্ত্রীসভায় ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন ছিলেন উচ্চবর্ণীয় হিন্দু। তপশিলি জাতির ১ জন তপশিলি উপজাতিদের ১ জন এবং মুসলিমদের ১ জন ছিলেন। শতকারা হিসেবে তপশিলি জাতির এই উপস্থিতি ছিল ১৪ শতাংশ ও ৬ শতাংশ। যেখানে মন্ত্রীসভায় উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা দখল করেছিলেন ৭৮ শতাংশ ও ৮০ শতাংশ স্থান।

পঞ্চাশের দশকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। সাথে সাথে জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত সূচিত হয়। গ্রাম বাংলার বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। কৃষিকে কেন্দ্র করে এক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়। এখানে তপশিলিদের ভোটব্যাঙ্ক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে তপশিলিদের ৩ জন মন্ত্রী ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তপশিলি ব্যক্তি রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেননি। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিধায়ক অর্ধেন্দুশেখর নস্করকে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী করা হয়। সার্বিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তপশিলি জাতির উপস্থিতি মাত্র

১৩.৬৯ শতাংশ। যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের স্থান যথাক্রমে ৭৫.৮৬ শতাংশ ও ১০.৮৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতিদের মধ্যে ২টি তপশিলি জাতি রাজবংশীয় ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তপশিলি জাতির নেতৃত্বগণ সবসময়ই বঞ্চিত থেকে গেছে। অথচ তপশিলিদের ভোটব্যাঙ্ক নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের কোন পূর্ণ মন্ত্রী ছিল না। তপশিলিদের প্রবল চাপে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়ে অর্ধেন্দুশেখর নস্কর, প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে উপ-মন্ত্রীর স্থান দিয়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর নস্কর পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের এক দিকপাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর নমঃশূদ্র তথা মতুয়াদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কংগ্রেস সরকার সবসময়ই তপশিলিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস দলের বেশির ভাগ মন্ত্রী উচ্চবর্ণীয় উচ্চবিত্ত ছিলেন। জমিদার, জোতদাররাই কংগ্রেসের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। ১৯৬৭ সালের কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় অর্ধেন্দুশেখর নস্কর ছাড়া তপশিলি জাতিদের আর কোন বিধায়ককে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়নি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের উপস্থিতি ৬ শতাংশের বেশী ছিল না। যেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ৮১ শতাংশ মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন তাপশিলিদের মধ্যে নমঃশূদ্রদের উপস্থিতি ছিল। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের চারুমিহির সরকার অজয় মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রীসভার একমাত্র তপশিলি মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ফালাকাটার রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিধায়ক জগদানন্দ রায়কেকে তপশিলি জাতি ও উপজাতির কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মন্ত্রীসভায় বাগদি সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত কৃষ্ণচন্দ্র হালদারকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়েছিল। তবে মন্ত্রীসভায় তপশীলদের স্থান ৬ শতাংশের বেশি ছিল না। ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ২৯ সদস্যের মন্ত্রীসভায় তপশিলি জাতির কোন পূর্ণ মন্ত্রী ছিল না। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আনন্দমোহন বিশ্বাসকে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের গোবিন্দচন্দ্র নস্করকে শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে এই মন্ত্রীসভায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম তপশিলি জাতির রাজবংশীদের কোন উপস্থিতি ছিল না।

বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির কিছু সম্প্রদায় থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি হলেও বেশিরভাগ তপশিলিরা নির্বাচনী রাজনীতিতে ও ক্ষমতার রাজনীতিতে ব্রাত্য থেকে গেছেন।

সারণি:৫.৬. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতির ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্ব (১৯৫২-১৯৭২)

	১৯৫২	**১৯৫৭**	**১৯৬২**	**১৯৬৭**	**১৯৬৯**	**১৯৭২**
উচ্চ জাতি	৫০	৪১.৭	৪২.৮	৬১.১	৬০.৭	৪২.৮
ব্রাহ্মণ	১৪.৩	১৬.৭	২৮.৬	৩৮.৯	৩২.১	৭.১
কায়স্থ	৩৫.৭	২৫	১৪.৩	২২.২	২৮.৬	৩৫.৭
মধ্যবর্তী জাতি	৩৫.৭	৪১.৬	৫০	২২.২	১৭.৯	১৪.৩
তপশিলি জাতি ও উপজাতি	০	০	০	১১.১	১০.৭	১৪.৩
তপশিলি জাতি	তথ্য নেই	০	০	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই
তপশিলি উপজাতি	তথ্য নেই	০	০	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই
মুসলিমস	১৪.৩	১৬.৭	৭.১	৫.৬	১০.৭	২৮.৬

সূত্র: ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৩০৭-৫০২।

বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রনে তপশিলিদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতা

১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর জোট বহাল ছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হলেও রাজনীতিতে তাদের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। সর্বভারতীয় দলগুলো ছাড়াও অনেক আঞ্চলিক দল ছিল। ক্ষমতার রাজনীতির কাছে এই ছোট ছোট দলগুলো কখনোই প্রতিপক্ষ হয়ে

উঠতে পারেনি। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য বজায় থেকেছে।

সারণি:৫.৭. রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন (১৯৭৭-২০১১)

রাজনৈতিক দল	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬	২০১১
কংগ্রেস	২০	০	০	০	০	০	২১	৪২
কংগ্রেস (আই)	০	৪৯	৪০	০	০	০	০	০
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	০	০	০	৪৪	৮৩	২৬	০	০
কংগ্রেস.(এস)	০	৪	০	০	০	০	০	০
সি.পি.আই	২	৭	১০	৬	৬	৭	৮	২
সি.পি.আই(এম)	১৭৭	১৭৪	১৮৮	১৮৭	১৫৬	১৪৩	১৭৬	৪০
এফ.বি.এম	৩	১	১	০	০	০	০	০
ফরওয়ার্ড ব্লক	২৬	২৭	২৬	০	০	০	২৩	১১
সাঃ ভাঃ ফরওয়ার্ড	০	০	০	২৯	২১	০	০	০
ফরওয়ার্ড ব্লক(এন)	০	১	১	১	০	২৫	০	০
ফঃ ব্লক (এস)	০	০	০	০	১	০	০	০
আর.এস.পি	২০	১৯	১৮	১৮	১৮	১৭	২০	৭
ডাবল্যু.বি.এস.পি	০	০	১	০	০	৪	০	০
তৃণমূল কংগ্রেস	০	০	০	০	০	৬০	৩০	১৮৪
জনতা	২৯	০	০	০	০	০	০	০
জে.পি	০	০	০	১	০	০	০	০
আর.সি.পি.আই	৩	১	১	০	০	০	০	০
বি.বি.সি	১০	০	০	০	০	০	০	০

ডি.এস.এস.পি.সি	২	০	০	১	০	০	০	০
জি.এল	০	১	০	০	০	০	০	০
এস.এস.পি	৪	০	২	০	০	০	০	০
এস.এউ.সি	০	২	০	০	০	০	০	০
এস.এউ.সি.আই	০	০	১	০	০	২	০	১
এম.এল	০	০	১	০	০	০	০	০
সি.পি.এম.এল	১	০	০	০	০	০	০	০
জে.কে.পি.(এন)	০	০	০	০	১	০	০	০
জি.এল.এল.এফ	০	০	০	২	০	৩	০	০
নির্দল ও অন্যান্য	৬	৮	৬	৬	৫	৭	১৬	৭
সর্বমোট	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮৮১।

সারণি:৫.৮. বিভিন্ন দলের তপশিলি বিধায়কদের প্রাপ্ত ভোট শতাংশে (১৯৭৭-২০১১)

	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬	২০১১
মোট বিধায়ক	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪
মোট তপশিলি বিধায়ক	৬৫	৬২	৬৩	৬৬	৬৮	৬২	৬৬	৭২
মোট বিধায়কের মধ্যে শতকরা তপশিলি বিধায়ক	২২.১১	২১.০৯	২১.৪৩	২২.৪৫	২৩.১৩	২১.০৯	২২.৪৪	২৪.৪৯
মোট তপশিলি বিধায়ক সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৬৮

শতকরা তপশিলি বিধায়ক সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৯০.৭৭	৯৫.১৬	৯৩.৬৫	৮৯.৩৯	৮৬.৭৬	৯৫.১৬	৮৯.৩৯	৯৪.৪৪
মোট তপশিলি বিধায়ক সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	০৬	০৩	০৪	০৭	০৯	০৩	০৭	০৪
শতকরা তপশিলি বিধায়ক সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৯.২৩	৪.৮৪	৬.৩৫	১০৬১	১৩.২৪	৪.৮৪	১০.৬১	৫.৫৬

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮৮১।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা সর্বদা শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বামপন্থীদের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব বাস্তবের নির্বাচনী রাজনীতিতে কার্যকরী হয়নি। বামপন্থীরা জাতপাত ব্যবস্থাকে গ্রহণ না করলেও তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারেননি। নির্বাচনী রাজনীতিতে জাতপাতকে তারা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা শ্রেণীভিত্তিক কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ কোন জাতপাতের ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে গুরুত্বের বিচার না করে গরিব মেহনতী শ্রেণীর ভিত্তিতে নেতৃত্বের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে অস্থিরতার অবসান হয়। পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়েপড়া তপশিলি সম্প্রদায় রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটবে বলে সকলে আশা করেছিলেন। তপশিলি ভোটব্যাঙ্ক বামফ্রন্ট সরকারকে ও তার শরিক দলগুলোকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হয় ৫৯টি। এই সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে ৪৯টি তপশিলি সম্প্রদায় জয়লাভ করেন। এঁদের মধ্যে সি.পি.আই.(এম.) ৩৯টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ১টি, আর সি. পি. আই. ও এ.টি.এম.সি.পি ৩টি আসনে জয়লাভ করেন।

সারণি:৫.৯. পার্টি অনুসারে তপশিলি বিধায়ক সংখ্যা (১৯৭৭-২০০৬)

পার্টির নাম	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯৬	২০০১	২০০৬
সি.পি.আই.এম	৩৯	৪২	৪৩	৪০	৩৭	৪৪
ফরোয়ার্ড ব্লক	৫	৫	৪	৫	৫	৫
ফরোয়ার্ড ব্লক (এম)	১	২				
সি.পি.আই (আর)	১	১	৫			
আর. এস. পি	৩	৩		৪	৪	৪
সি.পি.আই	৩	১	১	১	১	
ডবলু.ডি.বি.এস.পি						১
এস.ইউ.সি	৩	১	১	১		১
জনতা	৪					
আই.এন.সি	৩	৩	৩	৮	৩	২
নির্দল		১	১		১	
এ. আই. টি.এম.সি					৭	২

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮০৭।

১৯৭৭ সালের এই নির্বাচনে তপশিলি সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বামফ্রন্টকে সমর্থন করেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের সকল আসনে বামফ্রন্ট আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তরবঙ্গের ১২টি তপশিল আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ১০টি আসন জয়লাভ করে। দক্ষিণবঙ্গে যে ৪০টি তপশিল সংরক্ষিত আসন রয়েছে তাতে কংগ্রেস শুধুমাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করেন এবং বামফ্রন্ট ৩৯টি আসনে জয়লাভ করেন। এস. ইউ.সি. ও জনতা দল আলাদা আলাদা ভাবে ১টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৮২ নির্বাচনে ৫৪টি তপশিলি আসনে বামফ্রন্ট জয়লাভ করেন। সি.পি.আই.(এম.) ৪২টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টি, আর.এস.পি. ৩টি, আর. এস.পি. ১টি, সি.পি.আই. ১টি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড পার্টি ২টি আসনে জয়লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তপশিলি সম্প্রদায় সর্বদাই বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়োজনীয় শক্তি হিসেবে ভোট ব্যাংক

হিসেবে কাজ করেছে। পার্টির উচ্চতর নেতৃত্ব ও সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে এঁদের অবস্থান নিতান্তই কম ছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস একটি প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তপশিলিদের ৭টি আসনে জয়লাভ করেন।[40] বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে যে শ্রেণী চেতনার রাজনীতি ও শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির মধ্য দিয়ে জাতপাতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রন করতেন তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। তপশিলি সম্প্রদায় বাম নিয়ন্ত্রণের ধারা থেকে এক নতুন পথের সন্ধান পায়।

সারণি:৫.১০. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের হার (১৯৭৭-২০০৬)

রাজনৈতিক দল/প্রতিদ্বন্দ্বি আসন/শতকরা ভোটের হার	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬
সর্বমোট আসন সংখ্যা	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪
কংগ্রেস(প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৮৮	৬০	২৬২
ভোটের শতকরা হার	২৩.৩৫	৪২.০৭	৪১.৮০	৩৬.২৬	৪০.২১	৩৯.৭০	১৪.৭১
সি.পি.আই (প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)	৬৩	১২	১১	১২	১২	১৩	১৩
ভোটের শতকরা হার	১২.৬৭	৪৭.৭৭	৫২.০৯	৪৬.৫৫	৪৬.৩৮	৪৩.২৫	১.৯১
সি.পি.আই(এম) (প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)	২২৩	২০৯	২১৪	২১২	২১৭	২১১	২১২
ভোটের শতকরা হার	৪৬.২৮	৫৩.৭৩	৫৩.৬২	৪৯.৯০	৫০.৪৮	৪৯.৯৬	৩৭.১৩
ফরওয়ার্ড ব্লক(প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)	৪০	৩৫	৩৫	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪
ভোটের শতকরা হার	৪৪.৮৯	৫১.২৩	৫০.৭০	৪৮.১২	৪৫.৪৮	৪৯.৫৮	৫.৬৬

[40] ২০০১ সালের নির্বাচনী তথ্য, পশ্চিমবঙ্গ।

আর.এস.পি(প্রতিদ্বন্দ্বীআসন)	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
ভোটের শতকরা হার	৪৬.৯৮	৫০.৫২	৫১.০৮	৪৫.১১	৪৮.৮৩	৪৫.৯৬	৩.৭১
ভারতীয় জনতা পার্টি(প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)		৫৪	৫৭	২৯২	২৯২	২৬৬	২৯
ভোটের শতকরা হার		৩.৪৬	২.৬৮	১১.৪৪	৬.৪৯	৫.৬৯	১.৯৩
সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস(প্রতিদ্বন্দ্বি আসন)						২২৬	২৫৭
ভোটের শতকরা হার						৩৯.৪২	২৬.৬৪

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮০৭।

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোট দেখলে বোঝা যায় যে, বামপন্থী দলগুলো একচ্ছত্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার অলিন্দে ছিল। বামফ্রন্টের যৌথ ভোটের কাছে অন্য দলগুলো কোনোভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামফ্রন্ট তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছেন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক শ্রেণীদের প্রাধান্য বজায় ছিল। ২০১১ সালের নির্বাচনে তপশিলিদের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৮টি। এই আসনগুলোতে বামফ্রন্টের সি.পি.আই.(এম.) ১২টি, আর.এস.পি. ২টি, সি.পি.আই. ১টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ৫টিতে জয়লাভ করেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তপশিলিদের ৩৭টি আসনে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস ১০টি আসন ও ১টি আসনে এস. ইউ. সি. জয় লাভ করেন। এই নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ১৭টি আসনের মধ্যে বামেরা মাত্র ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলো ১২টি আসনে জয়লাভ করেন। দক্ষিণবঙ্গের ২৪টি তপশিলি জাতির আসনের মধ্যে ২০টি বামপন্থীদের হাতছাড়া হয়। ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের থেকে তপশিলিরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তপশিলিদের একটি মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তপশিলিদের সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা ও তপশিলিদের আলাদা নেতৃত্ব তৈরির জন্য আলাদা রাজ্যের দাবি জানায়। দক্ষিণবঙ্গের নমঃশূদ্র ও মতুয়ারা তাঁদের রাজনৈতিক দাবি দাওয়া ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

জনপ্রতিনিধি বনাম ক্ষমতার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব

১৯৫২ থেকে **১৯৭২** পর্যন্ত বিধানসভার বিধায়কদের সংখ্যা যদি দেখা যায় তাহলে দেখবো যে, বিধানসভায় উচ্চবর্ণ প্রাধান্য অনেক বেশি।[41] বিধানসভায় রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা সবথেকে বেশি। চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, শিল্পপতি, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিকের মতো অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে। অশিক্ষিত, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বা নেতা ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা খুবই কম। প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম ছিল। প্রান্তিক গ্রামীণ ও তপশিলিদের রাজনৈতিক গুরুত্ব তেমন ছিল না। উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণীয়দের প্রতিনিধিরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছে।

সারণি:৫.১১. বিধানসভায় বিধায়কদের পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ধারণা (১৯৫২-১৯৭২)

পেশা	সংখ্যা
চিকিৎসক	২৭
আইনজীবী	৩২
রাজনৈতিক কর্মী	৬৭
শিক্ষক	৩১
শিল্পপতি	১
ব্যবসায়ী	১৪

[41] বিধানসভা প্রসেডিংস।

চাকরিজীবী	৪
প্রযুক্তিবিদ	২
সাংবাদিক	৪
কৃষিজীবী	২৪
জোতদার	৫
জমিদার	৮
ট্রেড ইউনিয়ন	১৭
ভূমিহীন / ক্ষেতমজুর	১
তথ্য নেই	১১

সূত্র: সদস্যদের পেশা শিক্ষা ও বয়স নিয়ে বিধানসভা কর্তৃক প্রকাশিত।

সারণি:৫.১২. বিধানসভার সদস্যদের শিক্ষাগত মান (১৯৫২-১৯৭২)

শিক্ষাগত মান	সংখ্যা	শিক্ষাগত মান	সংখ্যা
প্রাথমিক শিক্ষা	১৬	মেট্রিকুলেশন	৩২
প্রাক স্নাতক	৪	স্নাতক	৭৮
স্নাতকোত্তর	৩৮	তথ্য নেই	৩৯

সূত্র: সদস্যদের পেশা শিক্ষা অভ্যাস ইত্যাদি নিয়ে বিধানসভা কর্তৃক প্রকাশিত ।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় গরিব সর্বহারা মানুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য বেশি ছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত স্নাতক পাশ বিধায়কদের সংখ্যা ছিল ৭৮ জন। স্নাতকোত্তর বিধায়কদের সংখ্যা ছিল ৩৮ জন। মেট্রিকুলেশন ও সমমানের বিধায়ক সংখ্যা ছিল ৩২ জন। প্রাথমিক শিক্ষা পাশ বিধায়কদের সংখ্যা ১৬ জন। সামগ্রিকভাবে বিচার করে বলা যায়, উচ্চবর্ণীয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিধানসভায় আধিপত্য ছিল।

সারণি:৫.১৩. পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় জাতপাত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব(১৯৫২-১৯৭২) (শতকরা হিসাব মোট মন্ত্রীসভার)

	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭২

উচ্চবর্ণ	৫০	৪১.৭	৪২.৮	৬১.৭	৬০.৭	৪২.৮
ব্রাহ্মণ	১৪.৩	১৬.৭	২৮.৬	৩৮.৯	৩২.১	৭.১
ক্ষত্রিয়	৩৫.৭	২৫	১৪.৩	২২.২	২৮.৬	৩৫.৭
মধ্যবর্তী	৩৫.৭	৪১.৬	৫০	২২.২	১৭.৯	১৪.৩
এসসি এসটি	০	০	০	১১.১	১০.৭	১৪.৩
মুসলিম	১৪.৩	১৬.৭	৭.১	৫.৬	১০.৭	২৮.৬

সূত্র: ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৩০৭-৫০২।

১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মন্ত্রীসভা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে উচ্চবর্ণের প্রাধান্য ছিল। প্রথম তিনটে বিধানসভাতে তপশিলিদের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। সংখ্যালঘুদের সামান্যতম উপস্থিতি থাকলেও তপশিলিরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের বেশি প্রাধান্য ছিল। এছাড়াও মধ্যবর্তী বর্ণ ও কায়স্থদের প্রাধান্য ছিল। ক্ষমতার রাজনীতিতে তপশিলিদের তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না। তপশিলিরা শুধুমাত্র ভোট ব্যাংক হিসেবেই থেকে গেছেন।

সারণি:৫.১৪. বিধানসভার সদস্যদের পেশাগত বিভাজন (২০০১-২০০৬)

পেশা	সংখ্যা	পেশা	সংখ্যা
চিকিৎসক	৭	শিল্পপতি	১
আইনজীবী	১৯	ব্যবসায়ী	১৫
রাজনৈতিক কর্মী	১০৩	প্রশাসক	২
শিক্ষক	১০৭	প্রযুক্তিবিদ	৩
কৃষিজীবী	১৮	অভিনেতা অভিনেত্রী	২
ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী	১	গৃহবধূ	১
তথ্য নেই	২	ক্ষেতমজুর	০

সূত্র: ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৭০৪-৮০৭।

সারণি:৫.১৫. বিধানসভার সদস্যদের শিক্ষাগত মান (২০০১-২০০৬)

শিক্ষাগত মান	সংখ্যা	শিক্ষাগত মান	সংখ্যা
প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা	১	স্নাতক	১৩৬
স্কুল পর্যায়	২১	স্নাতকোত্তর	৫১
মেট্রিকুলেশন ও সমপর্যায়ে	৫২	পিএইচডি	৬
প্রাক স্নাতক	২২	তথ্য নেই	৬

সূত্র: সদস্যদের পেশা শিক্ষা ও বয়স ইত্যাদি নিয়ে বিধানসভা কর্তৃক প্রকাশিত হু জহু(২০০৬)

উপরের সারণি থেকে এটা বোঝা যায় যে, কংগ্রেসের সময় থেকে বিধানসভার সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। কংগ্রেসের সময়ে জমিদার ও জোতদাররা বিধানসভার সদস্য হিসেবে ক্ষমতার রাজনীতিতে ছিলেন। কিন্তু বাম সময়কালে বিধানসভায় জমিদারদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় না। ভূমি সংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জমিদার শ্রেণীর অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের গরিব কৃষক ও মেহনতী মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হয় বলে বামপন্থীরা যে দাবি করেন তা অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিধানসভায় ভূমিহীন চাষী, ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিধানসভায় উচ্চবর্ণ ও শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের সংখ্যাই বেশি ছিল। চিকিৎসক, আইনজীবীর পাশাপাশি শিক্ষকদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গ্রামীণ এলাকায় বামেরা শিক্ষকদের কাজে লাগিয়ে কৃষক ও শহরে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। ফলে গ্রাম বাংলার চাষী, ক্ষেতমজুর ও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে অনেক শিক্ষকরাই বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মীদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। বামপন্থীরা যে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে সামনে রেখে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে তাদের অস্তিত্বের লড়াই বলে মনে করেন, সেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সংখ্যা অনেকটাই কমতে থাকে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পি.এইচ.ডি.

ডিগ্রিধারী বিধায়কের সংখ্যা চার দশকে অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৫ জন বিধায়ক তথ্য দেয়নি। তাঁদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ।[42] পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণী সর্বদা রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। সরকার পরিচালনা ও পার্টি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চবর্ণীয়রাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সারণি:৫.১৬. জাতি অনুসারে তপশিলিদের সংরক্ষিত বিধানসভার বিধায়ক (১৯৭৭-২০১১)

তপশিলি সম্প্রদারের নাম	১৯৭৭	১৯৮৭	১৯৯৬	২০০৬	২০১১
রাজবংশী	১১	১১	১২	১২	১৪
নমঃশূদ্র	৭	৫	৫	৬	৮
বাগদি	১৫	১২	১৪	১৭	১৪
পৌণ্ড্র	১২	১৩	১০	৯	১১
বাউড়ি	৫	৩	২	৪	৩
ধোবা	০	১	২	০	২
শুরী	৪	০	২	২	৪
মাল	১	১	১	১	০
অন্যান্য	৪	১৫	১১	৮	১২
সর্বমোট	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৬৮

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮৮১।

সারণি:৫.১৭. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতির ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্ব (১৯৭৭-২০০১)

	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১
উচ্চ জাতি	৭৩.৯	৮১.৮	৭২.৭	৭১	৬৭.৫	৫১.৫

[42] বিধানসভা প্রসেডিংস, ২০০১-২০০৬।

ব্রাহ্মণ	৩৯	৩৬.৪	৪০.৯	৪১.৯	৪৫.৯	৩০.৩
কায়স্থ	৩৪.৮	৪৫.৪	৩১.৮	২৯	২১.৬	২১.২
মধ্যবর্তী জাতি	১৭.৪	১৩.৬	৯	৬.৪	৮.১	৬
তপশিলি জাতি ও উপজাতি	১৭.৪	১৩.৬	৯	৬.৪	৮.১	৬
তপশিলি জাতি			৯	৩.২	১৩.৫	১৮.২
তপশিলি উপজাতি			০	০	২.৭	৩
মুসলিমস	৮.৭	৪.৬	৯	১৬.১	১০.৮	১৮.২

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮৮১; পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মন্ত্রীগণ বিধানসভা কর্তৃক প্রকাশিত হু জ হু(২০০৬)।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণের শতকরা হিসাব করলে দেখা যাবে যে, উচ্চবর্ণীয় প্রাধান্য সর্বদা রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সব থেকে বেশি। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের মন্ত্রীসভায় সর্বাধিক সংখ্যা ছিল। এছাড়াও কায়স্থ ও মধ্যবর্তী জাতের মন্ত্রীসভায় সংখ্যাধিক্য থাকলেও তপশিলি জাতি উপজাতি ও মুসলিমদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ভদ্রলোকদের আধিপত্যে তপশিলি জাতীয় উপজাতিরা শুধুমাত্র নির্বাচিত বিধায়ক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। অল্পসংখ্যক বিধায়ক মন্ত্রীত্ব লাভ করলেও তা ছিল নামে মাত্র মন্ত্রী। হুগলি জেলার প্রাক্তন সি.পি.আই. (এম.) বিধায়ক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন যে, ৭৭ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছি। অনেকবার ভোটের আগে মন্ত্রীত্ব দেওয়ার প্রশ্ন আসলেও নির্বাচনের পরে উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখায় করা যেত না। এমনকি

উচ্চবর্ণের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে দিনের পর দিন ঘরের সামনে বসে থাকতে হতো। নির্বাচন এলে আমাদের সকলের যারা বিভিন্ন জাত পাতের রয়েছে তাদের কদর বেড়ে যেত।[43]

সারণি:৫.১৮. নির্বাচিত তপশিলি বিধায়ক বিধানসভা (১৯৭৭-২০১১)

	১৯৭৭	১৯৮২	১৯৮৭	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬	২০১১
মোট বিধায়ক	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪	২৯৪
মোট তপশিলি বিধায়ক	৬৫	৬২	৬৩	৬৬	৬৮	৬২	৬৬	৭২
মোট বিধায়কের মধ্যে শতকরা তপশিলি বিধায়ক	২২.১১	২১.০৯	২১.৪৩	২২.৪৫	২৩.১৩	২১.০৯	২২.৪৪	২৪.৪৯
মোট তপশিলি বিধায়ক সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৬৮
শতকরা তপশিলি বিধায়ক সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৯০.৭৭	৯৫.১৬	৯৩.৬৫	৮৯.৩৯	৮৬.৭৬	৯৫.১৬	৮৯.৩৯	৯৪.৪৪
মোট তপশিলি বিধায়ক সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	০৬	০৩	০৪	০৭	০৯	০৩	০৭	০৪
শতকরা তপশিলি বিধায়ক সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছেন	৯.২৩	৪.৮৪	৬.৩৫	১০৬১	১৩.২৪	৪.৮৪	১০.৬১	৫.৫৬

[43] সাক্ষাৎকার, সহদেব মাঝি, (পরিবর্তিত নাম), হুগলি, ২০১৯।

সূত্র: ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- Dilip Banerjee, *Election Recorder: An Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012,* পৃ.পৃ. ৫০৩-৮৮১।

পশ্চিমবঙ্গে উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনী রাজনীতিতে তপশিলিদের প্রাধান্য ছিল। শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনেই নয়, সাধারণ আসনে নির্বাচিত হতেন। যদিও তা শতাংশের হার অনেকটাই কম। পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত আসন ছাড়া অনেক সাধারণ আসন আছে যেখানে তপশিলিদের প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনী রাজনীতিতে তপশিলিরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অনেক বিধানসভা রয়েছে যেখানে তপশিলিরা নির্ণয় ভূমিকা পালন করেন।

সারণি:৫.১৯. পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যা

বছর	মোট	সি.পি.আই (এম)	আর.এস.পি	ফরোয়ার্ড	সি.পি.আই	আই.এন.সি	বি.জে.পি	অন্যান্য
১৯৭৮	৪৬৪০১	২৮১০৫ ৬০.৬%	১৬৭৪ ৩.৬%	১৫৩৯ ৩.৩%	৮২৫ ১.৮%	৪৫৩৬ ৯.৮%	- -	৯৭২২ ২১%
১৯৮৩	৪৫৮৭৫	২৪৪১০ ৫৩.৪%	১২৪১ ২.৭%	১০৮৪ ২.৪%	৭১৬ ১.৬%	১৪৭৩৩ ৩২.৩%	৩৪ ০.১%	৩৪৫৭ ৭.৬%
১৯৮৮	৫২৪৭৩	৩৩৮৩৪ ৬৪.৫%	১৫৮১ ৩.০%	১৩৯৮ ২.৭%	৯০৭ ১.৭%	১২২৩৯ ২৩.৩%	৩২ ০.১%	২৪৮২ ৪.৭%
১৯৯৩	৬০৯৬৫	৩৫৩৪২ ৫৮%	১৫২৬ ২.৫%	১২৩৮ ২%	৭৯৯ ১.৩%	১৬২৯২ ২৬.৭%	২৩৬৭ ৩.৯%	৩৪০১ ৫.৬%

সূত্র: পঞ্চায়েতরাজ, বিশেষ নির্বাচন সংখ্যা মে-জুন ১৯৯৩, পঞ্চায়েত বিভাগ, পশ্চিমবাংলা সরকার, পৃ. ৪-১৬

সারণি:৫.২০. **১৯৯৩** সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব[44]

	গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ।
এসসি মহিলা	১৪.৪	১৪.৫	১৩.৩
এসসি পুরুষ	২৪.১	২৩.৩	২৪.৫
মোট এসসি	৩৮.৫	৩৯.৮	৩৭.৮
এসটি মহিলা	৩.০	৩.২	৩.২
এসটি পুরুষ	৪.৪	৩.৯	৩.৮
মোট এসটি	৭.৪	৭.১	৭
মোট মহিলা	৩৫.৫	৩৪.৬	৩৬.১

Source: government of West Bengal, development and planning department, West Bengal human development report, 2004, (Kolkata: government of West Bengal: may2004)

১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। জাতি উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হওয়ায় উচ্চবর্ণের আধিপত্য কমতে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে তপশিলি জাতি ও উপজাতীয় মহিলাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক রাজনৈতিক নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ব্যর্থ হয়। এতে ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের নীতি নতুন কৌশল অবলম্বন করে। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে উচ্চবর্ণের যে সদস্যগণ নির্বাচিত হন, তাঁরা বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে নির্বাচিত হলেও তাঁরা ছিলেন নামে মাত্র। পার্টির জোনাল কমিটি ও লোকাল কমিটির উচ্চবর্ণের সদস্যরা মূল নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতেন। ধীরেন বাগদি একদা গ্রাম প্রধান ছিলেন। তিনি জানান যে, প্রধান হিসাবে

[44] Government of West Bengal, Development and Planning Department, West Bengal Human Development Report, 2004, Government of West Bengal, Kolkata, May 2004.

দায়িত্ব পালনের সময় যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো তা পার্টি মিটিংয়ে আগে থেকেই নির্ধারিত হতো। পার্টির নির্দেশ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত না। এমনকি কোন সদস্য কি দায়িত্ব পালন করবেন তাও পার্টি ঠিক করে দিতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[45] এককথায় বলা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজে তপশিলি জাতিদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বাড়লেও তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতার উত্তরণ ঘটেনি।

সারণি:৫.২১. ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সামাজিক প্রতিনিধিত্ব[46]

	গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ।
এসসি	৩৫.৮৬	৩৫ .৩৯	৩৪.৪০
এসটি	৮.৫২	৮.২১	৮.৫২
মুসলিম	৫.৭৪	৫.৬০	৪ .২৬
উচ্চ বর্ণ	২৫.৯৪	২৭.৮৬	৩২.৫৬
অন্যান্য	০.৫৬	০.৫৩	০.৬১

Source: government of West Bengal, department of panchayats and rural development, informations on West Bengal panchayat, (Kolkata, boys Bengal, August, 2010)

পর্যবেক্ষণ

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জমিদার, জোতদার উচ্চশিক্ষিত কংগ্রেস নেতাদের আধিপত্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জনসংখ্যার বিচারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সংরক্ষিত আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও সাধারণ আসনে কখনোই সুযোগ পাননি। জনঘনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে তপশিলিদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ছিল যারা শুধুমাত্র ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করেছেন। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এক বৃহৎ অংশে শ্রমিক, গরিব উদ্বাস্তু মানুষের

[45] সাক্ষাৎকার, ধীরেন বাগদি, হুগলি, ২০১৯।

[46] Government of West Bengal, Department of Panchayats and Rural Development, Informations on West Bengal Panchayat, Boys Bengal, August, Kolkata, 2010.

আগমন ঘটে। যাঁরা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সর্বদা ভোট ব্যাংক হিসেবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রনে ছিলেন। তপশিলিদের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে গ্রামীণ বিধানসভায় তারা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতেন। গ্রামের অধিকাংশ জনবসতি তপশিলি হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস সর্বদা গ্রামীণ অর্থনীতি ও রাজনীতিকে জমিদার, জোতদার ও উচ্চবিত্ত কৃষকদের দ্বারা পরিচালনা করতেন। গ্রামীন নেতৃত্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হতো। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিধানসভার মন্ত্রীসভার দিকে লক্ষ্য করা গেলে দেখা যাবে যে, মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের তেমন স্থান ছিলনা। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এঁদের অবদান নিতান্তই কম ছিল।

১৯৭৭ সালে সরকার পরিবর্তনের পরে বামপন্থীরা শ্রেণী কেন্দ্রিক রাজনীতি ও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি করে তাতে তপশিলিদের স্থান খুবই নগণ্য ছিল। জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে শ্রেণী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক তত্ত্ব সামনে নিয়ে আসা হয়। তাতে গ্রামীণ এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তপশিল বর্জিত থেকে যায়। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হলে তাতে উপমন্ত্রীর পদ তুলে দেওয়া হয়। বামফ্রন্টের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকার তপশিলি জাতির প্রবেশ করার সুযোগ খুব কমই ছিল। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের তপশিলি জাতির একমাত্র কান্তি বিশ্বাসকে যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মন্ত্রী করা হয়। ৩০ সদস্যের মন্ত্রীসভার মধ্যে মাত্র ৩.৩ শতাংশ তপশিলি জাতির অন্তর্গত ছিল। সার্বিক বিচারে যা মন্ত্রীসভার মধ্যে সর্বনিম্ন।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভাতেও তপশিলিদের আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে ৯১.২ শতাংশ সংরক্ষিত আসন দখল করল বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় মাত্র ৪.৪ শতাংশ মন্ত্রী। এই মন্ত্রীসভায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কান্তি বিশ্বাসকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বনমালী রায়কে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়। তৃতীয় বামফ্রন্টের সময় কিছুটা উন্নতি হলেও তা আসন সংখ্যার নিরিখে ছিল খুবই কম। এই মন্ত্রীসভায় কান্তি বিশ্বাস, বনমালী রায় ছাড়াও দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া স্থান পেয়েছিলেন। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় দুজন রাজবংশী জাতি থেকে মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। বাগদি ও বাউরি অঞ্চল থেকে ১ জন করে মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।

পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের অবস্থানের উন্নতি হলেও তা হয় ১০ শতাংশ। কান্তি বিশ্বাস, দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, যোগেশ চন্দ্র বর্মণ, নিমাই চন্দ্র মাল, বিলাসী বালা সহিস প্রমুখরা তপশিলিদের মধ্যে মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়কালে মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের অবস্থান গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের হার ছিল যথাক্রমে ১৬.৭০ শতাংশ। এই মন্ত্রীসভায় ৫ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৩জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সর্বোপরি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের ও নেতৃত্বের গুরুত্ব সর্বদাই বেশি ছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পিছিয়ে পড়া সামাজিক অংশকে জাতপাতের পরিবর্তে শ্রেণীর ধারণা দ্বারা চিহ্নিত করলেও তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তরণ তেমন ঘটেনি। অর্থাৎ বামপন্থীরা শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তপশিলি জাতির নেতৃত্বরা রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে ছিলেন। সার্বিক বিচারে তাই বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণীয় রাজনীতিবিদরাই শ্রেণীর মোড়কে ক্ষমতার অলিন্দে বিরাজ করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতির বহুকৌনিক অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম শাসনের পরে ২০১১ সালে বাম সরকারের পতন ঘটে। ৩৪ বছরের বাম সরকারের সময় পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতি কখনোই চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেনি। এই সময়কালের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে লড়াই করেছেন। জনসংখ্যার বিচারে ও জনঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিরা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। এতদসত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাম কিংবা ডান সকল রাজনীতিতে তপশিলিরা অবহেলিত থেকেছেন। কংগ্রেস শাসনের সময় জমিদার, জোতদার উচ্চক্ষমতার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কংগ্রেস অবসানের পর বাম শাসনের সময় উচ্চবর্ণীয়দের আধিপত্য বাড়তে থাকে। ফলে তপশিলিরা পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র ‘ভোট ব্যাংক’ হিসেবে রয়ে গেছে।

বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতি শ্রেণী রূপে উত্তরণ ঘটে। দীর্ঘ বাম শাসনের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাতপাত ভিত্তিক গোষ্ঠী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি সংরক্ষণের দাবি জানায়। আত্মপরিচিতির রাজনীতিতে রাজবংশী সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার। এই দাবিকে সামনে রেখে তাঁরা আলাদা রাজ্যের দাবিও করতে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের প্রধান তপশিলি জাতি নমঃশূদ্র, মতুয়ারা তাঁদের উদ্বাস্তু নাগরিকত্বের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। জাতপাত ভিত্তিক এই রাজনৈতিক সমীকরণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহমত বা সমর্থন করেন। এতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি পরিবর্তন অনেকটাই জমিকে কেন্দ্র করে। জমি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন

এসেছে। বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পেছনে এই জমি আন্দোলন অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভূমি সংস্কার আন্দোলন জমির পাট্টা প্রদান, কৃষি মজুর সংগঠনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল তপশিলি সম্প্রদায়। এই কৃষক সম্প্রদায়ের জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত রাজনীতি শ্রেণী রূপ ধারণ করে। জাতপাত জনগোষ্ঠীর এই শ্রেণী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। অবশেষে ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ বাম শাসনে ভদ্রলোক শ্রেণী রাজনীতির অবসান ঘটে। এর মধ্য দিয়ে জাতপাত ভিত্তিক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক তপশিলিদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতপাতের রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং ভারতের মোট তপশিলি জাতিগুলির জনসংখ্যার ১১.০৭ শতাংশ। এই নিরিখে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থান উত্তর প্রদেশ। উত্তরপ্রদেশে ভারতের মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার ২১ শতাংশ বাস করে। তৃতীয় স্থানে বিহার। সমগ্র ভারতের মোট তপশিলি জাতির ৭ শতাংশ সেখানে বসবাস করে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার তপশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যার নিরিখেও পশ্চিমবঙ্গের আগে পাঞ্জাবে ২৮ শতাংশ এবং হরিয়ানাতে ২৪.৭ শতাংশ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে রয়েছে (২৩) শতাংশ ।[1] পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ দলিতের বাস। তাঁরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। এই বিপুল জাতপাতের কারণে মোট জনসংখ্যার দলিতের অনুপাতের নিরিখে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে পশ্চিমবাংলার স্থান তৃতীয়।[2] ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের সাক্ষরতার হার ৫৯ শতাংশ। ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সাক্ষরতার হার এ রাজ্যের স্থান নিচের দিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে যুগ্মভাবে ২০তম। বস্তুত ভারতের ১২টি রাজ্যের দলিতদের সাক্ষরতার হার পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরতার হারের ৬৮.৬শতাংশ থেকে বেশি। দলিত সম্প্রদায় জীবনধারণের

[1] বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১২১।

[2] রানা, সন্তোষ, রানা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত আদিবাসী,* ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১২১।

জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের জীবিকার জন্য সর্বভারতীয় প্রবণতা অনুসরণ করে। ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা ২০ শতাংশ। সেখানে পশ্চিমবাংলার দলিতদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১৬ শতাংশ।[3] এই বিচারেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অনন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে।

১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক পরিসর তৈরি হয়েছে। এই শ্রেণীভিত্তিক পরিসরে জাতপাতের পরিচয়কে অবজ্ঞা করা হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ হিসেবে বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি, বাম মতাদর্শ, ও উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক শ্রেণী কর্তৃত্ববাদী শাসনকেই দায়ী করা হয়। দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এক 'বাম সংস্কৃতি' তৈরি হয়। এই বাম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় 'মতাদর্শ' ও 'আদর্শ'কে গ্রহণ করেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জাতপাত ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে কখনোই প্রাধান্য দেয়নি। ফলস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষ জাতপাত নিরেপেক্ষ এক সংস্কৃতির তৈরি হয়েছে যা জাতি রাজনীতিকে সুসংবদ্ধ ভাবে প্রশমিত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৩১ পর প্রাদেশিক নির্বাচনগুলোতে জাতপাতের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশরা এই জাতপাতের রাজনীতিকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতীয় কংগ্রেস এর সদ্ব্যবহার করেছেন। বামেরা নীতিগত প্রশ্নে জাতপাতের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা শ্রেণী রাজনীতির পত্তন করেছিলেন। বাম আমলে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু কলকাতাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদদের প্রাধান্য ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থরাই মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে পরিচালিত করতেন। অন্যদিকে তপশিলিরা বেশিরভাগই গ্রামে বসবাস করতেন। অনেকেই ছোট ব্যবসা, শিল্প, শ্রমিক এমনকি দিনমজুরের কাজ ও জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু উচ্চবর্ণীয়দের সাংস্কৃতিক অবস্থান, শিক্ষা, চাকরি অথবা মধ্যবিত্ত পেশায় প্রবেশ করার সুযোগ অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি ছিল।[4] বাম আমলে ভূমি সংস্কার করার ফলে জাতপাতের গ্রামীণ মানুষরা অনেকটাই সুবিধা ভোগ করবেন বলে আশা করা হয়। জমিদারি প্রথার অবসান এবং ক্রমান্বয়ে ভূমি সংস্কার ও কৃষক

---

[3] রানা, সন্তোষ, রানা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত আদিবাসী,* ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১২২।

[4] চট্টোপাধ্যায়,পার্থ *জন প্রতিনিধি প্রবন্ধ সংকলন* , অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০৩।

আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবাংলার গ্রামের উচ্চবর্ণের ব্যাপকহারে জমি ছেড়ে শহরে বিশেষ করে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। [5]

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসি জমিদার ও উচ্চবিত্তদের প্রাধান্য অনেকটাই কমে আসে। বামফ্রন্ট কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিকদের বেশি গুরুত্ব দিতে থাকেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে তা সত্ত্বেও বামফ্রন্টের মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দুত্বের আধিপত্য কমলো না কেন? কারণ হিসেবে জাতপাতের মানুষেরা শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁদের দাবি-দাওয়া অনেকটাই মেটাতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জাতিভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রশ্ন অনেকটাই লঘু হয়। কিন্তু দেখা যায় যে অল্প কয়েকটি জাতপাতের গোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য জাতপাতের গোষ্ঠীর বিশেষ কোনো আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়নি। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে বামফ্রন্টের আমলে শ্রেণী কেন্দ্রিক রাজনীতির দরুন এ রাজ্যের দলিত আর আদিবাসীদের কোন বাড়তি সুবিধা পায়নি বরং বহু ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের আদিবাসীদের তুলনায় বঞ্চিত হয়েছে।[6]

তাহলে প্রশ্ন হলো পশ্চিমবঙ্গে কেন জাতপাত ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি? এক্ষেত্রে বাম সংস্কৃতি ও বাম শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনকেই দায়ী করা হয়। এছাড়া বাম শাসনকালে বাম নেতাগণ বিভিন্ন জাতের নেতাঁদের সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এই জাতপাতের নেতাগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'দলদাস' হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি তপশিলি জাতি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল সেভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি গুরুত্ব পাননি। এর পিছনে একটি সুপ্ত রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজনীতিতে রাজবংশীরা প্রধান ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলাগুলোতে এঁদের জনঘনত্ব বেশি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজবংশীদের যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হতো অন্যান্য তপশিলি গোষ্ঠীদের সেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হতো না।

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিদের জনবিন্যাস সর্বত্র সমান নয়। কিছু কিছু জেলায় তপশিলিদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। আবার প্রত্যেকটি জেলায় তপশিলিদের সমানভাবে ঘনত্ব নয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজবংশীদের প্রাধান্য বেশি। রাঢ় বঙ্গে বাগদি ও বাউরি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

[5] চট্টোপাধ্যায়,পার্থ *জন প্রতিনিধি প্রবন্ধ সংকলন* , অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০২।

[6] চট্টোপাধ্যায়,পার্থ *জন প্রতিনিধি প্রবন্ধ সংকলন* , অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০৩।

বেশি। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, উত্তর ২৪ পপগণাতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বেশি। দক্ষিণ ২৪ পপগণাতে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ঘনত্ব অনেক বেশি। ভৌগোলিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতিগুলির সংখ্যাগত অবস্থান ও জাতিগত বিভাজন এঁদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[7] ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট জাতি গুলি হল-

পশ্চিমবঙ্গের মোট দলিত জনসংখ্যার ৫ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	দলিত জনসংখ্যার শতাংশ
রাজবংশী	৩৩,৮৬,৬১৭	১৮.৪ শতাংশ
নমঃশূদ্র	৩২,১২,৩৯৩	১৭.৪ শতাংশ
বাগদি	২৭,৪০,৩৮৫	১৪.৯শতাংশ
পৌণ্ড্র	২২,১৬,৫১৩	১২.০ শতাংশ
বাউরি	১০,৯১,০২২	৫.৯ শতাংশ
চামার	৯,৯৫,৭৫৬	৫.৪ শতাংশ

সূত্র: সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, কম্প্যাক্ট ডিক্স, এস সি এসটি ইন্ডিভিজুয়াল, ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতিগুলির জনবিন্যাস যেমন কয়েকটি জাতির প্রাধান্য বেশি তেমনি ভৌগোলিক ক্ষেত্র কয়েকটি অঞ্চলে তপশিলিভুক্ত মানুষের ঘন বসবাস। রাজ্যের তপশিলি জাতির দুই-তৃতীয়াংশ বসবাস করেন আটটি জেলায়। এগুলি হল দক্ষিণ ২৪ পপগণা (১২.২ শতাংশ), বর্ধমান (১০.৮ শতাংশ), উত্তর ২৪ পপগণা (৯.৯৭ শতাংশ), মেদিনীপুর (৮.৫৪ শতাংশ), নদীয়া (৭.৪ শতাংশ), জলপাইগুড়ি (৬.৭৭ শতাংশ), কোচবিহার (৬.৭৩

[7] রানা, সন্তোষ, রানা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত আদিবাসী,* ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১২১।

শতাংশ) হুগলি (৬.৪৪ শতাংশ)।[8] ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীদের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬১৭ জন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। রাজবংশীদের ৮০ শতাংশ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বসবাস করে এবং ২০ শতাংশ বাস দক্ষিণের জেলাগুলোতে। ২০০১ এর জনগণনা অনুসারে এঁদের সাক্ষরতার হার ৬০.১ শতাংশ। মুখ্য কর্মীদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ কৃষকও ২৯ শতাংশ ক্ষেতমজুর।[9] রাজবংশী গোষ্ঠীর ৯২.৩৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। নিচে জেলা অনুযায়ী জনসংখ্যার বিবরণ দেওয়া হলো-
তিন শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলাগুলোর উল্লেখ করা হলো-

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
দার্জিলিং	১২৯৯০৪	৩.৮৪ শতাংশ
জলপাইগুড়ি	৮১১৫৬৭	২৩.৯৬ শতাংশ
কোচবিহার	৯৭২৮০৩	২৮.৭২ শতাংশ
উত্তর দিনাজপুর	৪০৫১৪০	১১.৯৬ শতাংশ
দক্ষিণ দিনাজপুর	২২৪০৮৮	৬.৬৪ শতাংশ
মালদহ	১৪৪১৫৮	৪.২৬ শতাংশ
উত্তর ২৪ পপগণা	১০৬৩৩৮	৩.১৪ শতাংশ
মেদিনীপুর	১৩২৫১১	৩.৯১ শতাংশ
দক্ষিণ ২৪ পপগণা	১৪০৭৭৫	৪.১৬ শতাংশ

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হলো নমঃশূদ্র। এঁরা সাধারণত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে সংখ্যাধিক্য ছিল। দেশভাগের পর নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর একাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে

[8] ২০০১ সালে মেদিনীপুর জেলা পূর্ব পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে । জনগণনার কাজ তার আগেই শেষ হয়েছিল। এখানে অবিভক্ত জেলার কথাই বলা হয়েছে।

[9] ২০০১ এর জনগণনা।

পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ২০০১ সালে জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা ৩২ লক্ষ ১২ হাজার ৩৯৩। পশ্চিমবঙ্গে মোট তপশিলি জাতির জনসংখ্যার ১৭.৪ শতাংশ। নদীয়া জেলায় ২৫ শতাংশ, উত্তর ২৪ পপগণা জেলায় ২৪.৯ শতাংশ, জলপাইগুড়ি জেলায় ৮.৯ শতাংশ, বর্ধমান জেলায় ৭ শতাংশ, কোচবিহার জেলায় ৫.৪ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পপগণায় ৪.৬ শতাংশ, মেদিনীপুর জেলায় ৪.৮ শতাংশ বসবাস করে। নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর ৭৫.৫ শতাংশ গ্রামে এবং ২৪.৬ শতাংশ শহরে বসবাস করে। জীবিকার ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে ২১.৪ শতাংশ কৃষক এবং ১৬.৯ ক্ষেতমজুর। ৬১.৭ শতাংশ অন্য পেশায় নিযুক্ত। পেশার মধ্যে সরকারি বেসরকারি চাকরিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংক-বীমা কর্মী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট ব্যবসায়ী, ছুতোর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, হকার। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এঁদের সাক্ষরতার হার ৭১.৯৩ শতাংশ।

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
জলপাইগুড়ি	২৮৬৭০৭	৮.৯৩
কোচবিহার	১৫৫৫১৪	৫.১৫
উত্তর দিনাজপুর	৯৯২৩৭	৩ .০৯
মালদহ	১০১৪৪৪	৩.১৬
বর্ধমান	২২৪৬৩৩	৬.৯৯
নদীয়া	৮১০৬১২	২৫.২৩
উত্তর ২৪ পপগণা	৭৯৮৭০৪	২৪.৮৬
হুগলি	১১১৭৩১	৩.৪৮
মেদিনীপুর	১৫৩১১১৩	৪.৭৭
দক্ষিণ ২৪ পপগণা	১৪৭৪৯০	৪.৫

১৯৬১ সালের জনগণনায় বাগদি সম্প্রদায় ১৯.৯ শতাংশ। কৃষক ৬১.১ শতাংশ ক্ষেতমজুর নিযুক্ত ১৬ শতাংশ। ২০০১সালের জনগণনা এঁদের সংখ্যা ১৯.৯ শতাংশ ক্ষেতমজুর ৬৪.১ শতাংশ। কৃষি পেশায় নিযুক্ত ৩১ শতাংশ। এই অকৃষি পেশাগুলি মূলত রাজমিস্ত্রির কাজ, সবজি বিক্রির কাজ, পরিবহন ক্ষেত্রে ড্রাইভার, খালাসী ও অটোচালক প্রভৃতির সাথে যুক্ত। ১৯৯১ সালের জনগণনায় বাগদি স্ত্রী কর্মীদের মধ্যে ৭৪.৫ শতাংশ ছিল ক্ষেতমজুর। ২০০১ এর জনগণনা অনুসারে এই সংখ্যা ৫০.৯ শতাংশ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার, এদের মধ্যে বর্ধমান জেলায় ২০.৭ শতাংশ, হুগলি জেলায় ২০.৪ শতাংশ, মেদিনীপুর জেলায় ১৩.৫ শতাংশ, বীরভূম জেলায় ৮.৮ শতাংশ, হাওড়া জেলার ৬ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পপগণার ৬.৩ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪.১ শতাংশ, নদীয়া জেলায় ৩.৪ শতাংশ বসবাস করে।

৩ শতাংশের বেশি বাগদি সম্প্রদায় জেলাগুলোর উল্লেখ করা হলো-

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
মুর্শিদাবাদ	১১২৯৪৭	৪.১২
বীরভূম	২৪০৬৪১	৮.৭৮
বর্ধমান	৫৬৮০০২	২০.৭৩
নদীয়া	১০৫২০৬	৩.৮৪
উত্তর ২৪ পপগণা	৯৩৮৫৮	৩.৪২
হুগলি	৫৭০৫১৮	২০. ৮২
বাঁকুড়া	২৩৯২৩৭	৮.৭৩
মেদিনীপুর	৩৬৯৮৮২	১৩.৫০
হাওড়া	২৩৫৪৪৮	৮.৫৯
দঃ ২৪ পপগণা	১৭৪১০৪	৬.৩৫

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্র জাতির জনসংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৫৩।[10] এরা প্রথমত দক্ষিণ ২৪ পপগণা (৬৩ শতাংশ), উত্তর ২৪ পপগণা (১৯.৬ শতাংশ, মেদিনীপুর (৫.৯ শতাংশ, হাওড়া (৩.৮ শতাংশ) জেলায় বসবাস করে। কিছু সংখ্যক মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বসবাস করেন। ১৯৯১ জনগণনা অনুসারে পৌণ্ড্রদের মুখ্য কর্মীদের মধ্যে ৩৭.৫ % কৃষক এবং ৩২ শতাংশ ক্ষেতমজুর ছিল। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এঁদের মুখ্য কর্মীদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ২৩.৯ এবং ক্ষেতমজুর সংখ্যা ১১.৪ শতাংশ । এঁদের সাক্ষরতার হার ৭২.১ শতাংশ

তিন শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌণ্ড্র তপশিলি জাতির সংখ্যা-

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
উত্তর ২৪ পপগণা	৪৩৫২০৬	১৯.৬৩ শতাংশ
মেদিনীপুর	১৩১৫১৭	৫.৯৩ শতাংশ
হাওড়া	৮৪৩২৩	৩.৮০ শতাংশ
দক্ষিণ ২৪ পপগণা	১৩৯৬৩৫৩	৬৩.০০ শতাংশ

২০১১সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বাউরি জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯১ হাজার।[11] এরমধ্যে বর্ধমান জেলায় ২৯.৬ শতাংশ, বাঁকুড়া জেলায় ২৭.৮ শতাংশ, পুরুলিয়া জেলায় ১৯.২ শতাংশ, বীরভূম জেলায় ৮.৪ শতাংশ, হুগলি জেলায় ১০.৪ শতাংশ বসবাস করেন। ১৯৯১ সালের বাউরিদের মুখ্য কর্মীদের মধ্যে ১৪ শতাংশ কৃষক ও ৬৮.৪ শতাংশ খেতমজুর ছিল। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ৯.৬ শতাংশ কৃষক ও ৫৫..৫ শতাংশ খেতমজুর। সম্প্রদায়ের শিক্ষক সাক্ষরতার ৩৭.৫।[12]

শতাংশের বেশি বাউরি সম্প্রদায়ের জেলাওয়ারী বন্টন-

---

10 ২০১১ সালের জনগণনা।

11 ২০১১ সালের জনগণনা।

12 ২০০১ সালের জনগণনা।

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
বীরভূম	৮১১৭৯	৭.৪৪
বর্ধমান	৪২৩০৪৮	২৯.৬১
হুগলি	১১৩৭৩১	১০.৪২
বাঁকুড়া	৩০৩৩১৬	২৭.৮০
পুরুলিয়া	২০৯০৮০	১৯.১৬
মেদিনীপুর	৪১৯১৬	৩.৮৪

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে সারা ভারতে চামার সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ৪ কোটি ২১ লাখ ২২ হাজার ৮৯৬।[13] এঁদের প্রায় অর্ধেক উত্তরপ্রদেশে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৫৬। চামার জনগোষ্ঠীর ৭৭.৩ শতাংশ গ্রামে এবং ২২.৭৪ শতাংশ শহরে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে এঁরা বর্ধমান জেলায় ২৪ শতাংশ, বীরভূম জেলায় ১৪.৫ শতাংশ, উত্তর ২৪ পপগণায় ১৪.৪ শতাংশ, নদীয়া জেলায় ৯৫ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮.৩ শতাংশ বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের চামার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৯.৪ শতাংশ কৃষক, ৩৬.৪ শতাংশ ক্ষেতমজুর ও অবশিষ্ট অংশ কলকারখানায় নিযুক্ত। এঁদের সাক্ষরতার হার ৪৮ শতাংশ।

তিন শতাংশের বেশি চামার সম্প্রদায়ের জীবন জেলাওয়ারী বন্টন, ২০১১-

জেলা	জনসংখ্যা	জেলাওয়ারী বন্টন
মুর্শিদাবাদ	৮৩০১০	৮.৩৪
বীরভূম	১৪৩৮৫৫	১৪.৪৫
বর্ধমান	২৩৯২৩০	২৪.০২

[13] ২০০১ সালের জনগণনা।

নদীয়া	৯৪৫৮০	৯.৫০
উত্তর ২৪ পপগণা	১৪৩০৭৫	১৪.৩৭
হুগলি	৫৯০৫৯	৫.৯৩
বাঁকুড়া	৩৩৩৪৯	৩.৩৫
মেদিনীপুর	৩৪০৩৩	৩.৪২
কলকাতা	৩৭১৫৭	৩.৭৩

স্বাধীনতার পূর্বে ‘ডিপ্রেসড ক্লাসেস’ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলায় জাতি রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেই আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাহলে কি দেশভাগ দলিত আন্দোলনকে দুর্বল করেছে? কিংবা বামপন্থী রাজনীতির শ্রেণীচেতনা বাংলার দলিত আন্দোলনকে শক্তিহীন করেছে? উচ্চবর্ণের সংহতি কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সংহত করে চলার মাধ্যমে দলিত মুক্তির সম্ভাবনা বিনাশ ঘটেছিল কি? পশ্চিমবঙ্গের দলিত জাতিগুলির বিচিত্র গঠন-প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত জাগরণের সম্ভাবনাকে বাধা দিয়েছে?

দেশভাগ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। দেশভাগের পরে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখন্ড, ছত্রিশগড়, বিহার, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাস শুরু করে। ছত্রিশগড়ের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এছাড়াও নৈনিতাল ও আন্দামানে প্রচুর তপশিলি পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ফলে নমঃশূদ্ররা ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাঁদের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তবে পরবর্তী সময়ে মরিচঝাঁপিকে কেন্দ্র করে তপশিলিরা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[14] এই আন্দোলনে বাম সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্য দিয়ে বাম সরকার এই আন্দোলনকে প্রতিহত করে। এছাড়াও দেশভাগের পর নমঃশূদ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সংহতি তাঁদেরকে আশঙ্কিত করেছিল।[15] তবে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ও কৃষি

---

[14] মন্ডল, জগদীশ মরিচ ঝাঁপিঃ নৈশব্দের অন্তরালে, সুজন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. পৃ. ২২-২৭।

[15] রানা, সন্তোষ ও রানা কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত আদিবাসী,* ক্যাম্প, ২০১৩, পৃ. ১২২।

জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুনরায় তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং বাম বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

বিভিন্ন জেলায় তপশিলি সম্প্রদায় বসবাস করার কারণে পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জাতি রাজনীতি গড়ে উঠতে পারেনি। ভৌগলিক অবস্থান এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া তপশিলিদের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি। যিনি জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক দল তৈরি করে তাঁদের নিজেদের দাবি-দাওয়া পূরণ করবেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল একজন দক্ষ নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি পূর্ব বাংলায় থেকে যান। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে আসলে তেমন কোনো জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করতে পারেননি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় অনেক সমস্যা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করলেও রাজনৈতিক বিষয় তাঁরা রাজপরিবারের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন।[16] রাজবংশী সম্প্রদায় ১৯৩২ সালে 'ডিপ্রেসড ক্লাসে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সম্প্রদায় তপশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ ২৪ পপগণা জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আন্দোলন দানা বাঁধলেও তা মূলত ছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও জাতির উত্তরণের আন্দোলন। পৌণ্ড্রসম্প্রদায় সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক উত্তরণ রাজনৈতিক দলের কথা কখনোই ভাবেনি। পশ্চিমবঙ্গে সকল তপশিলিরা বাম শাসনের সময় বাম রাজনৈতিক দলের হয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

তবে ২০০১ সালের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘতম শাসনের বিরুদ্ধে তপশিলিদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে তপশিলিদের অতি-বামপন্থীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের পরবর্তী সময়ে যে জমি আন্দোলন সংগঠিত হয় তার মূলে ছিলেন এই তপশিলি সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যাবে শহরে বুদ্ধিজীবীগণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শহরের বুদ্ধিজীবীগণ মূল পরামর্শদাতা হিসেবে এবং আন্দোলন সংগঠিত করার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য যে জনবল ও পেশি শক্তি প্রয়োজন তা ছিল তপশিলি সম্প্রদায়ের।

---

[16] Basu, Swaraj, *Dynamics of a Caste Movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*, Monohar, New Delhi, 2002, পৃ.৩৬।

জাতপাত শ্রেণী, জাতি বঞ্চনা ও জাতি হিংসা

জাতপাত ভিত্তিক হিংসা ও বঞ্চনা ভারতের চিরাচরিত ব্যবস্থায় সর্বদাই ছিল। উচ্চবর্ণীয় সম্প্রদায় জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক বঞ্চনা অনুগ্রহ করতো। অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন তপশিলি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। এই বিষয়ে তপশিলি সম্প্রদায় সামাজিক সংস্কারের দিকটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। অবিভক্ত বাংলায় নমঃশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৬ সালে নমঃশূদ্র লেখক মহানন্দ হালদার রচিত 'গুরুচাঁদ চরিত'- এ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্র সমাজের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয়, সমাজ সংস্কার ও সম্প্রদায়গত দিকটি তুলে ধরেছেন। [17] মতুয়ারা আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তিতে নমঃশূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মপ্রচেষ্টায় জমিদার, জোতদার ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের শোষণ থেকে মুক্তির প্রেরণা যুগিয়েছিল। উত্তর ২৪ পপগণার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ও তাঁদের আত্মচেতনায় জাগ্রত হয়েছিলেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তাঁদের আত্মচেতনা ও বঞ্চনার দিকটি তুলে ধরেন। পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারক রাইচরণ সরদার 'দীনের আত্মকাহিনী'তে তাঁর ছোটবেলায় মাদুরে বসার জন্য উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের ধারা কিভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। কলেজ জীবনে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ উচ্চবর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে জল পান করার সুযোগ তিনি পেতেন না।।[18]

রাজবংশী লেখক উপেন্দ্রনাথ বর্মণ 'উত্তরবঙ্গের সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি'তে লেখেন কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে জাতিবর্ণভেদ অনুসারে ব্রাহ্মণ ছাত্র এবং নিম্নবর্ণের ছাত্রদের আলাদা আলাদা খাবার ঘর ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো জাতিভেদ বঞ্চনা বিশেষ করে উদ্বাস্তু তপশিলিদের উপর বিভিন্ন রকমের সামাজিক সামাজিক বঞ্চনার কথা উঠে আসে। ২০১০ সালে যতীন বালা 'শেখর ছেঁড়া জীবনে' উদ্বাস্তু ক্যাম্পে তপশিলি মহিলাদের উপর সামাজিক অত্যাচারের চিত্র উঠে আসে।[19] মনোহর মৌলি বিশ্বাস 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে আছি' তে নিজের অভিজ্ঞতা তপশিলি মানুষের ঘৃণা ও

---

[17] বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌভিক, ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতিবর্ণ সমীকরণ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৮১।

[18] সরদার, রাইচরণ, দিনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা, ডায়মন্ড হারবার ১৯৫৯, পৃ. ২৭।

[19] বালা, যতীন, শেখর ছেঁড়া জীবন, গানগচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৭।

অর্থনৈতিক বঞ্চনার চরম প্রতিবন্ধকতার দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর ধারণা দলিত হিসেবে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা ছাড়া দলিতের বঞ্চনা ও ঘৃণা অপমানের যন্ত্রনা অনুভব করতে পারে না।[20] মনোরঞ্জন ব্যাপারী তার আত্মজীবনী 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবনে'[21] দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বাংলার জাতি বঞ্চনার দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি ছোটবেলায় বাঁকুড়ার শিরোমনি ক্যাম্প থেকে ফুরফুরা শরীফের এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের বাড়িতে গরু চরানোর বা গোপালনের কাজে নিযুক্ত হন। বাড়ির লোকেরা তাঁকে এমন ঘৃণিত জীব বলে মনে করতেন যেন সে কোন ছোঁয়াছে রোগের রোগী। ভাত খাবার সময় ডাক্তারের গিন্নি কারখানায় উঁচু থেকে ভাত তরকারি ছর ছর করে ঢেলে দিতেন। খাবার পর কাঙালের মতো সেটি ধুয়ে আনতেন। গোয়াল ঘরের গাদামারার পাশে তাঁর ঘুমানোর জায়গা ছিল। ঘুমের কারণে ডাক্তারের মার খেতেন।

ভারতের সংবিধান অনুসারে তপশিলিদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সংরক্ষিত আসন ছিল সেখানেও জাতপাতের ছোঁয়া ছিল। উচ্চবর্ণরা জাতপাতের সংরক্ষণের সর্বদায় বিরোধী ছিলেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের দীর্ঘসময়ের মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের আত্মজীবনীতে 'আমার জীবন কিছু কথা' গ্রন্থে সাম্যবাদী শাসকদের সংগঠনে জাতপাতের ভেদাভেদের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন যে উচ্চবর্ণরা পার্টির অভ্যন্তরে নমঃশূদ্র হিসেবে তাকে হেনস্তার করতেন। এমনকি তাঁর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তরের থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।

লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে সুপার ডক্টর উজ্জ্বল বিশ্বাস এর কাছে দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৭ সালে স্মারকলিপি দিতে আসেন ডি.ওয়াই.এফ.আই এর জোনাল সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী। ডক্টর উজ্জ্বল বিশ্বাস চা খেতে অনুরোধ করায় তিনি জানান যে তিনি তপশিলি জাতির ব্যক্তিদের অনুগ্রহের চা খেতে প্রস্তুত নয়। ডক্টর বিশ্বাস এই বিষয়টি পার্টি অভ্যন্তরে জানালেও পার্টি থেকে হুমকি দেওয়া হয় যে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ডক্টর বিশ্বাস থানায় এফ.আই.আর করেন।[22] ২০০৭ সালে হুগলি জেলার বাসিন্দা প্রহ্লাদ রায়

---

[20] বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৩।

[21] ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৭।

[22] টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৯ শে মার্চ, ২০০৭।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে লেকচারার পদে চাকরি পান। নিচু জাত বলে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে দিয়েই গঙ্গাজল আনিয়ে তাঁকে স্নান করান শুদ্ধিকরণের জন্য। তবুও তাঁকে টিচার্স রুমের চেয়ারে বসতে না দেওয়ায় তিনি গ্রন্থাগারে সময় কাটান।[23] এই বিষয়টি পার্টি নজরে আনলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান জানান যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো কোনভাবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রভাব নজর কাড়ার মতো। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ২১৭। তারমধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৩৩৩৭। যা মোট শতাংশের বিচারে ৬.১৬ এবং তপশিলি উপজাতিদের সংখ্যা ৪৫১ এবং শতাংশের বিচারে ০.৯১ শতাংশ।[24]

সুশীল বা নাগরিক সমাজ, জাতপাত ও বাম রাজনীতি

দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এক বামসংস্কৃতি তৈরি হয়। এই বাম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এছাড়াও বাম সংস্কৃতিতে যাঁরা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিল তাঁরা অনেকেই ছিল উচ্চবর্ণের। যাঁরা বাঙালি সমাজের নিকট ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বিশেষ করে বাম রাজনীতি ভদ্রলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। ভদ্রলোকের এই রাজনীতিতে ধর্ম, জাতপাত কিংবা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য নেই। ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীরাই এই রাজনীতির ধারক ও বাহক। দীর্ঘ বাম শাসনে এই ভদ্রলোক শ্রেণীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত ছিল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সুশীল সমাজ ও নাগরিক সমাজ সবসময়ই বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ সহায়তা করতেন। ২০০৬ সালের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতিতে এক অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়। বাম রাজনীতিতে এক ধরনের দুর্বৃত্তায়নের উদ্ভব হয়। যারা গ্রামীণ কৃষি সমাজে নীতি নির্ধারণে নির্ণয় ভূমিকা পালন করতেন। গ্রামীণ তপশিলি কৃষক সম্প্রদায়ের সকল ব্যাপারে পার্টি নির্দেশিত নির্দেশ মেনে চলতে হতো। পার্টির নির্দেশ মেনে না চললে পার্টির নির্ধারিত শাস্তি গ্রহণ করতে হতো।

---

[23] আজকাল দৈনিক পত্রিকা, ২৪ এ এপ্রিল, ২০০৭।

[24] দ্য টেলিগ্রাফ, ১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। বাম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ বামেদের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। যার প্রথম কার্যকরী ভূমিকা সিঙ্গুর আন্দোলনে দেখতে পাওয়া যায়। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি যেমন মহাশ্বেতা দেবী, বিভাস চক্রবর্তী, সুমিত সরকার, কবীর সুমন, দোলা সেন, দয়াবতী রায় বামফ্রন্টের সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ২০০৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষি জমি রক্ষা কমিটি নামক অরাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কবীর সুমন, উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান ছিলেন সুনন্দ সান্যাল, কো-অর্ডিনেটর ছিলেন দোলা সেন, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন পূর্ণেন্দু বসু। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।[25] শহরের এই বুদ্ধিজীবীদের সিঙ্গুর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সিঙ্গুর আন্দোলনে পরামর্শদাতা হিসেব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থাকলেও মূল আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে কৃষক সম্প্রদায় ছিল তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন তপশিলি।

২০০৬ সালের ২৭শে অক্টোবর বি.ডি.আর এর উদ্যোগে মহাশ্বেতা দেবী, মেধা পাটেকর, দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তর নেতৃত্বে এক গণশুনানির আয়োজন করা হয় যেখানে কৃষিজীবীরা তাঁদের জমি নির্ভর নির্ভরতার কথা জানান ও জমি দিতে অস্বীকার করেন। পরে এই শুনানির রেকর্ড পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।[26] ২০০৭ সালের নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। ১৪ই মার্চের গুলিচালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার নাগরিক সমাজ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সুমিত সরকার ও তনিকা সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার ফিরিয়ে দেয় ও পুরস্কারের অর্থ সাহায্য নন্দীগ্রামের বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে দেন। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য বঙ্কিম পুরস্কার ফিরিয়ে দেয়।[27]

১৪ই মার্চ এর প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। একদিকে শাসক-বিরোধী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অন্যদিকে মিছিল হয়েছিল শান্তির পক্ষে

[25] সেন , দোলা সম্পাদিত, কানোরিয়ার পর্শি মুর একটি সংকলন, কলকাতা, কানোরিয়া জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন, ২০০৭, পৃ. পৃ. ১১৫-১৭।

[26] চট্টোপাধ্যায়, সুকদেব সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: কাশিপুর বরানগর থেকে লালগড় ভাইয়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, উবুদস, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১৬।

[27] আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ই মার্চ, ২০০৭।

নন্দীগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৪ই নভেম্বর মিছিলে বামপন্থী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানায় যে তিনি কৃষকদের মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখিত। কিন্তু তিনি বামপন্থী তাই জমি রক্ষা কমিটির সভায় দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।[28] অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, পল্লব কীর্তনীয়া, শাঁওলি মিত্র, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখ মিলে 'স্বজন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন রাষ্ট্রীয় হিংসায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কবীর সুমন বলেছেন এই 'স্বজন' নামক নাগরিক গোষ্ঠীটি বাম সরকারের সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনে থাকলেও তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোট থেকে দূরত্ব বজায় রাখছেন। লালগড় আন্দোলনের ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলনকারীদের পাশে ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর বুদ্ধিজীবীগণ লালগড়ে গিয়ে ছত্রধর মাহাতো সহ জনগণের কমিটির নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন। ঐ দিনই পশ্চিমবঙ্গ কৃষি জমি, জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি লালগড়ে যান সেখানকার মানুষদের সাথে সংহতি জানাতে।[29] সিঙ্গুরের কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় সেই আন্দোলনে তপশিলি জাতির মেয়ে তাপসী মালিককে নির্ভীক ভাবে হত্যা করা হয় । এছাড়াও গ্রামের যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁদের পুলিশি অত্যাচার করা হয়। কবি জয় গোস্বামী এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ও জমি কেড়ে নেওয়ার শিল্পকলার বিরোধিতায় লেখেন-

জমি কেড়ে নেওয়াটাই কাজ।
ঘরছাড়া করাটাই কাজ। আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে
তাঁরাও, তারপর তৈরি করো
আমাদের এই বুকের উপর
উঁচু শিল্প অদ্ভুত সমাজ। [30]

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের অধিকাংশই চাষী ছিল তপশিলি জাতির। তাঁরা বাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্থানীয় স্তরে চাষীদের সংগঠিত করে সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তাঁরা শহুরে বুদ্ধিজীবীদের

---

[28] আজকাল, ৬ ই এপ্রিল, ২০০৭।

[29] Times of India, 26 November, 2008।

[30] গোস্বামী, জয়, শাসকের প্রতি তুমি আর তোমার ক্যাডার, রায় , গৌতম সম্পাদিত, সিঙ্গুর উচ্ছেদ প্রতিরোধ কলকাতা, ২০০৭, পৃ.পৃ. ১১-১৩।

পরামর্শ ও তাঁদের সহযোগিতা পেয়েছেন। শহরের বুদ্ধিজীবীরাও পরামর্শ দিলেও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলার ও জনমত গড়ে তোলার প্রধান ভূমিকায় ছিল তপশিলি সম্প্রদায়। একদিকে যেমন সব দলের ক্যাডারদের সঙ্গে লড়ছেন অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার পুলিশের সঙ্গে লড়েছেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন গড়ে তোলায় বাংলার তপশিলি, বাগদি সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কবীর সুমন তার নন্দীগ্রাম অ্যালবামে অজয় বাগদি নামক এক যুবকের থানায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদে গান বাঁধেন:

অজয় বাগদি ঝুলছে দেখো মরুদ্যানের কয়েদখানায়
দড়ি জোগায় পার্টি পুলিশ তাঁরাই গণতন্ত্র বানায়। [31]

অন্যদিকে ২০১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হাজার হাজার মতুয়া ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সংঘাধিপতি বড়মা বীণাপাণি দেবী কলকাতাতে ধর্ণাতে বসেন। কলকাতার পীঠস্থান ও কেন্দ্রবিন্দু এসপ্লানেডে এই ধর্ণার মূল দাবি ছিল ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন এবং নমঃশূদ্র উদ্বাস্তদের নাগরিকত্ব প্রদান।[32] সমস্ত পার্টির রাজনৈতিক নেতাগণ এই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তপশিলি মতুয়াদের সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মতুয়া আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। [33] দেশভাগের পরে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় উত্তর ২৪ পপগণার ঠাকুরনগরে তাঁদের আধ্যাত্মিক বলয় গড়ে তোলেন। তৈরি হয় সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ। ভারত মতুয়া মহাসংঘ তপশিলিদের আত্মপরিচিতি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা তপশিলি বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন উদ্বাস্তু ও গ্রামের কৃষক। সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্বাস্তু হিসেবে নাগরিকত্বের দাবি দীর্ঘদিনের ছিল। কোন রাজনৈতিক দলের নেতাগণ তাঁদের নাগরিকত্বের দাবির সমর্থন জানালেও তেমন কোনো সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ২০১১ সালের নির্বাচনের পূর্বে তপশিলিদের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে এবং তাঁরা মতুয়া মহাসংঘের বড়মা বীণাপাণি দেবীকে সামনে রেখে তাঁদের নাগরিক আন্দোলন শুরু করেন। এক্ষেত্রে বাম রাজনৈতিক

[31] সুমন, কবীর, নন্দীগ্রাম প্রতিরোধ, কলকাতা কসমিক হারমনি ২০০৭।

[32] The Telegraph, 29 December, 2010.

[33] মতুয়া হলো বৈষ্ণব ধারার আধ্যাত্মিক গ্রুপ, যারা সকল রকম উচ্চবর্ণীয় আচার-আচরণকে পরিত্যাগ করেন এবং হরিনামে মাতোয়ারা থাকেন । এদের মূল লক্ষ্য হলো হাতের কাজ ও মুখে নাম।

দলগুলোর উপর অনেকটাই চাপ সৃষ্টি হয়। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অধিকাংশ তপশিলি অঞ্চলে জয় লাভ করেন এবং বাম প্রার্থীরা পরাজিত হন।

বাম রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে তপশিলিদের সমর্থন কমতে থাকে। উত্তর ২৪ পপগণার নমঃশূদ্র মতুয়াদের এবং দক্ষিণ ২৪ পপগণার পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের সমর্থন আলগা হতে থাকে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা যায় যে উত্তর ২৪ পরগণা দক্ষিণ ২৪ পরগণা মেদিনীপুরে তপশিলি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বাম দলগুলোর ব্যাপক বিপর্যয় হয়। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তপশিলি জাতি বিশেষ করে নমঃশুদ্র, পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের পুরোপুরি সমর্থন লাভ করে। পৌণ্ড্র অধ্যুষিত দক্ষিণ ২৪ পপগণার পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বাধীনতার পর থেকে প্রথমবারের জন্য দলিত সম্প্রদায়ের একাংশের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা দেখা গেছে।[34] এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতি উত্তরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাতপাতের বিভিন্ন নেতাগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাঁরা বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণা নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পপগণায় তৎকালীন শাসক দল ও বামফ্রন্টের বৃদ্ধি জোরালো নির্বাচনী প্রচার চালায় এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী ফলাফলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। জাতপাতের নেতাদের এই জোরালো প্রচার ও শাসকের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া প্রথমবার সংঘটিত হয়। বাম রাজনীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এটা চ্যালেঞ্জ নয়। এই চ্যালেঞ্জ কেবলমাত্র কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। চ্যালেঞ্জটা উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।[35] তপশিলি জাতিদের আর্থ-সামাজিক বিপন্নতার জন্য সর্বদা শাসকের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করতে হতো। এই প্রথমবার জাতপাতের মানুষের আধিপত্য বজায় রেখে শাসকের কাছে আনুগত্য বন্ধক রাখার পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এছাড়াও তৎকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে বাগদি ও বাউরি সম্প্রদায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের যে কৃষি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল বাগদি ও বাউরি সম্প্রদায়। এই কৃষক সম্প্রদায় প্রথম রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিবর্তে শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে বাম দলগুলোকে

---

[34] রানা, সন্তোষ রানা কুমার, *পশ্চিম বঙ্গের দলিত আদিবাসী*, ক্যাম্প, কলকাতা ২০১৩, পৃ. ১৩৩।

[35] রানা, সন্তোষ রানা কুমার, *পশ্চিম বঙ্গের দলিত আদিবাসী*, ক্যাম্প, কলকাতা ২০১৩, পৃ. ১৩৩।

শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ঘটনা দলিত সমাজের বিভিন্ন অংশে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল।

১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন বিন্যাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে তপশিলিদের তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। তপশিলিরা রাজনীতির ক্ষেত্রে অবহেলিত থেকে গেছে। শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনেই তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ভারতের অন্য রাজ্যের মত সাধারণ আসনে তপশিলিদের তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়নি। ১৯৭৭ সালে সাধারণের জন্য ২১৮টি আসন, তপশিলি জাতিদের জন্য ৫৮টি আসন, তপশিলি উপজাতির জন্য ১৭টি আসন এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত হয়। বেশিরভাগ সংরক্ষিত আসনেই ১৯৭৭ থেকে বামপন্থী তপশিলি প্রার্থীরা জয় লাভ করে। এক্ষেত্রে সি.পি.আই.(এম.) সবথেকে বেশি তপশিলি প্রার্থী জয় লাভ করে। ২০১১ নির্বাচনে বিধানসভার আসন সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এই নির্বাচনে সাধারণ আসন সংখ্যা কমে হয় ২১০। তপশিলি জাতিদের জন্য আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৮ এবং তপশিলি উপজাতিদের আসন সংখ্যা কমে হয় ১৬ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য হয় ১টি আসন। বিধানসভার বিধানসভার ক্রমানুযায়ী আলোচনা করলে দেখা যাবে ২০১১ সালে তপশিলি জাতির আসনসংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায় এবং সাধারণের আসন সংখ্যা কমতে থাকে। ২০১১ নির্বাচনে তপশিলিদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, রাঢ়বঙ্গে বাগদি, বাউরি ও দক্ষিণবঙ্গে পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ও তাঁদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে।

২০07 সাল থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এইসময় কেন্দ্রীয় শাসক দল কংগ্রেসের সঙ্গে বাম দলগুলোর জোট ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়। বাম দলগুলো ও কংগ্রেসকে নিয়ে কেন্দ্রে ইউ.পি.এ. সরকার গঠন করা হয়। পারমাণবিক চুক্তিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ও বাম দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধের কারণে বাম দলগুলো ইউ.পি.এ. সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে নেয়। এই সমর্থন তুলে নেওয়া সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। এর মধ্যেই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি শিল্প উন্নয়নের প্রতি জোর দেয়। আধুনিক শিল্পায়নের স্বার্থে কৃষি

স্বার্থকে ক্ষুন্ন করতে তৎপর হন তাঁরা। কাজেই কৃষি আমাদের ভিত্তি আর শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ এর মত স্লোগান বামফ্রন্টের কাছে স্ববিরোধী ছিল।[36]

শিল্পায়নের স্বার্থে নন্দীগ্রামে বামপন্থী জমি রক্ষা আন্দোলন বিরোধী দলগুলোর কাছে রাজনৈতিক অস্ত্র পরিণত হয়। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ কৃষক ছিল তপশিলি। গ্রামের তপশিলি কৃষকরা বাম বিরোধী জোটের দিকে সমর্থন জানায়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বাম পরবর্তী সংরক্ষিত তপশিলি জাতিগুলির ফলাফল।

দল	২০১১	২০১৬	জাতির আসন ২০১১	জাতির আসন ২০১৬
সি. পি. আই.	২	১	১	০
সি.পি.আই.এম.	৪০	৬	১২	৮
এ.আই. এফ.বি.	১১	২	৫	১
আর.এস.পি.	১	০	০	০
এস.পি	১	০	০	০
ডি.এস.পি.	১	০	০	০
বি.জে.পি.	০	৩	০	০
এস. ইউ. সি.	১	০	০	০
আই.এন.সি.	৪২	৪৪	১০	৪

[36] বর্মণ, রুপ কুমার, জাতি রাজনীতি জাতপাত ও দলিত তর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, আলফাবেট বুকস, কলকাতা ২০১৯, পৃ. ৯৫।

টি.এম.সি.	১৮৪	২১১	৩৭	৪৯
ডি.জে. এম.	৩	৩	০	০
আই.এম.ডি.	২	১	০	০

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এরকম একটি পরিস্থিতিতে এখানকার তপশিলি জাতির পক্ষে আলাদা কোনো রাজনৈতিক ধারা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিধানসভার তপশিলি আসনসংখ্যা দেখে বলা যায় ২০১১ সালের ৬৮টি আসন আসনের মধ্যে বামফ্রন্টের সফলতায় আসনগুলো গিয়ে দাঁড়ায় ২০তে। তবে ২০০৬ সালের নির্বাচনে ৫৪ টি তপশিলি জাতির আসনে জয় লাভ করে বামফ্রন্ট স্বমহিমায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু ২০১১ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৭টি তপশিলি জাতির আসন আর কংগ্রেস ১০টি আসন পায়। ২০১১ আসন ভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বামফ্রন্টের যে যে তপশিলি জাতিগুলোর মধ্যে সমর্থন ছিল তা অনেকটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উত্তরবঙ্গের তপশিলি আসনগুলোতে বামফ্রন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ১৭টি আসন তার মধ্যে থেকে মাত্র ৫টি আসনে তাঁরা জয়লাভ করেন। দক্ষিণবঙ্গের ২৪টি তপশিলি জাতি আসনের মধ্যে ২০টি আসন বিরোধীরা দখল করে। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের যে ২৭টি আসন ছিল বামফ্রন্ট সেখানে মাত্র ১১টি আসন জয় লাভ করে। এই নির্বাচনের ৮৪ শতাংশ তপশিলি জাতির আসন বিরোধীরা দখল করে। এর ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে বিদায় নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন জাতি রাজনীতির উদ্ভব ঘটে।

জাতপাত রাজনীতির নতুন উত্তরণ

২০১১ সালে পশ্চিমবাংলার ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল ও কংগ্রেস। এসেছিল জোটশক্তি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মমতা ব্যানার্জি। এই শাসনে পশ্চিমবঙ্গে যে ভদ্রলোক সংস্কৃতির ও রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল তার অবসান হয়েছে বলেই মনে করা হয়। বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনে করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাহলে জাতপাত রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা রয়েছে। জাতপাত রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদল গবেষক মনে করেন যে বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ জাতপাতের রাজনীতি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে পৌস্কর্ণ সিনহা[37] New Politics

[37] Sinha, P, New Politics in Bengal, *EPW*, পৃ. ৩৩।

in Bengal প্রবন্ধে দেখান যে পশ্চিমবঙ্গে বাম সময়কালে রাজনীতি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তার কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে জাতপাতের কোন স্থান না থাকায় তা কখনোই রাজনৈতিক রূপ লাভ করতে পারেনি। তিনি দেখান যে মতুয়া মহাসংঘ জাতপাত রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর ২৪ পপগণার নদীয়া জেলার বেশিরভাগ বিধানসভা আসন নমঃশূদ্র অধ্যুষিত। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং মালদহ, হুগলি, বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পপগণার কিছু অংশ নমঃশূদ্র মতুয়া অধ্যুষিত। এই মতুয়ারা প্রায় ৭৬টি আসনে নির্ণয় ভূমিকা পালন করে। বাম শাসনকালে এই আসনগুলোতে বামেরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাম নির্ধারিত পার্টি নীতি ও আদর্শ এখানে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজে তপশিলিদের মধ্যে পার্টির আধিপত্য ছিল। সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়ে পার্টি এদের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করত। এমনকি ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরা মজুরের প্রশ্নতেও পার্টি হস্তক্ষেপ করত। মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা কৃষি ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে পার্টির অবদান থাকতো। পার্টি নির্দেশিত নির্দেশ অমান্য করলে পার্টি এদের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করত।

২০১১ বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরে এই জেলাগুলোতে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি।[38] নমঃশূদ্র মতুয়ারা সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের অনুগত হয়ে পড়ে। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি বড়মা বীণাপাণি দেবীর নির্দেশে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হুগলি, হাওড়া ও বর্ধমান দক্ষিণবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে মতুয়া তথা নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের নির্দেশে প্রচার অভিযান চালায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো মতুয়া মহাসঙ্ঘের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে বড়মা বীণাপাণি দেবীর বড়পুত্র কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অনুগত ছিলেন। এইসময়ে বড়মা বীণাপাণি দেবী বামপন্থী রাজনৈতিক দলের বিপরীতে উদ্বাস্তু নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনে হাজার হাজার মতুয়া সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে বড়মা বীণাপাণি দেবীর ছোট ছেলে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর টি.এম.সি.তে যোগদান করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী হন।

[38] ২০১১ সালের নির্বাচনী তথ্য।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষিত আসনগুলোর মধ্যে এই টি.এম.সি. ৩৯টি আসনে জয়লাভ করেন যা মোট সংরক্ষিত আসনের ৮৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতির উত্তরণের এক সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অন্যদিকে বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ায় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিম্নবর্গের নেতাগণ বিরুদ্ধ আচরণ করতে থাকেন। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা পার্টির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। তিনি বামফ্রন্টের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বলেন যে হেলে ধরতে পারেন না কেউটে ধরতে গেছেন। পার্টির বিরুদ্ধে মুখ খোলায় রেজ্জাক মোল্লাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তী সময়ে রেজ্জাক মোল্লা পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে ‘সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। তিনি জানান যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী শাসনের ফলে এক ধরনের ভদ্রলোক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে। এই ভদ্রলোক শ্রেণী পার্টি তথা সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণী বেশিরভাগ ছিলেন উচ্চবর্ণের। উচ্চবর্ণের শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি, উপজাতি সংখ্যালঘুরা সব সময় বঞ্চিত হয়েছেন। শুধুমাত্র বঞ্চিত নয় আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার দিক থেকে তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন। তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের উন্নতির জন্য তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন। দীর্ঘ বাম সময়ে পর্যন্ত উচ্চবর্ণের শাসনের ফলে তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা দল দাসে পরিণত হয়েছে। তাই এই অবস্থা থেকে তাঁদের উত্তরণ ঘটানো দরকার।

আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা জানান যে তিনি তার সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চের মাধ্যমে এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের লড়াইয়ের সঙ্গী হবেন। দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা থেকে এই নিম্নবর্গীয়দের উত্তরণ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে একজন তপশিলি মুখ্যমন্ত্রী ও সংখ্যালঘু উপমুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান।[39] স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তপশিলি ও সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কোনো রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক উচ্চ আসনে পৌঁছতে পারেনি। কারণ হিসেবে ন্যায়বিচার মঞ্চ দাবি করে যে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবর্ণ শাসনের ফলে এই

[39] সাক্ষাৎকার, রেজ্জাক মোল্লা, ভাঙ্গড়, ২০১৬।

সুযোগ হয়নি। শাসন ব্যবস্থায় সর্বদা সংখ্যালঘু ক্ষমতাশীল জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শাসন করেছে। তাই নিম্নবর্গ মানুষের উত্তরণ ঘটানোর জন্য ও তাঁদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ লড়াই করবে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের জাতপাত রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম শাসন-এর অবসান হলেও জাতপাত রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা নেই। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকে পশ্চিমবঙ্গে এক ধরনের বাম সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এই বাম সংস্কৃতিতে জাতপাত, ধর্ম কোন স্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই সংস্কৃতি আরো মজবুত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এক ধরনের মধ্যবিত্ত তৈরি করেছে। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। দীর্ঘ শাসনের সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সংস্কৃতিকে অটুট রেখেছিলেন। বাম ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে পারে কিন্তু তার সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। রাজনৈতিক ক্ষমতা অপসারিত হতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির অবক্ষয় হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এছাড়াও তাঁরা মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জাতপাতের রীতি নীতি সর্বত্রই ছিল। ব্যক্তিগত পরিসরে জাতপাত ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত কখনোই নির্ণায়ক ভূমিকা হয়নি। বাম সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ছিলেন মানবতায় বিশ্বাসী। বাম মতাদর্শে বিশ্বাসীরা জাতপাত ধর্মকে উপরিসৌধ এবং অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোক শ্রেণী এই সংস্কৃতির প্রবাহমানতাকে অটুট রেখেছিলেন। বাম শাসনের অপসারণ হলেও পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণী এই সংস্কৃতির প্রবাহমানতাকে ধরে রাখবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত গৌণ হিসেবেই থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে জাতপাতের পরিধি থাকলেও রাজনৈতিক জীবনে এর কোন গুরুত্ব নেই।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বাম দর্শন ও আদর্শ অনুসারে শ্রমিক কৃষকদের তাঁরা পক্ষপাতী এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। ২০০৮ সালে বামেরা যখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে নেয় তখন তাঁরা আমেরিকাকে পুঁজিপতির দালাল বলে গণ্য করেন। নন্দীগ্রামে বামেরা কৃষকদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের যে আন্দোলন তাতে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বামপন্থীদের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ মমতা

ব্যানার্জিকে বামপন্থী হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তাঁরা মনে করেন যে বামপন্থীদের বিচ্যুতির ফলে মমতা ব্যানার্জি প্রকৃত বামপন্থার পথ অনুসরণ করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এছাড়াও প্রশ্ন করা হয় যে মমতা ব্যানার্জির যে রাজনীতি তা সাধারণত ভদ্রলোক শ্রেণী দ্বারা প্রভাবিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণীর বাইরে এক ধরনের জনমোহিনী রাজনীতির উত্তরণ হচ্ছে। এই জনমোহিনী রাজনীতির বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতপাতের রাজনীতির নেতৃত্বগণ রয়েছে।

শুধুমাত্র মতুয়া মহাসংঘ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা নয়। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য তপশিলি সম্প্রদায়রা বাম বিরোধী জোটের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। ২০০৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই দুই জেলায় বামপন্থীদের ব্যাপক পরাজয় ঘটে। পৌণ্ড্রসম্প্রদায় একচ্ছত্রভাবে তৃণমূল কংগ্রেসেকে সমর্থন জানায়। বামপন্থীদের আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পার্টির যে আধিপত্য ছিল তা বিঘ্নিত হয়। বামপন্থীদের বেশিরভাগ নেতা যারা ছিলেন উচ্চবর্ণের ও ভদ্রলোক শ্রেণীর তাঁরা সাধারণত পার্টি নির্ণয় ভূমিকায় থাকবেন। পার্টির নিচে থাকা বেশিরভাগ সমর্থক ছিল তপশিলি জাতির। অর্থাৎ নেতৃত্ব স্থানীয়রা ছিল উচ্চবর্ণ ভদ্রলোক শ্রেণী এবং পার্টির ক্যাডার ছিল তপশিলি সম্প্রদায়। ২০১১ নির্বাচনী বামপন্থীদের নেতৃত্ব স্থানীয় ভদ্রলোকের কর্তৃত্ব বজায় থাকলেও নিচু স্তরের ক্যাডারদের আধিপত্য কমে যায়। পার্টি ক্ষমতাসীন থাকার সময় যেভাবে পার্টি ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন তার অবসান ঘটে। পার্টির উপর তলার নেতাঁদের নির্দেশ যেভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ক্যাডাররা সক্রিয় ভূমিকা নিতেন তা কিছুটা হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ভদ্রলোক শ্রেণী যেভাবে পার্টির মাধ্যমে নিচুতলা অবধি তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করত তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পার্টির নিচুতলার বেশিরভাগ ক্যাডার তপশিলি সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁরা পার্টির উচ্চবর্ণের নেতৃত্বে আধিপত্যকে আর মেনে নিতে রাজি ছিল না। ফলস্বরূপ পার্টির নিচের স্তরের ক্যাডারদের সংখ্যা কমতে থাকে। এবং জাতপাত ভিত্তিক আঞ্চলিক নেতাদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। আঞ্চলিক নেতাগণ বাম বিরোধী রাজনীতিকে আরো জোরদার করে। আঞ্চলিক স্তরে তপশিলি সম্প্রদায়দের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে বামেদের আধিপত্য কমতে থাকে।

শ্রেণী রাজনীতিতে ভদ্রলোক ও বামপন্থা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাম ক্ষমতার রাজনীতির সময় পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ভদ্রলোকেরা বামপন্থী মতাদর্শের নির্মাণ করেছেন। বাম ভদ্রলোক শ্রেণী শুধুমাত্র পার্টির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিলেন না। তাঁরা পার্টির তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে পার্টির তাত্ত্বিক লোকদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের শ্রেণী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী বলতে সমাজের সেই অংশকে বোঝায় যারা বুদ্ধিগত ভাবে কোন সমস্যাকে দেখতে পারেন ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁদের তুলনামূলকভাবে একটি শ্রেণী পক্ষে অবস্থান থাকে।[40] তবে সমাজ ব্যবস্থায় ও কাঠামোতে শ্রেণী বৈষম্য নেই তা কখনোই বলা চলে না। শ্রেণী বৈষম্য থাকাই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় ও সমাজ কাঠামোতে ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের একটি শ্রেণী নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকাটাই কাম্য। গ্রামসির ইন্টেলেকচুয়াল -এ বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা পাওয়া যায়। তার প্রশ্ন বুদ্ধিজীবীরা কি একটি স্বাধীন সামাজিক সত্তা বা গোষ্ঠী নাকি সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজস্ব বুদ্ধিজীবী থাকে? গ্রামসি মনে করেন যে শ্রেণী বৈষম্য সমাজে বুদ্ধিজীবীরা প্রবর্তনকারী শ্রেণী পক্ষে সর্বদাই কাজ করে থাকে।[41]

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক শ্রেণী রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে বামপন্থার আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা খুবই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থার তাত্ত্বিক কাঠামো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি আদর্শ ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা নির্মিত। তবে বামপন্থার বাইরের এক তাত্ত্বিক নির্মাণ রয়েছে। যা মূলত পশ্চিমবাংলার বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ, বামপন্থী সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী রাজনীতির অবস্থান, এবং শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারা ভারতে এক জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে। এই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ছাড়িয়ে কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের সমস্ত রকমের শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে এক শ্রেণী চেতনার বাম সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। বামপন্থী এই সংস্কৃতি নিছক পার্টিগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু প্রগতিশীল

---

[40] ঘোষ, বিনয়, বাংলার বিদ্বৎ সমাজত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৪০৬, পৃ. ৫।

[41] Gramsci, Antonio, *Selection from the Prision Notebooks*, International Publishers, New York, 1989, পৃ. ৫।

মানুষ বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত ছিলেন না।

ভদ্রলোক পরবর্তী জাতপাত রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বাম শাসনকালে বামেদের রাজনীতিতে জাতপাত ধর্ম কিংবা অন্য কোনো সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা ছিল না। ভারতের রাজনীতিতে পার্টির আধিপত্য ছিল মূল বিষয়। পার্টি নিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে ভদ্রলোক শ্রেণী ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নীতি নির্ধারণ ও রাজনৈতিক যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকাই মুখ্য। গ্রামীণ এলাকাতে জাতপাত থাকলেও এগুলো ছিল পার্টির নিয়ন্ত্রণে। জাতপাতের যেকোনো রীতিনীতি সেগুলো ব্যক্তিগত জীবনে থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল না। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো জাতপাতকে কখনো পার্টির অভ্যন্তরে গুরুত্বের সহকারে দেখেন নি। গ্রামীণ এলাকাতে জাতপাত থাকলেও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা ছিল গৌণ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'পার্টি সোসাইটি' রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা 'পার্টি সোসাইটি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ পার্টির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল মূল কথা। ব্যক্তি নয় কিংবা জাতপাত নয় পার্টি সকল কিছুর উর্ধে। পার্টি সোসাইটি এর সকল সিদ্ধান্ত সকল দলীয় কর্মী ও নেতাদের মেনে নিতে হতো। পার্টি সোসাইটির এই সিদ্ধান্ত ভদ্রলোক শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বাম শাসনের পরবর্তী সময় বাম সংগঠনের ভাঙ্গন ধরে এবং পার্টি সোসাইটির প্রভাব কমতে থাকে। পার্টির নির্দেশিত সিদ্ধান্ত ক্যাডাররা অনেকেই মেনে নিতে রাজি ছিল না। ফলে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ঘটতে থাকে। পার্টি সোসাইটির প্রভাবে বাম শাসনকালে জাতপাত ধর্ম কিংবা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক রাজনৈতিক ইচ্ছার কোন গুরুত্ব ছিল না। পার্টি সোসাইটি ছিল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। বাম ক্ষমতার অবসানের পরে ধীরে ধীরে পার্টি সোসাইটির অবসান ঘটতে থাকে।[42]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাংক পার্টির নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ভোটব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ,

---

[42] গুহ, অয়ন, *কাস্ট এন্ড পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: ট্র্যাডিশনাল লিমিটেশন এন্ড কন্টেমপরারি ডেভলপমেন্ট*, সেজ, পৃ. ৩৪।

দক্ষিণবঙ্গে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ, ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহাসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নিচুজাতের সম্প্রদায়ের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং নতুন সরকার এই বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর ইচ্ছাকে গুরুত্বের সঙ্গে সমর্থন জানায়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ড ও ভাষা পরিষদ গঠিত হয়। উত্তর বঙ্গের রাজবংশীরা তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরে রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবি জানায়। এছাড়া রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁদের আত্মপরিচিতি ও নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির রক্ষার দাবিকে দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন। শুধু তাই নয় রাজবংশীদের একটা অংশ বিশেষ করে কামতাপুরী ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার দাবিও দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। রাজবংশীদের ভাষাভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আলাদা রাজ্য গঠনের দাবিও দীর্ঘদিনের। এতদিন যাবৎ বাম রাজনীতি পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। রাজবংশীগণ দাবি জানায় যে তাঁদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া পার্টি নেতারা দিতে ব্যর্থ। অর্থাৎ যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তাঁরা বেশিরভাগই রাজবংশী নন। এর ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি আত্মপরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মাধ্যমে তাঁদের দাবি-দাওয়া পূরণের দাবি জানায়। এছাড়া উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের চাপে সমাজসংস্কারক পঞ্চানন বর্মার নামে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়।

উত্তরবঙ্গের নমঃশূদ্র মতুয়া সম্প্রদায়ের তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নমঃশূদ্র উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবি জানায়। নমঃশূদ্রদের যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ছিল তা বাম শাসনের সময় পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এমনকি বাম শাসনের সময় সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সিদ্ধান্তে অনেকবার নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। নমঃশূদ্রদের ও মতুয়াদের আত্মবঞ্চনা অচিরেই থেকে যায়। ২০১১ সালের পর নমঃশূদ্রদের জন্য নমঃশুদ্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এছাড়াও তপশিলিদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য দলিত সাহিত্য একাডেমি গঠন করার মধ্য দিয়ে তপশিলি ক্ষোভ প্রশমিত করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে মতুয়া সমাজ সংস্কারক হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক তুলনা করা হয় তাহলে দেখতে পাব যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় পার্টি সোসাইটির ভূমিকা খুবই নগণ্য। জাতপাত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে বেশি। ধর্মীয় কিংবা জাতপাতের সংগঠনের মধ্যে পার্টি সোসাইটির আধিপত্য না থাকায় এরা পার্টির ঊর্ধ্বে

জাতপাত ও ধর্মকে স্থান দেয়। ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতপাত ও ধর্ম নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতকে কখনোই পার্টির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়নি। মতাদর্শ অনুসারে জাতপাত, ধর্ম উপরিসৌধ এবং অর্থনীতি হল মূল ভিত্তি। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পার্টি আধিপত্য ছিল তাঁদের কাছে মূল প্রেরণা। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলি রয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, দক্ষিণবঙ্গে মতুয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, বাউরিদের ওপর বামপন্থীদের পার্টি সোসাইটির প্রভাব কমতে থাকে এবং জাতপাত রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থন জানায়। এই সমর্থনের পেছনে পার্টির ভূমিকা থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মেরুকরণের ভূমিকা মুখ্য ছিল। নির্বাচনে যারা জয় লাভ করেন তাঁরা বেশিরভাগই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মুখ। রাঢ়বঙ্গের নিচুজাতের ত্রিলোচন মাহাতো এর মৃত্যুর ঘটনা আদিবাসী, বাগদি, বাউরি সম্প্রদায়কে জাতপাতের চেতনায় এতটাই প্রভাবিত করে যে পার্টির চেয়ে জাতপাতের চেতনা রাজনৈতিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। দক্ষিণবঙ্গে নমঃশূদ্র ও তপশিলি সম্প্রদায় ও মতুয়া সম্প্রদায় সারা ভারত মতুয়া সংঘের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের আধ্যাত্মিক দেবালয় ঠাকুরনগর ও ঠাকুর পরিবার দুই রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ঠাকুর পরিবারের পার্টির আধিপত্য যা ছিল তা কমতে থাকে। মতুয়া রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নির্বাচনী ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে ২০১৯ এর নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে থেকে পার্টি সোসাইটি ও ভদ্রলোকের আধিপত্য কমতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পার্টির ভূমিকা ও রাজনৈতিক দলগুলোর যে পার্টির আধিপত্য ছিল তা ভেঙে যায়। জাতপাতের রাজনীতি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ভদ্রলোক শ্রেণী রাজনীতির ভূমিকায় নিষ্ক্রিয় হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সময়ে যে উচ্চবিত্তরা ছিল তাঁরাই ছিল পার্টির উচ্চস্তরের নেতা। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম ভাবধারার এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব হয়। দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে বাম ভাবধারার এই মধ্যবিত্তরা একটা অংশ বিশেষ করে যারা উচ্চবর্ণের তাঁরা উচ্চবিত্তে পরিণত হয়। রাজ্য রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যেমন পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দাপট ছিল তেমনি উচ্চ মধ্যবিত্ত কিন্তু উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ভদ্র সমাজের দাপট ও ছিল। পার্টির

অভ্যন্তরে বাঙালি ভদ্র বাবুদের গ্রহণযোগ্যতাও সর্বক্ষেত্রে ছিল। এই ভদ্রলোক হিন্দু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের দাপট ছিল। এই উচ্চবর্ণের ওদের পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতাও বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ছিল। এরা অনেকেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিচারে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ও বিত্তশালী পরিবার থেকে এসেছেন। পারিবারিক এই সম্মান ভদ্র বাঙালি চেতনা পার্টির ক্ষেত্রে অনেকটাই কাজে লাগতো। পার্টি সরাসরি তা স্বীকার না করলেও পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে এই ভদ্রলোক ও ছোটলোক এই পার্থক্য সর্বদাই ছিল। তবে জাতি কাঠামোয় এই ভদ্রলোক ছোটলোক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সর্বত্রই বিরাজ করতো। কলকাতার ভদ্র, শিক্ষিত উচ্চবিত্তরা পার্টিতে সর্বদাই জেলা স্তরের নেতৃত্বকে প্রভাবিত করত। নেতৃত্ব তৈরির ব্যাপারে এই ভদ্রলোক বাম শ্রেণীর সিদ্ধান্ত ছিল পার্টির মধ্যে সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং জেলা স্তরের নেতৃত্ব তৈরিতে ভদ্রলোক সমাজের দাপট থেকে বাম রাজনীতি কখনোই মুক্ত হতে পারেনি। তবে বামফ্রন্ট ক্ষমতার রাজনীতি থেকে চলে যাওয়ার পরে রাজ্য রাজনীতিতে বামফ্রন্টের এই পুরনো সিস্টেম বা ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙে পড়ে। জেলা স্তরের রাজনীতি ভদ্র সমাজের দাপট থেকে মুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে এক নতুন ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী উত্থান ঘটে। এছাড়াও জেলা স্তরের অনেক ভদ্রলোক নেতৃত্ব পার্টির নেতৃত্ব থেকে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোয় এদের কর্তৃত্ব পার্টির ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। জেলাগুলোতে স্থানীয় নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতপাতের ও সংখ্যালঘুদের কর্তৃত্ব থাকলেও বাম আমলে জেলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় শুধুমাত্র বাঙালি ভদ্রলোক দেখতে পাওয়া যেত। জেলায় স্তরের পার্টির উপর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এই ভদ্রলোক শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করত।

জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর জেলায় সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ৬৩ শতাংশ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫০ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এই জেলায়গুলোতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তপশিলি জাতির মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বাম আমলে এই জেলাগুলোর পার্টির নেতৃত্ব সর্বদাই কোন না কোন ভদ্রলোক শ্রেণীর হাতে থাকতো। অর্থাৎ এই জেলাগুলোর পার্টির সম্পাদক কখনোই সংখ্যালঘু কিংবা তপশিলিদের করা হয় নি। তবে এই জেলাগুলোতে স্থানীয় নির্বাচন, বিধানসভা, লোকসভা আসনে কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু ও তপশিলি মুখ উঠে এসেছে। কারণ এই তপশিলি ও সংখ্যালঘুরা ভোট ব্যাংকের নিরিখে

অনেকটাই এগিয়ে। তাই পার্টির কাছে নির্বাচনী বাধ্যবাধকতা থেকেই তপশিলি ও সংখ্যালঘুদের প্রার্থী করা হতো। নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে পার্টির ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য কমতে থাকে। বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার যদি জনসংখ্যার বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই দুটো জেলাতে তপশিলিদের একটি ব্যাপক সংখ্যা রয়েছে। বীরভূম জেলায় বাউরি, ডোম, বাগদি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এবং এই জেলার ৩৭.১ শতাংশ সংখ্যালঘু। দক্ষিণ ২৪ পপগণা জেলার তপশিলদের মধ্যে যেমন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বাগদি, নমঃশূদ্র সংখ্যাধিক্য এবং এই জেলার ৩৫.৬ শতাংশ সংখ্যালঘু। বামফ্রন্টের সময়কালে এই দুটি জেলার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো তপশিলি ও সংখ্যালঘু মুখ দেখতে পাওয়া যায়নি। এই জেলাগুলোতে সর্বদাই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের আধিপত্য ছিল।

রাজ্য রাজনীতি নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রতি আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ২০০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৩টি আসনে জয়লাভ করেন। ৫৪টি তপশিলি আসনে জয়লাভ করে বামফ্রন্ট আবার স্বমহিমায় ফিরে আসে।[43] সরকারের বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব দেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৪৪ সদস্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই মন্ত্রিসভায় তপশিলিদের স্থান ছিল খুবই নগণ্য। শুধুমাত্র তপশিলি নয় এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু ও মহিলা মুখ ছিল নিতান্তই কম। ২০১১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক জয়লাভ করেন এবং মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যে ৪২ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাতে বিভিন্ন শ্রেণী প্রতিনিধি ছিলেন। তৃণমূলের মন্ত্রিসভার সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখবো যে ২০০৬ সালের বামফ্রন্টের মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৬.৫১ শতাংশ ৬.৮১ শতাংশ। ২০১৬ সালের তৃণমূলের আমলে রাজ্য মন্ত্রিসভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১.৯। ২০০৬ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভায় পৌণ্ড্রদের ১৬.৯০ ও ৪.৫৪ শতাংশ এবং মুসলিম ছিল ১১.৬ শতাংশ। ২০১৬ সালের তৃণমূলের মন্ত্রিসভা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে, তৃণমূলের মন্ত্রিসভায় তপশিলিদের সংখ্যা ১৬.৬৬ শতাংশ, আদিবাসীদের সংখ্যা ৭.১৪ শতাংশ এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ১৬.৭ শতাংশ। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা যে ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকারের যে সংখ্যক বিধায়ক ছিল তৃণমূল

[43] বর্মণ, রূপ কুমার, *জাতি রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত পতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* আলফাবেট বুকস, কলকাতা,২০১৯, পৃ. ৯৫।

সরকারের তার থেকে বিধায়ক সংখ্যা অনেক কম। বিধায়ক সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তপশিলি জাতি, তপশিলী উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের মন্ত্রিসভায় সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দীর্ঘ বাম শাসনের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভদ্রলোক বাঙালিদের যেরকম আধিপত্য ছিল সর্বভারতীয় বাম রাজনীতি ক্ষেত্র তার অন্য কিছু ছিল না। বামেদের বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। এই রকম মূলত উচ্চবর্ণদের মধ্যে ছিল। বিভিন্ন দেশের প্রদেশের নেতারা রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করতেন। পশ্চিমবঙ্গের পার্টির ভদ্রলোক নেতৃত্ব দ্বিধা বিভক্ত ছিল। শুধুমাত্র রাজ্য নয়, জেলা স্তরের নেতৃত্ব গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বাম ক্ষমতার রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ায় অনেক গোষ্ঠী বাম রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ায়। সামাজিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বাম জেলা নেতৃত্ব যতটা উদাসীন ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সামাজিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বাম রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিকে ভিত্তি করে যে বিপুল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এই ইউনিয়নগুলোর বেশিরভাগ সদস্য ছিল তপশিলি সংখ্যালঘু। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর হাতে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠিত ক্ষেত্রে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের উপর সমভাবে জোর দেয়। ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ও তৃণমূলের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

বামফ্রন্টের রাজনীতি ও মতাদর্শের বিশ্বাসী পার্টির ক্যাডারগণ সর্বদাই গরিব ও মেহনতী মানুষের কথা বলতেন, ও মেহনতী মানুষের স্বার্থ রক্ষা তাঁদের কাছে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যেহেতু ভদ্রলোক ও উচ্চবর্ণদের হাতে ছিল ফলে বামফ্রন্টের রাজনীতি ও মতাদর্শের বিশ্বাসী গরিব ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ দেখবার জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। বরং যেটুকু সদিচ্ছা ছিল পার্টির ক্ষমতার রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার পরে তা আরও ক্ষয় হতে থাকে। পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রদবদল পার্টি বহুদিন আগে থেকেই গরিব ও শ্রমিক শ্রেণী স্বার্থ দেখার পরিবর্তে উচ্চবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ভদ্রলোক সমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চাকরি, আর্থিক সচ্ছলতা, অসামাজিক সচ্ছলতা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে তপশিলিরা উন্নতি লাভ করেছে, বামফ্রন্টের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে তাঁরা অনেকটাই পিছিয়ে। পার্টির আদর্শে, দলিলে গরিব ও শ্রমিক শ্রেণী কথা বলা হলেও রাজনৈতিক অনুসরণে অনুশীলন তার উপস্থিতি খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সালের সেই গতি আরো বৃদ্ধি পায়। ২০০১ ও ২০০৬ সালের নির্বাচনে মধ্যবিত্তরা বামফ্রন্টকে যেভাবে সমর্থন করেছিলেন তুলনামূলকভাবে গ্রামে বসবাসকারী তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে বামফ্রন্টের গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে।

দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী শহরে বসবাস করত এবং তাঁরা ছিল শিক্ষিত। শহর ও গ্রামীণ জীবনের পার্টির ক্যাডার উচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে একটি তফাৎ তৈরি হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী হলেও এর একটি অংশ ছিল সুবিধাভোগী। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলা রাজনীতিতে গরিব তপশিলি ও শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে এদের যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। মধ্যবর্তীদের একটি বড় অংশ বামফ্রন্টের ক্ষমতার সময় পার্টির সঙ্গে থাকলেও নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে একটি অংশ বামফ্রন্টের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই শ্রেণীর পার্টির উপর নির্ভরশীলতা খুবই ছিল। গ্রামের একটি অংশ ও শহরের একটি অংশ যারা জমি মাফিয়া, তোলাবাজ এবং নানাবিধ অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সুবিধাভোগী শ্রেণী। যাদের নিয়ন্ত্রণ করত একশ্রেণী মধ্যবিত্ত নেতা। এই মধ্যবিত্ত নেতাগণ সকল রাজনীতিবিদদের খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে বাম দলে এই সুবিধাভোগী শ্রেণী সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণীকে একটা সময় পর্যন্ত ভদ্রলোক শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লোভের কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক হিংসাতে এরা বামদলকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অপরদিকে বাম সরকারের এই সুবিধাভোগী শ্রেণী বৃদ্ধিতে একশ্রেণী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমান্তরালভাবে বিরোধী- শাসক পক্ষের ভাগে বিভক্ত হয়। পরিবর্তন পন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিরোধীদলগুলো পরিবর্তনের মুখ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি আন্দোলন, শিল্প আন্দোলন প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবীগণ সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক বুদ্ধিজীবীগণ বামেদের অংশ থেকে সরে আসতে শুরু করেন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেসকল পার্টির

নেতারা পার্টির স্থানীয় (লোকাল) শ্রেণীতে নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পরবর্তী সময়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পার্টি পরিবর্তন করেন এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশ সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন জানায়। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন জনমোহিনী রাজনীতির উদ্ভব হয়। রাজনীতিতে ভদ্রলোক শ্রেণী আধিপত্য হ্রাস পায় এবং পার্টির যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ছিল তাও হ্রাস পায়। ক্ষমতার রাজনীতির অবসরের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামেদের সাংগঠনিক অবক্ষয় শুরু হয়। অপরদিকে তপশিলি জাতি উপজাতীয় সংখ্যালঘুরা ব্যাপক হারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জানায়।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত সমীকরণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের বড়মা বীণাপাণি দেবীর নেতৃত্বে যে মতুয়া আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। মতুয়া মহাসংঘ নাগরিকত্ব আন্দোলনের জোরদার করে ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনের অনুরোধ জানায়। মতুয়া ভক্তগণ সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের ছত্রছায়ায় এই আন্দোলনকে জোরদার করে। কলকাতার রাসমণি বাগানে বড়মার নেতৃত্বে উদ্বাস্তুদের ও নাগরিকত্বের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে সকল রাজনৈতিক দল সমর্থন জানায়।[44] এই সমর্থনের পিছনে অনেক রাজনৈতিক কৌশল ছিল। বাম রাজনৈতিক দলগুলো এই আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস 'মতুয়া' উদ্বাস্তুদের এই আন্দোলনকে বাম বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করে। বড়মা বীণাপাণি দেবী তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করায় ২০১১ সালের মতুয়া তথা নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা ব্যাপক হারে তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন জানায়।[45] নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলি ও উত্তরবঙ্গের বিস্তারিত নমঃশূদ্র অধ্যুষিত বেশিরভাগ বিধানসভা আসন তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে। মতুয়াদের এই আন্দোলনের ফলে উদ্বাস্তু আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। উদ্বাস্তুরা মতুয়া মহাসংঘ ছত্রছায়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের কার্যকলাপ শুধুমাত্র ঠাকুর নগর কেন্দ্রিক

[44] *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

[45] *এই সময়*, ২৬ মার্চ, ২০১১।

আধ্যাত্মিক দেবালয় মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধীরে ধীরে এরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে থাকে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবীগণ রাজনীতিবিদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। অপরদিকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৭০ সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ ধীরে ধীরে তাঁদের সামাজিক সংস্কার থেকে রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটাতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা পৌণ্ড্রদের রাজনৈতিক উত্তরণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। ২০০৩-০৪ সালে তৈরি হয় ভারতীয় পৌণ্ড্র সোসাইটি। এই পৌণ্ড্র সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক উত্তরণ, সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন, অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি, শিক্ষার উন্নয়ন, এছাড়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক উত্তরণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশেষে ২০০৮ সালে গড়ে ওঠে পৌণ্ড্রমহাসংঘ। দীর্ঘদিন ধরে পৌণ্ড্রদের আত্মপরিচিতি নির্মাণের যে ব্যর্থতা ছিল তার প্রতি জোর দেওয়া হয়। পৌণ্ড্র মহাসংঘ মূল নিবাসী পরিচিতি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ পৌণ্ড্র সমাজে পৌণ্ড্র মহাসংঘ ধীরে ধীরে সংগঠিত রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণের অগ্রসর হয়। ২০১৮ নির্বাচনে পৌণ্ড্র সমাজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দান করে। ২০১১ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক হারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমর্থন লাভ করে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ গণপরিষদ কামতাপুরী পিপলস পার্টি তাঁদের রাজনৈতিক বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে তাঁরা আত্মপরিচিতি নির্মাণের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল হয়। ১৯৮৭ সালে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলনের পথে তাঁরা অগ্রসর হয়। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বাম বিরোধী আন্দোলনের ও গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। ২০১১ সালে নির্বাচনী তপশিলিদের এই আন্দোলনগুলো দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জাতপাত রাজনীতিকে গতির সঞ্চার করে। উত্তরবঙ্গ, মধ্য বঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের তপশিলিরা তাঁদের আত্মপরিচিতি ও রাজনৈতিক দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তপশিলি গোষ্ঠীকে তাঁদের ধর্মীয় মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে থাকে। ঠাকুরনগরের আধ্যাত্মিক দেবালয় ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাংঘাতিক পরিবার দুটি রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। বড়মা বীণাপাণি দেবীর বড়পুত্র বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের এম.পি. থাকাকালীন মৃত্যু ঘটে এবং এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে

ঠাকুর পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বড়মা বীণাপাণি দেবীর বড় পুত্রবধূ তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ছোট পুত্র মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বহিরাগতরা ভাটির দেশের লোকদের সব সময় তাঁদের প্রতি একটা অনীহা ছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির এন.আর.সি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের নমঃশুদ্র তথা মতুয়ারা নাগরিকত্বের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছিলেন। ফলে নমঃশূদ্র ও মতুয়াদের কাছে সি.এ.এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুটি আইন ভিন্ন ভিন্ন হলেও তপশিলি সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের নির্ণায়ক শক্তি হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতির ভবিষ্যৎ

দেশভাগ ও বাঙালি তপশিলি সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশভাগের ফলে তপশিলিদের এদেশে ব্যাপক জনসংখ্যা ছিল তার ব্যাপ্তি আড়াআড়ি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তপশিলিদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ঘটে। দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে তপশিলিদের যে আন্দোলন তা স্তব্ধ হয়ে যায়। দেশভাগের ফলে জাতপাত রাজনীতির একপ্রকার অবসান ঘটে। একটি বৃহৎ অংশ পূর্ব বাংলায় থাকায় তপশিলিদের অভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি আর গড়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া তপশিলিদের যে নেতাগণ ছিলেন তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়ায় তপশিলিদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে পূর্ববঙ্গে থাকেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের রাজনীতি একপ্রকার অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী, নমঃশূদ্র মতুয়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সেভাবে তেমন কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কংগ্রেস আমলে তপশিলিরা কংগ্রেসকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষমতায় রেখেছে । কংগ্রেস সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতিকে গড়ে তুলতে দেননি। পরবর্তী সময়ে বাম রাজনীতিতে জাতপাতকে কোনভাবেই স্থান দেওয়া হয়নি। রাজনীতিকে শ্রেণী রাজনীতির মোড়কে ব্যবহার করেছেন। জাতপাতের মানুষদের ভোটকে সুকৌশলে নিজেদের পার্টির ভোট ব্যাংকে পরিণত করেছে। তপশিলি সম্প্রদায়গুলো নিজেদের কোন রাজনৈতিক অস্তিত্ব তৈরি করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের আধিপত্যের সময় (১৯৭৭-২০১০) তাঁরা

বামপন্থী দলগুলোর রাজনৈতিক আদর্শের অনুগত প্রচারক ও সঙ্ঘবদ্ধ ঝান্ডাবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।[46]

পর্যবেক্ষণ

জাতপাত রাজনীতির আত্মপরিচিতি স্বপক্ষে লড়াই আত্মপরিচিতি লড়াই বামেরা দীর্ঘদিন ধরেই জাতপাতের রাজনীতিকে দমিয়ে রেখেছি। জাতপাতকে বামেরা শ্রেণী মোড়কে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তপশিলিদের ব্যবহার করল তাঁদের আত্মপরিচিতির রাজনীতিতে কখনোই গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তপশিলি জাতিগুলোর আত্মপরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তপশিলিরা বাম আমলে তাঁদের রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটাতে পারেন নি। বাম দলগুলো তাঁদের মতাদর্শকে সামনে রেখে তপশিলিদের এই আত্মপরিচিতি ও রাজনৈতিক উত্তরণকে সর্বদায় দমিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে ও সামাজিক রীতিতে জাতপাতের স্থান থাকলেও রাজনীতিতে তার প্রকট ছিল না। বাম অবসানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে জাতপাত রাজনীতির উত্তরণের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠী এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের অবসরের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তপশিলি সম্প্রদায় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা রাজনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হিসাবে উত্তরণ ঘটে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের নমঃশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ের এক রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটে। বড়মা বীণাপাণি দেবীর নেতৃত্বে নমঃশূদ্র তপশিলিরা বাম সরকারের অবসানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের যে রাজনৈতিক উত্তরণ ঘটে তাতে নমঃশূদ্র মতুয়ারা ও রাজবংশী সম্প্রদায়দের থেকে মন্ত্রিত্ব করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে তপশিলিদের স্থান দেওয়া হয়।

বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল লোকসংস্কৃতির উত্থান ঘটে। বামেরা পশ্চিমবঙ্গে যে সংস্কৃতির উদ্ভাবন করেন তাতে জাতপাতের কোন স্থান ছিল না। প্রগতিশীল এক শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ধর্ম নিরপেক্ষ এক সংস্কৃতি তৈরি করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সংস্কৃতি ধারা পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনকে মজবুত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক

---

[46] বর্মণ, রূপ কুমার, *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ, জাত পাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ,* গাংচিল, কলকাতা,২০২২, পৃ. ৫৮।

সংস্কৃতিতে ভদ্রলোকের আধিপত্য ছিল প্রধান। ভদ্রলোক শ্রেণী নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতেন। এর ফলে তপশিলিদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির অনেকটাই অবদমন হয়। রাজনৈতিক পরিসরে এই ভদ্রলোক শ্রেণী সংস্কৃতি অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে। বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই ভদ্রলোক শ্রেণী আধিপত্য কমতে থাকে। বাম ধর্মনিরপেক্ষ ভদ্রলোক শ্রেণী সংস্কৃতির অক্ষয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে জাতপাত ভিত্তিক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তবে দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রভাব ধারাবাহিকতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্ম ও জাতপাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। সারা ভারতে বামপন্থী ধারার বিরোধী ডানপন্থী ধারার রাজনৈতিক উত্থান ঘটতে থাকে। ফলে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে ডান পন্থীদের উত্তরণ ঘটে। এই অতি ডানপন্থীদের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতিকে সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়। জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন জায়গাতে এক আঞ্চলিক রাজনীতির উদ্ভব ঘটে। রাজনীতি এই প্রবণতাকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী রাজনীতির অবসানের মধ্য দিয়ে জাতপাতের রাজনীতি এক নতুন মোড়কে উত্তরণ ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতপাত ও জাতি রাজনীতির সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ঐতিহাসিক প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের সময় ও সংসদীয় গণতন্ত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় চেতনার প্রমাণ্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক তপশিলি জাতিগুলি সামাজিকভাবে জাতপাত চেতনার প্রকাশ করলেও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ভিত্তিক রাজনীতিতে তার দৃশ্যমানতা অস্পষ্ট ছিল। ডক্টর কৃষ্ণ কুমার সরকার জাতপাত ভিত্তিক জাতিগুলি পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে তথা ভারতের নির্বাচন ভিত্তিক রাজনীতি অংশগ্রহণকে 'রাজনৈতিক দল দাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য জাতপাত ভিত্তিক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক দলগুলির বিভিন্ন সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক শক্তির হিসেবে কৌশলে ব্যবহার করেছেন।

ভারতের মূলস্রোতের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজ্যের জাতপাতের রাজনীতি কৌশল ও প্রভাব যেভাবে সক্রিয়ভাবে পরিলক্ষিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতি তেমনভাবে সক্রিয়ভাবে পরিলক্ষিত না হলেও নিষ্ক্রিয় ভাবে আঞ্চলিক স্তরের রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলিদের বৃহত্তম গোষ্ঠী উচ্চবর্ণীয় বাম সংস্কৃতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল নির্মাণে যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি উচ্চবর্ণীযদের দ্বারা পরিচালিত বাম ডান উভয় রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে তপশিলিজাতিরা ক্ষমতার রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়েছেন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নির্বাচনে জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ভোট ব্যাংক হিসেবে সকল রাজনৈতিক দলের কৌশল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ।

জাতপাত ভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক কখনোই নিজস্ব শক্তিরূপে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পিছনে জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তঃবিভাজন ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতা অনেক অংশে দায়ী করা হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠী কোন শূদ্র জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজন ও দক্ষিণবঙ্গের নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃবিভাজন রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার

পূর্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তপশিলিজাতিভুক্তরা বামপন্থী মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কংগ্রেস শাসন সময়ে বাম-ডান মিশ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশীয়ানার অবদান হিসেবে উচ্চবর্ণের দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ও মতাদর্শে জাতপাতের পরিবর্তে প্রান্তিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরেন। বামপন্থী রাজনীতিতে জাতপাত ভিত্তিক তপশিলিদেরকে অনুগত প্রচারক, ঝান্ডাধারী ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণী হিসেবে তুলে ধরা হয়।

বামপন্থীরা নীতিগতভাবে জাতপাত রাজনীতিতে বিশ্বাসী না হল বাম শাসনকালে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে জাতপাতকে ব্যবহার না করলেও পরোক্ষভাবে জাতপাতের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সর্বহারা শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা বাম কৌশলে জাতিভিত্তিক বিদ্বজনের নজরে আসে এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অনুগত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় নির্বাচনে গণতন্ত্রের জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র ‘ভোট ব্যাংক’ হিসেবে নয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ‘রাজনৈতিক কৌশল’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্যান্য রাজ্যের মতো না হলো জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। শুধুমাত্র পুনর্নির্মাণ নয় পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি মূলস্রোতের রাজনীতির সঙ্গে বিদ্যায়তনিকচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তথাপি মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলের মতো জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠন থেকে ভিন্নতর।

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির সময়কালকে (১৯৭৭-২০১১) রাজনৈতিক আলোচনায় শ্রেণী রাজনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাম রাজনীতি মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যাকে বাম রাজনীতিতে বা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ‘ভিত’ বলা হয়। বাম রাজনীতির সঙ্গে জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কোনো সম্পর্কই নেই। বাম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে জাতপাত ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বাম রাজনীতিতে জাতপাতের কোন স্থান নেই। ১৯৭৭ সালের পূর্বে জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নগণ্য থাকলেও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পশ্চিমবঙ্গের

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতপাত ভিত্তিক রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটায়। বামপন্থী দলগুলো ও তার সহযোগী দলের সহযোগিতায় শ্রেণী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ জাতপাত ভিত্তিক সংরক্ষিত আসন ক্ষমতা দখল করে। এই সময়কালে ডানপন্থী কংগ্রেস রাজনীতি থেকে জাতপাত ভিত্তিক শ্রেণীর রাজনীতি নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। তপশিলি সম্প্রদায়ের উপর বাম সংগঠনের যেরকম নিয়ন্ত্রণ ছিল তেমনি বামফ্রন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা সুকৌশলে রক্ষা করতে সম্ভব হয়েছিল।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের সেই রাজনৈতিক শক্তি ও কৌশল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। এমনকি বামফ্রন্টের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রথম জমানাতে লক্ষ্য করা যায়। বামফ্রন্টের সময়কালে জাতপাতের রাজনীতি শ্রেণীর রাজনীতিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্তরে শিক্ষা ও ভূমি সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষক ভাগ চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণীর অবসান সম্পূর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারটাও প্রশ্ন বিমুখ নয়। বামফ্রন্টের প্রথম অবস্থাতে বৃহত্তম জমিদারদের জমি ভূমিহীন ও ছোট কৃষকদের মধ্যে বন্টনের মধ্য দিয়ে শ্রেণীর অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী সময় প্রান্তিক চাষি এবং মধ্যবর্তী চাষিদের মধ্যে মজুরির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ভূমিহীন ছোট কৃষকরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তুললে মাঝারি চাষিরা তা দিতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে পার্টি কৃষকদের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন।

বামফ্রন্টের শাসনকালে গ্রামীন স্তরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য শিক্ষা ও শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষক প্রান্তিক এলাকার পার্টির আদর্শবাণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এতে একদিকে যেমন রাজনৈতিক কৌশল অপরদিকে গ্রামীণ এলাকার পার্টির গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্টের শাসনকালে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে জাতপাতের বিপরীতমুখী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বামফ্রন্টের প্রথম শিক্ষামন্ত্রি কান্তি বিশ্বাস তার আত্মজীবনী *আমার জীবন ও কিছু কথা* উল্লেখ করেন যে তিনি স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ায় পার্টির উচ্চবর্ণ তৎকালীন পার্টির সেক্রেটারি প্রমোদ দাশগুপ্তকে পত্র মারফত নিন্দা প্রকাশ করেন। ১৯৯৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন

রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে যা বামফ্রন্টের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, ভাঙ্গড়ের কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১১ সালের দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ২০১১ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত রাজনীতির উত্তরণ ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেয় ।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব ভারতের রাজনীতিতেও পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিশন গঠন গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে বাম রাজনীতির উত্থান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতিতে বাম বিরোধী হিসেবে উত্তরণ ঘটে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামেরা শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। দেশভাগের ফলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ, খাদ্য সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, বেকার সমস্যা, কৃষি ও শিল্পের রাজনীতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাম দলগুলো তাঁদের রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস মূলত উচ্চবর্ণীয় জমিদার, জোতদার, খাজনা ভোগী ভদ্রলোকদের নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

কংগ্রেসের রাজনীতিতে ভদ্রলোকরাই রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের জমিদার, জোতদার এবং ভাগ চাষীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। বাম রাজনৈতিক দলগুলো কংগ্রেসের বিরোধী হিসেবে এই শ্রেণীদ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেস স্বদেশীয়ানাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি গড়ে তুলেছিলেন প্রান্তিক মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলো শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, বেকার সমস্যা আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কংগ্রেস সরকার বিরোধী যে জনমত তৈরি হয় বামপন্থীরা তা রাজনৈতিক শ্রেণী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন।

১৯৫০ সালে সংযুক্ত বাংলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে বামপন্থীরা বাংলার শ্রেণী আন্দোলনকে মজবুত করতে সক্ষম হয়। এই

সময় ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে সংযুক্ত হয়। বিশেষ করে উদ্বাস্তুরা খাদ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিরোধী গণ আন্দোলনে যুক্ত হয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে উদ্বাস্তুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তারা যতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন হতদরিদ্র জাতপাতের মানুষের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ততটাই ছিল। ফলে জাতপাতের ভিত্তিতে যারা নিচু জাতের তারা কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় দক্ষিণবঙ্গের নমঃশূদ্র ও মতুয়ারা বামপন্থীদের পরিত্রাতা হিসাবে ভাবতে শুরু করেন। ন্যায্য মূল্যের ও রিলিফের খাবার পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

১৯৭৭ সালের পরবর্তী দুই দশক বামপন্থীদের আধিপত্যের দশক বলা হয়। এই সময় বামপন্থীদের গণভিত্তি আরও মজবুত হতে শুরু করে। বিশেষ করে তাঁদের সাংগঠনিক সক্ষমতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। বামপন্থীদের শ্রমিক সংগঠন উদ্বাস্তু সংগঠন, কৃষক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের এক ভদ্রলোক সংস্কৃতির উদ্ভব করেন। যাকে কেন্দ্র করে জাতপাত, ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই বাম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীগণ। অন্যদিকে জাতপাত ভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষের কাছে বামপন্থীরা ত্রাতা হয়ে ওঠেন। দেশভাগের পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তুরা বামেদের সংগঠনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠেন। ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে বামপন্থীরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। শেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আলাদা রাজ্যের দাবি উঠতে থাকে। গোর্খাল্যান্ড, ও জঙ্গলমহলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিরোধী রাজনৈতিক স্থান দখল করেন। পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস বামপন্থীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছোট আঙারিয়া ও বিভিন্ন জায়গায় গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বামপন্থীদের পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন।

পশ্চিমবাংলার জাতপাত ও শ্রেণীর সম্পর্কে যে বৈচিত্র্য রয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জাতপাত ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম ধারণা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে

জাতপাত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম। তার অন্যতম কারণ পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ব্যবস্থার প্রকৃতি অন্য রাজ্যের তুলনায় আলাদা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তাতে জাতপাত, বর্ণের স্থান খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে জাতপাত সামাজিক প্রথা হিসেবে কাজ করলেও তা কখনোই সামাজিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে নি। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে প্রচুর জাতপাত ভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায় তাঁদের কাছে ধর্ম ও জাতপাতের থেকে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, মজুরি প্রভৃতির জরুরি বেশি ছিল। ফলে জাতপাত ভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষেরা পেশা, বৃত্তি, রোজগার ও বাসস্থানের সংস্থানের জন্য তৎপর ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক মানুষের শ্রেণীর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একাধারে জাতপাত ভিত্তিক মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামোতে তারা উৎপাদক শ্রেণী এবং জাতপাত ভিত্তিতে তারা নিচু জাতি। অর্থনৈতিক কাঠামোতে এরা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। জাতপাত ভিত্তিক এই নিচু জাতিদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত জমিদার ভোগ দখল করে। উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তন ঘটায় বামপন্থীদের মূল ভিত্তি ছিল। জাতপাত ব্যবস্থা যেহেতু উপরিকাঠামো তাই এই উপরিকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন বামপন্থীদের কাছে নিরর্থক ছিল। অবিভক্ত বাংলায় রাজনীতিতে জাতপাতের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। জাতপাতকে কেন্দ্র করে বাংলা রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতপাতের ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য দেখা দেয়। জাতপাতের সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভাজন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় জাতপাতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে রাজবংশীদের প্রভাব যতটা বৃদ্ধি পায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তা ছিল নিতান্তই কম। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে নমঃশূদ্র, বাগদি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আধিপত্য যেভাবে বিস্তার লাভ করে তা জাতপাতের রাজনীতি গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলোতে বাউরিরা যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে অন্যান্য জেলা থেকে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক কেন্দ্রিকতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত চর্চায় জাতপাতের সামাজিক সংগঠন জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থান, বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক গতিময়তা প্রভৃতি বিষয়ে

ব্যাপক চর্চা হয়েছে। জাতপাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীরা মূলত বাংলার উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে গণ্য ছিলেন। বাংলায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ও শ্রমিক হিসেবে, যোগানদাতা হিসেবে এরা প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ঔপনিবেশিক বাংলার সংস্কৃতি, রাজনীতিতে এদের অবস্থান থাকলেও বাম শাসনকালে সেই অস্তিত্ব ক্রমে বিলীন হয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে বামেদের শ্রেণীর আন্দোলনকেই এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণীর লড়াইকে মূলত দায়ী করা হয়ে থাকে।

জাতপাতের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে হয়নি একথা বলা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। বাম শাসনকালে মূলস্রোতের রাজনীতিতে জাতপাতের সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকলেও জাতপাতকে বামেরা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থীরা জাতপাতের রাজনীতিকে ব্যতিক্রমভাবে তাঁদের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য রাজ্যের মত প্রকট না হলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় একথা বলা যায়না। বামেরা মূলত শ্রেণী রাজনীতির মোড়কে জাতপাতকে ব্যবহার করেছেন। জাতপাতের বৃহদংশকে তারা শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবর্ণীয় রাজনীতিবিদগণ পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিকে শ্রেণীর মোড়কে ব্যবহার করেছেন।

গ্রাম বাংলার বৃহত্তম অংশ যারা জাতপাতের ভিত্তিতে তপশিলি তাঁদের রাজনীতিকে ভোট ব্যাংক হিসেবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'দলদাস' হিসেবে কাজ করেছেন। বাম রাজনীতির ক্ষমতার অলিন্দে নজর রাখলে দেখা যায় যে জাতপাতের কোন বিশিষ্ট নেতারা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষমতার অলিন্দে কখনোই ছিলেন না। এছাড়াও বামদলগুলোর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা উচ্চবর্ণ ভদ্রলোকদের হাতেই কুক্ষিগত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আধিপত্য থাকলেও বামপন্থীরা সেইসব অঞ্চলে সেই সম্প্রদায়কে তাঁদের পার্টি কাজে সুকৌশলে ব্যবহার করছেন। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়কে, দক্ষিণবঙ্গে বাগদি নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এবং রাঢ়বঙ্গের বাগদি, বাউরি, মুচি, মেথর, মাল প্রভৃতি সম্প্রদায়কে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে জাতপাতের ভিত্তিতে তপশিলি সম্প্রদায়ের আধিপত্য থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির নেতারা সঙ্গবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করতে

সক্ষম হয়নি। অন্যতম কারণ হলো ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের তপশিলিদের দাবি-দাওয়া ছিল বিভিন্ন। ভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়নি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের আত্মপরিচিতি, ভাষা, সাহিত্য ও আলাদা রাজ্যের গঠনের দাবি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল দক্ষিণবঙ্গে নমঃশূদ্রদের কাছে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দক্ষিণবঙ্গের নমঃশূদ্রদের পুনর্বাসন ও নাগরিকত্ব দাবি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে তা ছিল অপ্রসঙ্গিক। এছাড়া বাগদি বাউরি, মুচি, মেথর ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থ-সামাজিক উন্নতির দাবি ছিল অগ্রগণ্য।

পশ্চিম বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ ছিল তপশিলি। উচ্চবর্ণীয় জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের বৈরিতার সম্পর্ক ছিল। গ্রামীণ স্তরে অভিন্ন কৃষক সম্প্রদায় হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ রাখা পার্টির কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছিল। বাম নেতাগণ ভূমিহীন কৃষক, ছোট কৃষক, মজুর ও বড় বড় কৃষকদের মধ্যে সমঝোতার নীতি প্রণয়ন করে ঐক্যবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরতেন। এভাবে পার্টি শ্রেণী দ্বন্দ্ব নিরসন করলেও জাতপাতের সমস্যা থেকেই যায়। বামপন্থীরা জাতপাত কে প্রথম শর্ত হিসেবে না দেখে শ্রেণীস্বার্থকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে জাতপাতকে ব্যবহার করেছেন। জাতপাতকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মন্ডল কমিশনের কাছে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের জাতপাতের কোন স্থান নেই। বামপন্থীদের মধ্যে নকশালপন্থীরা মন্ডল কমিশনের দাবিগুলোকে মেনে নিলেও কমিউনিস্টদের অন্যান্য দলগুলো তার বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে শহরে ভদ্রলোকরা এর তীব্র বিরোধিতা জানায়। তাঁদের যুক্তি জাতপাতের ভিত্তিতে নয় বরং বামপন্থীরা সর্বদাই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তপশিলিদের মাত্র ৩.৩ শতাংশ প্রথম মন্ত্রিসভার স্থান দিলেও দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতে তপশিলিদের আশা অনুরূপ ক্ষমতার রাজনীতিতে স্থান দেওয়া হয়নি। সম্প্রদায়ভিত্তিক তপশিলিদের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিযয়ে, বাগদি সম্প্রদায়ের কিছু নেতাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তপশিলি জাতিরা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল। এক্ষেত্রে বামদলগুলোর যুক্তি ছিল যে বাম দলগুলো জাতপাতের রাজনীতির ভিত্তিতে নেতৃত্ব প্রদান ও মন্ত্রিত্ব বন্টন করে নি।

শ্রেণীর ভিত্তিতেই মন্ত্রিত্ব বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রিসভার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার অলিন্দে গুরুত্ব সবসময়ই বেশি ছিল। অন্যদিকে পার্টির সাংগঠনিক দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শহরে ভদ্রলোক প্রতিনিধিরাই ক্ষমতায় ছিলেন। বিভিন্ন জেলাতে সংগঠনের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উচ্চবর্ণীয় রাজনীতিবিদরা সর্বদাই ক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং শ্রেণীভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরির কৌশলকে ব্যবহার করেছেন।

দীর্ঘ বাম শাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে এক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এই বাম সংস্কৃতিতে জাতপাত রাজনীতির ও আত্মপরিচিতি রাজনীতিকে দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। জাতপাত রাজনীতি ও আত্মপরিচিতি রাজনীতিকে বামেরা শ্রেণীর কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। বাম শাসনের অবসানের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত রাজনীতির উত্তরণ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটলেও বাম সংস্কৃতির অক্ষয় ঘটবে না। বাম সংস্কৃতির অক্ষয় না ঘটার ফলে জাতপাত ধর্ম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। বাম দলগুলো যে মতাদর্শকে সামনে রেখে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছেন সেই মতাদর্শ তাঁদের ক্ষমতার অবসর-পরবর্তী সময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে থেকে যাবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত জাতপাত রাজনীতির উত্তরণ ঘটনার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিন্তু বাম পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জাতপাতের বিভিন্ন সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মতুয়া মহাসংঘ জাতপাতের সংগঠন থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক উত্তরণ ঘাটাল। বড়মা বীণাপাণি দেবী নেতৃত্বে মতুয়ারা তাঁদের নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতে সমর্থন জানান। বড়মা বীণাপাণি দেবীর নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন এর আন্দোলন ধীরে ধীরে বাম বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ২০১১ সালের নির্বাচনে তপশিলিরা বিশেষ করে নমঃশূদ্র মতুয়ারা একচ্ছত্র ভাবে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে পর্যবসিত হয় । অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি ও আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তারা মনে করেন যে বহিরাগত আগমনের ফলে তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি অক্ষয় হয়েছে। এর ফলে তারা

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অবহেলিত হয়েছেন। রাজবংশীদের এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বাম বিরোধী উচ্চবর্ণীয় নেতৃত্বে বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনকালে জাতপাত ও শ্রেণী রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাম দলগুলো তাঁদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জাতপাত শ্রেণীকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। বাম শাসনকালে ক্ষমতার অলিন্দে ও বাম সংগঠনের মধ্যে জাতপাতের নেতারা উচ্চ স্থান দখল করতে পারেনি। বাম পরবর্তী সময়ে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার নেতৃত্বাধীন সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ, মতুয়া মহাসঙ্ঘের রাজনীতি, বাগদি, বাউরি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া জাতপাত রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। কাজেই বলা যায়, বাম পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহুমুখী জাতপাত রাজনীতির প্রভাব পরলক্ষিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

সংকেতাবলি (Abbreviations)

ABSCF	All Bengal Scheduled Caste Federation	অল বেঙ্গল সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন।
AIADMK	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	অল ইণ্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম বা এ.আই.এ.ডি.এম.কে.।
AISCF	All India Scheduled Caste Federation	অল ইন্ডিয়া সিডিউল্ড কাস্ট ফেডেরেশন বা এ. আই. এস. সি. এফ.।
BBC	Biplabi Bangla Congress	বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস।
B. CONG	Bangla Congress	বাংলা কংগ্রেস।
BJP	Bharatiya Janata Party	ভারতীয় জনতা দল।
BLA	Bengal Legislative Assembly	বাংলার বিধানসভা।
BSCP	Bengal Scheduled Caste Party	বেঙ্গল সিডিউল্ড কাস্ট পার্টি
CERD	Committee on Elimination of Racial Discrimination’	কমিটি অন এলিমিনেশন অফ্ রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন।
CONG	Indian National Congress	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।
CONG (O)	Congress (Organisation)	কংগ্রেস (অর্গানাইজেশন)।
CONG (R)	Congress (Ruling/Requisition)	কংগ্রেস (রিকুইজিশন)।
CPI	Communist Party of India	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সি.পি.আই.।
CPI (M)	Communist Party of India (Marxist)	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) বা সি. পি. আই. (এম)।
DK	Dravidar Kazhagam	দ্রাবিড় কাজাঘাম।
DMK	Dravida Munnetra Kazhagam	দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম।

FB	Forward Bloc	ফরওয়ার্ড ব্লক।
HM	Hindu Mahasabha	হিন্দু মহাসভা।
IND	Independent	স্বাধীন।
ISCP	Independent Scheduled Caste Party	ইন্ডেপেন্ডেন্ট সিডিউল্ড কাস্ট পার্টি।
J S	Jana Sangha	জনসঙ্ঘ।
KMPP	Krishak Mazdoor Proja Party	কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি।
KP	Krisak Praja Party	কৃষকপ্রজা পার্টি।
L. DAL	Lok Dal	লোক দল।
LF	Left Front	বামফ্রন্ট।
MFB	Marxist Forward Bloc	এম.এফ. বি.।
ML	All India Muslim League	অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ বা মুসলিম লীগ।
MLA	Member of Legislative Assembly	বিধায়ক।
MLC	Memebr of Legislative Council	বিধান পরিষদের সদস্য।
PKUP	Poundra Kshatriya Unnoyan Parishad	পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ।
PSP	Praja Socialist Party	প্রজা সোসালিস্ট পার্টি বা পি.এস. পি.।
PULF	Peoples' United Left Front.	পিপলস্ ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট।
RSP	Revolutionary Socialist Party	আর. এস. পি. ।
SC	Scheduled Caste	সিডিউল্ড কাস্ট বা তপশিলি জাতি।
SSP	Somyukta Socialist Party	এস.এস.পি.।
ST	Scheduled Tribe	সিডিউল্ড ট্রাইব বা তপশিলি উপজাতি।

SUCI	Socialist Unity Centre of India	এস.ইউ. সি. আই.।
UF	United Front	যুক্তফ্রন্ট।
ULF	United Leftist Front.	সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট।

পারিভাষিক শব্দাবলি (Glossary)

অন্ত্যজ(Outcaste)	সামাজিক মর্যাদাহীন ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণীয় জাতি যাদের অস্পৃশ্য, অধম সংকর , অসৎশূদ্র, ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে।
আদমশুমারি(Census.)	জনগণনা/ লোকগণনা।
কৃষ্টিকরণ	সংস্কার প্রক্রিয়া, তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের থেকে সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রক্রিয়া, Sanskritization Process.
জমিদার	জমির মালিক বা ভূস্বামী।
জাতপাত	জাতি ও জাতপাত জনিত প্রক্রিয়াকে জাতপাত শব্দের মধ্য দিয়ে ব্যাখা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্ণীয় তপশিলিরা জন্মগত ও জাত ভিত্তিক কারণে সমাজে যে অবমাননার স্বীকার হন, তাকেই জাতপাত জনিত বৈষম্য বলা হয়। জাতপাতের মধ্যে থাকে জাতি ও জাতপাত জনিত জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনা।
জাতি-রাজনীতি	জাতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।
জাতীয় রাজনীতি	ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন।
জোতদার	কৃষিজমির মালিক বা সম্পন্ন স্বাধীন কৃষক।
তপশিলি জাতি	১৯৩৬ এর The Government of India (Scheduled Caste) Order 1936 অনুযায়ী গৃহীত ও পরবর্তীকালে সংশোধিত বিভিন্ন আইন ও অধিনিয়ম অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কতগুলো জাতি যাদেরকে তপশিলি জাতি (তপশিলি জাতি/ তপসিলি জাতি) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নমঃশূদ্র	বাংলার একটি তপশিলি জাতি।
নিম্নবর্ণীয়	ঔপনিবেশিক ভারতে সরকার চিহ্নিত অবনমিত জাতি (Depressed Caste) যারা পরবর্তীকালে যা তপশিলি জাতি নামে চিহ্নিত হয়েছে।
পৌণ্ড্র	পশ্চিমবঙ্গের একটি তপশিলি জাতি। এঁরা মূলত দক্ষিণবঙ্গের নদীবিধৌত অঞ্চলে বসবাস করেন।
বর্গাদার	ভাগচাষি। কোন ব্যক্তি যখন সম্পন্ন কৃষকের থেকে জমি ভাগ বা আধি নিয়ে চাষ করেন, তাকে ভাগচাষি বলা হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে মাঝারি ও ছোট কৃষকরা অনেকসময় অর্থনৈতিক দৈনতার কারণে জমি আধি বা ভাগচাষে দিতে বাধ্য হন।
বাগদি	পশ্চিমবঙ্গের একটি তপশিলি জাতি। রাঢ় ও মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত।
বাউরি	পশ্চিমবঙ্গের একটি তপশিলি জাতি। রাঢ়বঙ্গের জেলাগুলিতে এঁরা বসবাস করেন।
মহাসঙ্ঘ	পৌণ্ড্র জাতির পরিচিতি সত্তা বা সাংস্কৃতিক জাগরণে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।
মালো বা ঝালোমালো	বাংলার একটি তপশিলি জাতি।
মূলনিবাসী	ভূমিপুত্র। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক সংগঠন নিম্নবর্ণীয় তপশিলি জাতিদেরকে মূলনিবাসী বলে সংজ্ঞায়িত করছেন।
রাজবংশী	বাংলার একটি তপশিলি জাতি।
লাটদার	ব্রিটিশ শাসনাকালে লাট বলতে জমিদারির এমন অংশকে বোঝাতো যা বকেয়া খাজানার দায়ে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য নিলামে বেচে দিতেন। লাটের নিলাম ক্রেতাকে লাটদার বা লাট খরিদ্দার বলা হতো। বাংলার ২৪ পরগনা, খুলনা ও যশোহর অঞ্চলে লাটদারের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

তাঁরা ছিলেন মূলত নিম্নশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী।

শুঁড়ি	বাংলার একটি তপশিলি জাতি।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান

Government Publication

Beverley, H, *Report on the Census of Bengal 1872*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872.

Census of India, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.

Government of West Bengal, *Report on the Sample Survey for Estimating the Socio-Economic Characteristics of displaces prisons migrating from Eastern Pakistan to the State of West Bengal,* State Statistical Bureau, Calcutta, 1951.

---------, *Short Note on Scheduled Castes of West Bengal*, Cultural Research Institute, Backward Classes Welfare Department, Kolkata, 2005.

Hunter, W.W., *Statistical Account of Bengal, 20 vols.* , reprint ed., D.K. Publishing House, New Delhi, 1974.

----------, *A Statistical Account of the District of 24-Parganas Vol. 1.*, originally published in 1875 London, Trubner & Co, reprint edition, Government of West Bengal, Calcutta, 1988.

Latiful Bari, K.G.M. (ed.), *Khulna district gazetteer*, Bangladesh Govt. Press, Dacca, 1779.

Martin, Montgomery, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, 5 Vols. (1838),* reprint edn., Cosmo Publications, Delhi, 1976.

Mitra, A.K, *The Tribes and Castes of West Bengal*, West Bengal Government Press, Alipore, 1953.

O'Malley, L. S. S., *Bengal District Gazetteers 24-Parganas*, Basumati Corporation Limited, Calcutta, 1998.

----------, *Indian Caste Customs*, 1932, reprint edn., CUP, London, 2013.

Risley, H. H., *The Tribes and Castes of Bengal*, *2 Vols*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891.

----------, *The People of India*, Thacker Spink and Co., Calcutta & Simla, 1915.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendments) Act, *1956*.

Tailor, James, *A sketch of the Topography and statistics of Dacca* Calcutta, G.H. Huttman, Military Orphan Press, 1840.

Wise, James, *Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal,* Not Published, London, Harrison and Sons, 1883.

Zaidi, A.M. & Zaidi, S.G.(ed), *The Encyclopedia of the Indian National Congress, The Battle forSwaraj, Volume Ten, 1930-1935, S. Chand & Company Ltd, New Delhi, 1980.*

Party Documents

Basavpunnaiah, M Salkia Plenum Decisions and after, 1979

Basu, Jyoti and Sen, Niranjan, On Some Questions Concerning the Ideological Controversy within the International Communist Movement, 1964.

Basu, Jyoti, A Letter to the Secretary of Kolkata District, 9 October 1963.

Bandyapadhyay, D, Land Reforms Commissioner, 'Land Reforms in West Bengal', Information and Cultural Affairs Department, Government of West Bengal, Calcutta, March1980.

Circular of the Provincial Committee (CPI) No 8/52 (13.5.52).

Communiqué of the All India Coordination Committee of Communist Revolutionaries, 22 April, 1969.

Contribution to Ideological Debate, 1964.

CPIM's Central Committee Document on Mass Organisation, April 1981.

CPIM's Central Committee Review Report on Kisan Front, 1993.

Draft Resolution 9th West Bengal State Conference, 17-22 January, 1961.

Election Manifesto of the CPI, 1952.

Election Manifesto of the CPIM, November, 1967.

Election Manifesto of the CPIM, November, 1977.

Ghosh, Ajay, A Letter to the Members, 7 July, 1955.

Government of West Bengal, Human Development Report 2004.

Government of West Bengal, Development and Planning Department, West Bengal

Government of West Bengal, Department of Panchayats and Rural Development, Informations on West Bengal Panchayat, Boys Bengal, August, Kolkata, 2010.

Letter to the Members, West Bengal Provincial Committee Bracket (CPI), 29 November, 1954.

Mukherji, Nirman and Bandyapayay, Debabrata, 'New Horizon's for West Bengal's Panchayat', Department of Panchayats, Government of West Bengal, Calcutta, 1993.

Muzaffar Ahmed Smriti Pathagar, Calcutta, (i) Pamphlets of Bengal Provincial Krishak Sabha and Communist Party of India, 1936-47.

Namboodiripad, EMS, Party Line on Current Tactics, 1985.

On the Agrarian Question in India, New Age, Bombay, 1949.
On Ideological Controversy in the International Communist Movement, Regulation of the National Council, CPI, October, 1960.
On the Present Policy and Tasks of the CPI, January, 1948.
Open Letter of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union to all Party.
Organisations and to All Communists of the Sino-Soviet Union, July 14, 1963.
Organisational Report of the State Conference of CPI Provincial Committee, 28-31 January, 1958.
Organisational Report, 8th State Conference of the CPI, 8-12 April, 1959.
Our Tasks on Party Organisation, CPIM, Calcutta, 1968.
Panchayats and Community Development, Government of West Bengal, Calcutta, 1980.
Party Programme of the CPIM, 1964.
Party Programme, Seventh Congress, 1964.
Political Programme of the CPI, 1948.
Political Thesis of the Second Congress, 28 February- 6 March, 1948.
Political Resolution of the 3rd Congress of the CPI, Madurai, December-January, 1952.
Political Resolution of the 4th Congress of the CPI, Palghat, April, 1956.
Political Resolution of the Extraordinary Congress of the CPI, April, 1958.
Political Resolution of the 6th Congress of the CPI, Vijayawada, April, 1961.
Political Resolution Adopted by National Council of the CPI, Delhi, October 1963.
Political Resolution Adopted by National Council of the CPI, Hyderabad, August, 1962.
Political resolution adopted of the 14 congress of the CPIM, Madras, January, 1992.
Political Resolution of the 15th Congress of the CPIM, Chandigarh, April, 1995.
Political Resolution of the 16th Congress of the CPIM, Calcutta, 1998.
Political Resolution of the 17th Congress of the CPIM, Hyderabad, March, 2002.
Political Resolution of the 18th Congress of the CPIM, New Delhi, April, 2005.
Political Resolution of the 19th Congress of the CPM, Coimbatore, March, 2008.
Political Thesis of 2nd Congress of the CPI, March, 1948.
Proceedings of the Bengal Legislative Council, 2001, Vol, 117. No. 1

‘Panchayats in West Bengal’, Directorate of Panchayats, Government of West Bengal, Calcutta, 1981
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 30, 1957.
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 44, 1967.
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 50, 1970.
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 54, 1973.
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 69, 1978.
Proceedings of West Bengal Legislative Assembly, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta, Vol. 103, 1994.
Police Report on 9th State Conference of the CPI, 17-21 January, 1961.
Political and Technical Line of the CPI (M), 10th Party Congress, 1978.
Political Organisational Report, Adopted at the Seventh Congress of the CPI, Kolkata, November, 1964.
Raajneeti Press Tab a Collection of Political Resolutions, 7th to 18th Party Congress of CPIM, National Book Agency, Calcutta, 2008.
Record of the Discussion at the Meeting of the National Development Council 29 April, 1986 <WWW.teIndia.nic>>
Report of Salkia Plenum, CPIM, December, 1978.
Report of Secret Meeting up left CPI, 5 June, 1966.
Report of the Debate on Ideological Resolution of the CPIM, Burdwan, April, 1966.
Report of the 8th West Bengal State Conference, 8-12 April, 1959.
Report on Unity Talk, 1964.
Resolution Adopted by Central Committee, CPIM, June, 1966.
Resolution of the First Party Congress of the CPI, 6 June, 1943.
Resolution of the CPI Adopted at the Extraordinary Party Congress at Amritsar from 3rd April-6th April, 1958.
Resolution, Dinali Convention, 7- 11 July, 1964.
Review of the Work on Kitchen Toned and Future Tasks, Central Committee of the CPIM, 1993.

Sarkar,B.K and Prasanna, K.R, 'What Happened to the Vested Land?', Directorate of Land Records and Surveys, Government of West Bengal, Calcutta, March 1976.

'Samiksha Astham Lok Sabha Nirbachan', Bardwan District Committee, CPI(M), 28th February 1985.

Stop this Resign of Terror in West Bengal, CITU, West Bengal Committee, Kolkata, 1971.

Secret Letter of Left-CPI (statement of G34), 17 April, 1966.

Self Criticism, Bengal Provincial Committee 1950.

Some Documents from the Indian Political Intelligence Siri in the India Office Records Relating to the London Years of Jyoti Basu, Misc no. five, London, 30. 3. 39.

Soviet Split Document Archives. <www.marxists.org>

Statement on Industrial Policy of 1978, Government of West Bengal, 1978.

Strategies and Tactics in the Struggle for Peoples Democratic Revolution in India, 4 June, 1949.

Strategy and Tactics in the Struggle for People's Democratic Revolution in India, December, 1948.

The Report Attribute the Higher Incidence of Land Holding in the Marginal Class to Land Reforms and Mounting Demographic Pressures on Land Government of India, Planning Commission, New Delhi, 2010, West Bengal Development Report, 2010

The Working of Panchayat System in West Bengal', Department of The Political Organisational Report, CPIM, 1982

WB IB file no.374ZX 23, subject: Niranjan Sengupta, WBSA

West Bengal Land Reforms (Bargadars) Rule, 1956.

'West Bengal Development Report, Department of Development and Planning, Government of West Bengal, Calcutta, 2004.

Selected Speeches in West Bengal Assembly

Assembly Speech 5 February, 1970.

Assembly Speech 23 February, 1970.

Assembly Speech 26 February, 1970.

Assembly Speech 7 May, 1971.

Assembly Speech 7 May, 1971.

Assembly Speech 11 May, 1971.

Assembly Speech 15 May, 1971.
Assembly Speech 3 March, 1978.
Assembly Speech 25 March, 1978.
Assembly Speech 20 November, 1978.
Assembly Speech 9 February, 1979.
Assembly Speech 6 March, 1980.
Assembly Speech 12 March, 1981.
Assembly Speech 20 March, 1981.
Assembly Speech 23 February, 1981,
Assembly Speech 6 March, 1981,
Assembly Speech 4 September, 1982.
Assembly Speech 8 September, 1982.
Assembly Speech 14 September, 1982.
Assembly Speech 18 March, 1983.
Assembly Speech 17 March, 1983.
Assembly Speech 22 March, 1983.
Assembly Speech 11 September, 1996.
Assembly Speech 15 September, 1996.
Government of West Bengal, Development and Planning Department, West Bengal Human Development Report 2004, Kolkata Government of West Bengal, May 2004,
India Kisan Sabha, *Proceedings and Regulation adopted by the 24th Conference*, Midnapur, *1982.*
West Bengal Pradeshik Kisan Sabha, Pandua, Hooghly 1982,
West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report of the the first session (November -January), Vol.1,No.1, Kolkata, West Bengal Legislative Assembly Library.
*West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report of the the first session (November -January), Vol.1, No.*1, Kolkata, West Bengal Legislative Assembly Library.
West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Report off the first session (November -January) 1947-48,vol.1,No.2, WBLAL
The West Bengal Legislative Assembly Proceedings official Reports of the first session (November-January) 1947-48, Vol. LXXVIII, NO.1

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা, ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০১৬।

চিত্ত মন্ডল, পিয়ালী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০১৮।

দিগেন রায়, রাজার মাঠ, কোচবিহার, ২০১৭।

ধীরেন বাগদি, রবীন্দ্রনগর, হুগলি, ২০১৯।

প্রফুল্ল দাস, চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০১৮।

ভোলানাথ বাগদি, খেয়াদহ, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০১৮।

মিন্টু বর্মণ, মাথাভাঙা, কোচবিহার, ২০১৮।

শশধর সরকার, দত্তপাড়া, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০২২।

সহদেব মাঝি, (পরিবর্তিত নাম), হুগলি, ২০১৯।

সুশোভন রায় (পরিবর্তিত নাম), কলকাতা, ২০১৭।

পত্রপত্রিকা

ইংরেজি

Amrita Bazaar Patrika, 17 April, 1946

People's Democracy, 10 July, 1965.

People's Democracy, 7 April, 1968.

People's Democracy, April, 2005.

People's Democracy, 19 January, 2010.

People's Democracy, 24 July, 1965.

The Statesman, 10 May, 1964.

The Statesman, 21 May, 1966.

The Statesman, 19 August, 1966.

The Statesman, 27 August, 1954.

Times of India, 29 March, 2007.

Times of India, 26 November, 2008.

Times of India, 18 January, 2010.

Times of India, 20 January, 2010.

The Telegraph, 5 August, 2003.

The Telegraph, 18 January, 2010.

The Telegraph, 26 January, 2010.

The Telegraph, 1 February, 2016.

বাংলা

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ জুলাই, ১৯৫৩।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ আগস্ট, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ ই আগস্ট, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ আগস্ট, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ শে আগস্ট, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ ই মার্চ, ২০০৭।

আজকাল দৈনিক পত্রিকা, ৬ এপ্রিল, ২০০৭।

আজকাল, ২৪ এপ্রিল, ২০০৭।

এই সময়, ২৬ মার্চ, ২০১১।

*দৈনিক বসুমতী*১৪ জানুয়ারী, ১৯৫৩।

দৈনিক বসুমতী, ৪ জুলাই, ১৯৫৩।

দৈনিক বসুমতী, ৫ জুলাই, ১৯৫৩।

দৈনিক বসুমতী, ৯ জুলাই, ১৯৫৩।

দৈনিক বসুমতী, ২৩ জুলাই ১৯৫৩।

দৈনিক বসুমতী, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৫৪।

দৈনিক বসুমতী, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৫৬।

দৈনিক বসুমতী, ২১ এপ্রিল, ১৯৫৬।

দৈনিক বসুমতী, ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৫।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৯ মে, ১৯৫১।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২।

স্বাধীন পত্রিকা, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ১৯৫৩।

স্বাধীন পত্রিকা, ২০ জানুয়ারী, ১৯৫৪।

স্বাধীন *পত্রিকা,* ২১ জানুয়ারী, ১৯৫৪।

স্বাধীন পত্রিকা, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৫৪।

স্বাধীন পত্রিকা, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪।

স্বাধীন পত্রিকা, ১০ জুন, ১৯৫৯।

স্বাধীন পত্রিকা, ১২ জুন, ১৯৫৯।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৬ জুন, ১৯৫৯।

স্বাধীন পত্রিকা, ১৫ আগস্ট, ১৯৫৯।

স্বাধীন পত্রিকা, ২৫ আগস্ট, ১৯৫৯।

স্বাধীন পত্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

গণশক্তি পত্রিকা, ১৬ মে, ১৯৬৪।

গণশক্তি পত্রিকা, ১৩ জুলাই, ১৯৬৫।

গণশক্তি পত্রিকা, ২৮ জুলাই, ১৯৬৫।

গণশক্তি পত্রিকা, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

গণশক্তি পত্রিকা, ৭ জানুয়ারী, ১৯৭৮।

গণশক্তি পত্রিকা, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৮।

গণশক্তি পত্রিকা, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

গণশক্তি পত্রিকা, ১৫ জুলাই, ১৯৯১।

গণশক্তি পত্রিকা, ৫ আগস্ট, ১৯৯১।

গণশক্তি পত্রিকা, ২০ আগস্ট, ১৯৯৭।

গণশক্তি পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারী, ২০১০।

গণশক্তি পত্রিকা, ৭ জুলাই, ২০১৩।

বর্তমান পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

যুগান্তর পত্রিকা, ১ মে, ১৯৬৯।

সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারী, ২০১০।

সহায়ক উপাদান

ইংরেজি

Arora, N. D., Awasthy, S. S., *Political Theory and Political Thought*, Har Anand Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2007.

Acharya, Poromesh, Panchayats and the Lake Politics in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.28, No.22*, May 1993.

Barman, Rup Kumar, *Caste Identity Formation, Mobility and Elite Leadership,* in B.K. Saha (ed), *Wealth and Welfare*, Academic Enterprise, Kolkata, 2005, পৃ.পৃ.৫৩-৬৪।

----------, *From Tribalism to State, Reflections on the emergence of the Koch Kingdom*, Abhijeet Publications, Delhi, 2007.

---------, *Contested Regionalism, A New Look on History, Cultural Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam*, Abhijeet Publications, Delhi, 2007.

----------, *Fisheries and Fishermen, A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Postcolonial West Bengal*, Abhijeet Publications, Delhi, 2008.

---------, Caste and Class Awareness among the Dalits, *Voice of Dalits, Vol.1, No 1(Jan-June 2008).*

---------, Partition of Bengal And Struggle For Existence of The Scheduled Castes, Impact of The Partition (1947) on the Rajbanshis of North Bengal, *Voice of Dalit, Volume 2 Issue 2 (July-Dec 2009),* পৃ.পৃ. ১৪১-১৬৩।

---------, Caste Violence in India, *Voice of Dalit, Vol. 3, No 2 (*July-December, 2010).

----------, *Partition of India and its Impact on the Scheduled Castes of Bengal*, New Abhijeet Publication, Delhi, 2012.

----------,From Pods to Poundra, A Study on the Poundra Kshatriya Movement for Social Justice 1891-1956,*Voice of Dalit, Vol-7, No.1* (January-June, 2014),পৃ.পৃ. ১২১-১৩৭।

--------,Changing Identities of the Scheduled Castes in Colonial and Post-Colonial Bengalpublished in Roy,Sanjay K. and Mukhopadhyay, Rajatsubhra (eds), *Ethnicity in the East and North-East India,* Gyan Publishing House, New Delhi, 2015,পৃ.পৃ. ৯৫-১১৪।

------------,From Quest for Justice to Dalit Identity, A New Look on the Crisis identity of The Scheduled Castes of West Bengal, in *Karatoya, North Bengal University Journal of History, Vol.8,* Darjeeling, University of North Bengal, March 2015, পৃ.পৃ. ৮৩-৯৮।

-----------,Yes! The Scheduled Castes Can write, Reflections on the Creative and Assertive Writings of the Scheduled castes of Colonial Bengal, *Contemporary Voice of Dalit, Volume 8, No. 1* (May 2016), পৃ.পৃ. ৪৭-৬১।

-----------,From Political Bargaining to Electoral Slavery, Reflections on the Political Impact of Partition of India on the Scheduled Castes of Bengal, in Bhaumik,Mahuya and Chattopadhyay,Anjona, *Partition, Diverse Dimensions,* Sarat Impressions Pvt.Ltd., Kolkata, 2016, পৃ.পৃ. ৩৩-৬০।

Bandopadhyay, Debabrata, Not a Gramscian Pantomime, Economic and Political Weekly, Vol. 32, No.12, March 22, 1997, পৃ. ৫৮১-৫৮২।

Bandyopadhyay, Sarbani, Another history, Bhadralok response to Dalit Political Assertion in Colonial Bengal in Uday Chandra, Geir Heierstad and Kenneth Bo Nielsen (eds), *The Politics of Caste in West Bengal,* New York, Routledge, 2016, পৃ.পৃ. ৩৫-৫৯।

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namusudras of Bengal 1872-1947*, Curzon Press, Surrey,1997.

----------,*Changing Borders, Shifting Loyalties, Religion, Caste and The Partition of The Bengal in 1947*, Asian Studies Institute, Victoria University of Wellington, 1998.

----------,*Caste, Culture and Hegemony, Social Domination in Colonial Bengal*, Sage Publications, New Delhi, 2004.

----------,Partition and Ruptures in Identity in West Bengal, Asian Studies Review, Vol.33, No.4, November 2009.

Banerjee, Dilip, *Election Recorder*, Calcutta, Book Front Publication Forum, 1990.

Banerjee, Sumanta, Marxism and the Indian Left: From 'Interpreting' India to 'Changing' it Purbalok Publication, Kolkata, First edition, 1 January 2012.

Bardhan, Pranab, Mitra, Sandip, Mookherjee, Dilip and Sarkar, Abhirup, Local Democracy and Clientelisam: Implications for Political Stability in rural West Bengal, Economic and Political Weekly, Vol. 49, No. 9, February 28 2009, West Bengal পৃ. পৃ. ৪৬-৫৮।

Basu, Raj Sekhar, 'Reinterpreting Dalit Movements in India' in Indian Historical Review 2006.

Basu, Swaraj, *Dynamics of Caste Movement*, *The Rajbanshis of North Bengal, A study of Caste Movement 1910-1947*, Monohar, New Delhi, 2002.

Bayly, Susan, *Caste, Society and Politics in India, From the Eighteenth Century to Modern Age,* Cambridge University Press, 1999.

Begman, Theodor, *Agrarian Reform in India*, Agricole Publishing Academy, New Delhi, 1984.

Bell, Wall, *World Development Report 1990*, Oxford University Press, 1990.

Beteille, Andre, *Caste, Class and Power, Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village*, University of California Press, 1965.

---------,*Castes, Old and New, Essays in Social Structure and Social Stratification*, Asia Publishing House, 1969.

Bhattacharya, Dwaipayan, *Government as Practice: Democratic Left in in a Transforming India*, Cambridge University Press, 2017.

Bhattacharya, Jogendranath, *The Hindu Castes and Sects, an exposition of the origin of the Hindu caste system and the bearing of the sects towards each other and towards other religious systems*, Firma KLM, Calcutta, 1968.

Bhattacharyya, Sukanta, Caste, Class and Politics in West Bengal, Case Study of a Village in Burdwan in *Economic and Political Weekly*, January 18, 2013, পৃ.পৃ. ২৪২-২৪৬।

Bose, Nirmal Kumar, *The Hindu Method of Tribal Absorption, Science and Culture, Vol. VII, .No. 4*, 1941.

Chandra, N.K, Agricultural Workers in Burdwan Guha, Ranajit ed. *Subaltern Studies, Vol. II*, OUP, Delhi, 1984.

Chakraborty, Prafulla Kumar, *The Marginal Men*, Glory Printers, Calcutta, 1960.

Chakraborty, Saroj, with Dr BC Roy and others Chief Ministers, Calcutta, 1974.

Chakravorty Spivak, Gayatri, *Subaltern Studies, Deconstructing Historiography*, in Guha, Ranajit (ed), *Subalterns Studies IV, Writing on South Asian History and Society,* Oxford University Press, New Delhi, 1985, পৃ.পৃ.৩৩৮-৩৬৩।

------------, *Can a Subaltern Speak?* In C. Nelson and L. Grossbir (eds), *Marxism and the Interpretation of Culture*, Macmillan Education, Basingstone, 1988, পৃ.পৃ.২৭১-৩১৩।

Chandra, Bipan, Mukherjee, Aditya, Mukherjee, Mridula, *India after Independence-1947-2000*, Penguin Books, New Delhi, 1999.

Chandra, Uday, Heierstad, Geir and Nielsen, Kenneth Bo (eds), *The Politics of Caste in West Bengal,* Routledge, New York, 2016.

Chatterjee, Biswajit and Chatterjee, Debi (eds), *Dalit Lives and Dalit Vision in Eastern India,* Centre for A Rural Resource and Centre for Ambedkar Studies of Jadavpur University, Kolkata, 2007.

Chatterjee, Debi, *Ideas and Movements in Caste in India, Ancient to Modern Times,* Abhijeet Publications, Delhi, 2010.

----------, Dalit Situation in India Since the 1990's, An Examination of Certain Issues and trends, *Socialist Perspective, Vol. 33, No. 1.2*, June-September, 2005.

Chatterji, Joya, *Bengal Divided, Hindu Communalism and Partitions 1932-1947,* Cambridge University Press, 1995, First paperback Indian edition, New Delhi Foundation Books, 1996.

---------, *The Spoils of Partition, Bengal and India 1947-1967,* Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Chatterjee, Partha, *Bengal 1920-1947: The Land Question,* KP Bagchi and Company, Calcutta, 1984.

---------, *The Present History of West Bengal, Essays in Political Criticism,* Oxford University Press, Delhi, 1997.

-----------,*Caste and Subaltern Consciousness,* in Guha, Ranajit (ed), *Subalterns Studies VI, Writing on South Asian History and Society*, Oxford University Press, Delhi, 1989, পৃ.পৃ.১৬৯-২০৯।

Chattopadhyay, Gautam, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle 1862-1947*, Indian Historical Studies, Delhi, 1984.

Dangle, Arjun (ed), *Poisoned Bread*, Orient Longman, New Delhi, 1992.

Dasgupta, Biplob, Agriculture Labour under Colonial and Semicollo Capitalist and Capitalist Conditions: I study of West Bengal, Economic and Political Weekly, Review of Agriculture, vol.19, No.38, September 1984.

Das Gupta, Satadal, *Caste Kinship and Community: Social System of Bengal Caste*, Universities Press, Hyderabad, 1986.

Desai, A.R., *Social Background of Indian Nationalism,* Popular Prakashan, Bombay, 1948.

-------------, *Rural Sociology in India*, Bombay, 1969.

Dirks, Nicholas B, *Castes of Mind, Colonialism and the Making of Modern India,* Permanent Black, Delhi, 2001.

Dutt, Nrlmal Kumar, *Origin and Growth of Caste in India (combined volume)*, Firma KLM Mukhopadhyay, Pvt. Ltd., Calcutta, 1969.

Dumont, Louis, *Homo Hierachicus,* Originally Published in 1972, reprint edn., University of Chikago Press, 1974.

Gehlot, N. S., *Current Trends in Indian Politics*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1998.

Ghosh, D.K. and Ghosh, Sukla, *Legends of Origin of the Castes and Tribes of Eastern India*, Firm KLM, Pvt. Ltd., Calcutta, 2000.

Ghurye, G.S., *Caste and Race in India*, London, Kegan Paul, 1932, reprint edition; Popular Prakashan, Mumbai, 1969.

Gramsci, Antonio, *Selection from the Prision Notebooks*, International Publishers, New York, 1989.

Guha, Ayan, 'Marxist Discourse of Caste in India: A Critique', *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 3, no. 4, 2014, পৃ.পৃ.৩৮-৪১।

----------, "West Bengal at Crossroads: An Insight into the Emerging Political Dynamics." *Mainstream Weekly* 53, no. 14, 2015.

----------, "Caste in the Politics of Post-Colonial West Bengal: A Study in Retrospect." *International Research Journal of Social Sciences* 3, no. 6, 2014, পৃ.পৃ. ৫৮-৬১।

----------, "Caste, Class, Hierarchy and Power; Deconstructing Mainstream Discourses." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 4, no. 7 , 2014, পৃ.পৃ.১৮২-১৯১।

----------, "West Bengal Elections: Unchanged Amidst Change." *Economic and Political Weekly* 51, no. 41, 2016, পৃ.পৃ.৬৯-৭১।

----------, "Caste Factor in West Bengal Elections." *Mainstream Weekly* 56, no. 33, 2016.

----------, "Why Caste Politics Failed in Bengal." *Frontier* 49, no. 2 , 2016.

Guha, Ayan and Neha Chauhan. "Debate, Discourse and Dilemma: Putting Dr. Subhash Kashinath Mahajan vs State of Maharashtra in Context." *Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 51, no. 3, 2018, পৃ.পৃ. ৩৮১-৩৯১।

Guha, Ayan. "Caste and Politics in West Bengal: Traditional Limitations and Contemporary Developments." *Contemporary Voice of Dalit* 9, no. 1, 2017, পৃ.পৃ. ২৭-৩৬।

----------, "Recent Debate on Landmark Anti-Caste Legislation in India." *International Journal of Discrimination and the Law* 19, no. 1, 2019, পৃ.পৃ. ৪৮-৬৩।

----------, "Caste Politics, Secular Idiom," *Indian Express*, May 3, 2019.

----------, "Polarization Plus Anti-incumbency: A Full Scale View of BJP's Rise in Bengal." *Mainstream Weekly* 57, no. 34, 2019.

----------, "Book Review: Caste, Entrepreneurship and the Illusions of Tradition: Branding the Potters of Kolkata." *Contemporary South Asia* 28, no. 4, 2020, পৃ.পৃ. ৫৩০-৫৩১।

----------, "Caste Question in West Bengal Politics: Rising Relevance of Continuing Inconsequentiality?" *Contemporary South Asia* 29, no. 3, 2021, পৃ.পৃ. ৩৭৬-৪০০।

----------, "Beyond Conspiracy and Coordinated Ascendancy: Revisiting Caste Question in West Bengal under the Left Front Rule 1977–2011." *Contemporary Voice of Dalit* 13, no. 1, 2021, পৃ.পৃ. ৫০-৬৫।

----------, "Book Review: Jyotiprasad Chatterjee and Suprio Basu. Left Front and After: Understanding the Dynamics of Poriborton in West Bengal and Suman Nath. People-Party-Policy Interplay in India: Micro-Dynamics of Everyday Politics in West Bengal, c. 2008–2016." *Studies in Indian Politics* 9, no. 1, 2021, পৃ.পৃ. ১৩৯-৪১।

----------, "Book Review: Deep Halder, Blood Island: An Oral History of the Marichjhapi Massacre." *South Asia Research* 42, no. 1, 2022, পৃ.পৃ. ১৪১-৪৫।

----------, *The Curious Trajectory of Caste in West Bengal Politics: Chronicling Continuity and Change.* Leiden/Boston: Brill, 2022.

Guha, B. S., *The Racial Affinities of The People of India*, Manager of Publications, Delhi, 1935.

Guha, Sumit, *Beyond Caste, Identity and Power in South Asia, Past and Present*, Leiden, Brill's Indological Library, 2013.

Gupta, Dipanakar (ed), *Social Stratification*, OUP, New Delhi, 1992.

Hanlon, Rosalind, *Caste Conflict and Ideology*, Cambridge, 1985.

Hutton, J. H., Caste in India: Its Nature, function and Origin, Oxford University Press, London, 1946.

Ilaiah, Kancha, *Why I Am Not a Hindu, A Sudra Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy,* Samya, Kolkata, 1996.

---------, *Baffalo Nationalsim, A Critique of Spiritual Fascism,* Samy, Kolkata, 2004.

Jaffrelot, Christophe, *India's Silent Revolution, Rise of the Low Castes in North India Politics*, Permanent Black, Delhi, 2003.

Joshi, Sanjay (ed.), *The Middle Class in Colonial India*, OUP, 2010.

Kohli, Atul, *The State and Property in India: the Politics of Reforms*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

Kothari, Rajni, *Caste in Indian Politics,* Orient Black Swan, New Delhi, 1970.

Leach, E.R. (ed), *Aspects of Caste in South India, Ceylon, Northwest Pakistan*, Cambridge, 1960.

Lenin, V.I, *A Great Beginning, Collected Work, Vol. 29*, Progress Publishers, Moscow, 2011.

Maheshwari, Shriram, *The Mandal Commission and Mandalisation: A Critique*, Concept Publishing Company, New Delhi, 1991.

Mallick, Ross, Development policy of a Communist Government: West Bengal since 1977, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Marx**,** Karl and Engles**,** Frederick, Manifesto of the **P**arty' in collection Works, Vol.6, Progress Publishers, Moscow, 1976

Mishra, B.B., *The Indian Middle Classes, Their Growth in Modern Times*, OUP, 1961.

Mishra, S.K., An Alternative Approach to Development: Land reforms and Panchayat, Government of West Bengal, Information and Cultural Affairs Department, Calcutta 1991.

Mukherjee, Nirmal and Bandopadhyay, D, New Horizons for West Bengal Panchayat, Government of West Bengal, Calcutta, 1993.

Nesfield, J.C., *Brief view on the Caste System of the North-Western Provinces and Oudh,* Allahabad, 1885.

Omvedt, Gail, *Dalits and the Democratic Revolution in India, Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India*, Sage, New Delhi, 1994.

----------, *Dalit Visions: The Anti-caste Movement and the Construction of an Indian Identity*, Orient Longman, New Delhi, 1995.

Persists, M.A., Revolutionaries of India in Soviet Russia, Moscow, Progress Publishe, 1983.

Roy, Dayabati, Rural Politics in India: Political stratification and governors in West Bengal, Cambridge University Press **2014.**

Rogly, Ben, Containing Conflict and Reaping Votes: Management of the Rural Labour Relation in West Bengal, Economic and Political Weekly, vol. 33, No.42/43, October 17 1988.

Rudra, Ashok, One Step Forward, Two Step Backward, Economic and Political Weekly, Review of Agriculture, Vol.16, June 1981.

Sanyal, Annapurna, *Schedule Caste and Scheduled Tribes in Indian Politics,* Minerva, Calcutta, 1991.

Sanyal, Hites Ranjan, *Social Mobility in Bengal,* Papyrus, Calcutta, 1981.

Sardesai, S.G., India and the Russian Revolution, Communist Party Publication, New Delhi, 1967.

Sarkar, Sumit and Sarkar, Tanika, *Caste in Modern India, Vol. 1 & 2,* Permanent Black, New Delhi, 2014.

Sen, Anupam, The State, Industrialization and Class Formations in India: A Neo-Marxist Perspective on Colonialism, Underdevelopment and Development, Routledge Library Editions: British in India, 2017.

Sen, Dwaipayan, An Absent Minded Casteism? in Chandra, Uday, Geir, Heierstad, edited by and Nielsen, Kenneth Bo, *Politics of Caste in West Bengal*, New Delhi, Routledge, 2016, পৃ. পৃ. ১০৩-১২৪।

Sen, Ranjit and Sen, Snigdha, Caste, Class and the Raj, Calcutta, Progressive Publishers, 2000.

Sen, Sunil, *Agrarian Struggle in Bengal 1946-47*, People's Pub. House, New Delhi, 1972.

Sen, Udity, The Myths Refugees Live By: Memory and History in the Making of Bengali Refugee Identity, Modern Asian Studies, Vol. 48, No.1, January 2014, পৃ. পৃ. ৩৭-৭৬।

Shirokov, G.K., Industrialization of India, Progress Publishers, Kolkata, 1973.

Sinha, Surajit (ed), *Tribal Polities and State Systems in Pre-colonial Eastern Northeastern India,* K.P. Bagchi & Co., Calcutta, 1987.

Singh, Anita Inder, *The Origins of the Partition of India 1936-1947*, Oxford University Press, Delhi, 1987.

Singh, Ekta, *Caste System in India, A Historical Perspective,* Kalpaz Publications, Delhi, 2005.

Singh, K.S., *The Scheduled Castes,* revised edn. Oxford University Press and Anthropological Survey of India, Calcutta, 1999.

Singh, Mahendra Prasad, Split in a Predominant Party, *The Indian National Congress in 1969*, Abhinav Publications, New Delhi, 1981.
Singh, Yogendra, *Social Stratification and Change in India*, New Delhi, 1977.
Srinivas, M.N., *Social Change in Modern India*, Berkeley, University of California Press, 1966, reprint edition, Allied Publishers, Delhi, 1967.
-------, *The Remembered Village,* Oxford University Press, Delhi, 1976.
Stern, Robert W., Changing India, Bourgeois Revolution on the Subcontinent, Cambridge University Press, 1993.
Yagati, Chino Rao, *Dalit Studies: A Bibliographical Handbook*, Kanishka Publishers Distributors, New Delhi, 2003.

বাংলা

আহমেদ, মুজাফফর, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* ১৯২০-২৯, এন. বি. এ.,কলকাতা, ১৯৬৯।
আহমেদ, মুজাফফর, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ ১৯২১-১৯৩৩,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৭০।
উমর, বদরুদ্দীন, মার্ক্সীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।
এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, *জোর আমাদের জার্মানির কৃষক যুদ্ধের ভূমিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৭।
কারাত, প্রকাশ, *পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭।
গুরু, গোপাল, 'সংরক্ষণের রাজনীতিঃ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে' প্রকাশিত, সেন, সুজিত (সম্পাদনা), জাত পাত ও সংরক্ষণ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮।
গোস্বামী, জয়, শাসকের প্রতি তুমি আর তোমার ক্যাডার, রায় , গৌতম সম্পাদিত, সিঙ্গুর উচ্ছেদ প্রতিরোধ কলকাতা, ২০০৭।
ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার,*বাঙালি জাতি পরিচয়,* কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৩৬৩।
চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনা পর্ব,* পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২।
চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,* কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৪।

চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, প্রান্তিক মানব, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৪।

চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ,*২০১১, বাংলার রায়,* কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, কুনাল,*তেভেগা আন্দোলনের ইতিহাস,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, জনপ্রতিনিধি, প্রবন্ধ সংকলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা,২০১৩।

-----------, প্রজা ও তন্ত্র, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৩।

চট্টোপাধ্যায়, সরল, *ভারতের স্বাধীন সংগ্রামের ক্রমবিকাশ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।

চট্টোপাধ্যায়, সুকদেব সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: কাশিপুর বরানগর থেকে লালগড় ভাইয়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, উবুদস, কলকাতা, ২০১২,

চ্যাটার্জী, দেবী,*মানবাধিকার ও দলিত,* কলকাতা, ডি. অ্যাণ্ড পি. গ্রাফিক্‌স প্রা.লি., ২০১৪।

ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, (অনুবাদ) *প্রাচীন ভারতে বর্ণশ্রেণী ও জাত,* ছোয়া, কলকাতা, ২০১৬,

দত্ত গুপ্ত, শোভন লাল, *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১,

দাস, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা পুনর্বিবেচনা,* নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২।

দাস, নরেন্দ্র চন্দ্র, *জাত ধর্মের বিচ্ছিন্ন সমাজে,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ।

দাশগুপ্ত, অবিনাশ, *লেনিন রুশ বিপ্লব ও বাংলা সংবাদ সাহিত্য,* কলকাতা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭০।

দাশগুপ্ত, অসীম, *রাজ্যের গ্রাম অঞ্চল ও কৃষির প্রসঙ্গ: বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও ও প্রকৃত ঘটনা,* উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সমস্যা সম্ভাবনা, কলকাতা, যুব শক্তি প্রকাশনী, ২০০৮।

দেবেন্দ্র, কৌশিক, *আধুনিক মধ্য এশিয়ার ইতিহাস আদি উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল,* মস্কো প্রগতি প্রকাশন, ১৯৬৯।

দেশাই, এ. আর., *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি,* কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০১।

দুবে, এস. সি., *ভারতীয় সমাজ,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯৬।

পোদ্দার, অরবিন্দ,*পশ্চিমবাংলা, রাজনৈতিক সমাজতান্ত্রিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর,* কলকাতা, প্রত্যয়, ২০০০।

বন্দোপাধ্যায়, শেখর; দাশগুপ্ত, অভিজিত (সম্পাদিত), *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ,* দিল্লী, আই. সি. বি. এস., ১৯৯৮।

বর্মণ,রূপ কুমার, জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, অ্যালফাবেট বুকস, কলকাতা, ২০১৯।

বর্মণ, রূপ কুমার, *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ, জাত পাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ,* গাংচিল, কলকাতা,২০২২। বসু, জ্যোতি,*যতদূর মনে পড়ে,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ২০১৫।

বসু, নির্মল কুমার,*হিন্দু সমাজের গড়ন,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৪৮।

বালা, যতীন, শিকড় ছেঁড়া জীবন, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১০।

বেরা, অঞ্জন, ও অন্যান্য সম্পাদিত, অন্যান্য সম্পাদিত জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ প্রথম খন্ড, কলকাতা, ২০০২।

বেতে, আঁদ্রে, 'আধুনিক ভারতে অনুন্নত সমাজ', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩।

বিশ্বাস, অনিল, ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০।

----------, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৫।

-----------, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খন্ড,* এন. বি. এ.,কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪।

বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৩।

বিশ্বাস, মনোশান্ত,*বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি,* কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬।

বিশ্বাস, সতীনাথ, *জাতিতত্ত্ব ও নমস্য কুলদর্পণ,* ঢাকা, ১৯৩০।

বিশ্বাস, শশীভূষণ, *নমঃশূদ্র দ্বিজাতি তত্ত্ব,* বরিশাল, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

বসু, শর্মিলা, *জ্যোতিবাবুর পশ্চিমবঙ্গ একটি অধঃপতনের অধ্যায়,* আনন্দ, কলকাতা,২০১২,

ব্যাপারী,মনোরঞ্জন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, কলকাতা পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪।

বন্দ্যোপাধায়, সুরভী, *জ্যোতি বসু: অনুমোদিত জীবনী,* কলকাতা, ১৯৯৭।

বন্দ্যোপাধায়, সৌভিক,*ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতি-বর্ণ সমীকরণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *হেডমাস্টার ম্যানুয়েল,* স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত, *জমিদারি প্রথার অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ব্যবস্থা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪

ভট্টাচার্য,অমিত, সিঙ্গুর টু লালগড় ভাইয়া নন্দীগ্রাম: রাইজিং ফিলমস অফ পিপল আণ্ডার ডিসপ্লেসমেন্ট, ডেস্টিনেশন অ্যান্ড স্টেট টেরর, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ,*ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা,* কলকাতা, ফার্মা. কে. এল. এম. ১৯৮৭।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *আর্যরা: সংহিতা যুগ, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১,* গাংচিল, কলকাতা, ২০১৩।

মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, *চুয়ান্ন: স্মরণীয় বার দিন,* কলকাতা, ১৯৯১।

মণ্ডল, চিত্ত, ও রায় মণ্ডল, প্রথমা,*বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, অন্নপূর্না প্রকাশনী, ২০০৩।

মন্ডল, জগদীশ মরিচ ঝাঁপিঃ নৈশব্দের অন্তরালে, সুজন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০২।

মার্ক্স, কার্ল, *দর্শনের দারিদ্র,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭।

মল্লিক, পঙ্কজকুমার, *আমার যুগ আমার গান,* কলকাতা, ১৯৮০

মিশ্র, বিনোদ, 'জাত, শ্রেণী ও দলিতঃ একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস', প্রকাশিত, সেন, সুজিত, সম্পাদনা, *দলিত আন্দোলন প্রশ্ন প্রসঙ্গ,* গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩।

মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, *স্বাধীন সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশ চরিত্র তাৎপর্য,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬

রনদিভে, বি.টি. *জাত বর্ণ শ্রেণি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা কলকাত, ২০১০।

রাণা, সন্তোষ, রাণা, কুমার,*পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* কলকাতা, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ২০০৯।

রায়, নীহাররঞ্জন,*বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করন, আশ্বিন ১৪০২।

রায়, অজয়, বাংলাদেশ বামপন্থী আন্দোলন ১৯৭৪-১৯৭১, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩।

রায়চৌধুরী, মহিতোষ, সম্পাদক, *শিক্ষক, বৈশাখ, ১৩৬৪, দশম বর্ষ, দশম সংখ্যা।*

সরকার, কৃষ্ণকুমার, 'আত্মচেতনার উন্মেষ: পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে পত্র-পত্রিকার অবদান (১৯১০-১৯৭০)', হাসনু, ইকবাল করিম (সম্পা.), *বাংলা জর্নাল, ২১শ সংখ্যা,* টইটুম্বর, ২০১৫, কানাডা, পৃ.পৃ.৭৯-৯৪।

------------,'দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা': বাংলার প্রথম নিম্নবর্ণের আত্মজীবনী', মহলদার, অরেন্স ও ধীবর, দেবদীপ (সম্পা.): *Literature, Culture and Society,* মহাবোধী সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.পৃ.২৩৩-২৪৬।

------------, 'জাতি পরিচিতি, সমাজ ও লোকসংস্কৃতি: বাংলার পৌণ্ড্র জাতির একটি আলোচনা', সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী ও পারমিতা মণ্ডল (সম্পা.): *একুশের ঢেউ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন গবেষণা পত্রিকা, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক, ২০১৫),* পৃ.পৃ. ৮৩-৯৬। অনলাইনে দেখার জন্য দেখুন- https://ekusherdheu.in/wp-content/uploads/2015/09/Prothom-Borso-Prothom-Sonkhya.pdf।

------------, 'পৌণ্ড্র সমাজ জাগরণ আন্দোলনে রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২)', দে, শুভঙ্কর (সম্পা.), *ভারতের সামাজিক ইতিহাস: অনুর্ধ ৩০শের কলমে*, আবিষ্কার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.পৃ. ১৩৫-১৪৬।

------------, 'যুক্তির আলোকে মুক্তির চিন্তা: শ্রীমন্ত নস্কর ও পৌণ্ড্র সমাজের চেতনাবোধের বিকাশ', বাগ, খোকন কুমার (সম্পা.): *অন্তর্মুখ,* সাম্পান, বর্ধমান, ২০১৭, পৃ.পৃ.৩১-৪২।

------------,*জাতি আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: বাংলার পৌণ্ড্র জাতির একটি আলোচনা (১৯১১-২০১১), অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ,* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮। অনলাইনে দেখার জন্য দেখুন- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/335871; http://hdl.handle.net/10603/335871

------------, 'অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর ও ঔপনিবেশিক বাংলার জাতি রাজনীতি (১৮৯৪-১৯৪৭)', লস্কর, আসিফ জামাল ও বিশ্বাস,দীপঙ্কর (সম্পা.), *সংযোগ সংশ্লেষ সমন্বয়: আবহামানের দক্ষিণ এশিয়া,* বুকস্ স্পেস, কলকাতা, ২০১৯, পৃ.পৃ. ৬২৭-৬৩৯।

------------, 'সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে বাংলার পৌণ্ড্র জাতির বিবরণ', খোকন কুমার বাগ (সম্পা.): *অন্তর্মুখ,* সাম্পান, বর্ধমান, ২০১৯, পৃ.পৃ.১১৪-১২৮।

------------, জাতি পরিচিতির নবনির্মাণ: পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯৪৭-২০১১), দাস, বিকাশ (সম্পা), ভারতীয় উপমাহাদেশ এবং প্রান্তিকতাঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২১।

------------, 'বাংলার পৌণ্ড্র জাতি-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত', প্রকাশিত, প্রমাণিক, মৃন্ময় *(সম্পা), দলিত সাহিত্য চর্চা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২, পৃ.পৃ. ৩৩১-৩৩২।

------------, পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি, রাজনীতি ও জাতি সংগঠন, প্রকাশিত, প্রমাণিক, মৃন্ময় *(সম্পা), দলিত সাহিত্য চর্চা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২, পৃ.পৃ. ৩০৭-৩২৩।

------------,পৌণ্ড্র জাতির সংগঠন ও কার্যক্রম: একটি আলোচনা, সুলতানা, সামিনা, ইতিহাস প্রবন্ধমালা, ইতিহাস একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. পৃ. ২৭৭-২৯২।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত,* কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৪।

সরদার, রাইচরণ, দিনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা, ডায়মন্ড হারবার ১৯৫৯।

সরদেশাই, এসজি., *ক্লাসেস স্ট্রাগল এন্ড ক্লাস কনফ্লিক্ট ইন রুরাল এরিয়া,* কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ১৯৮২।

সুমন, কবীর, নন্দীগ্রাম প্রতিরোধ, কলকাতা কসমিক হারমনি ২০০৭।

সেনগুপ্ত, নীলেন্দু, *বিধান চন্দ্র ও সমকাল,* ২১ শতক, কলকাতা, ২০১০।

সেনগুপ্ত, মনিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* কলকাতা, ১৯৮২।

সেন, রণেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ইতিবৃত্ত,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬।

সেন, সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৯০,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯৪।

সেন, সুজিত সম্পাদনা, দলিত আন্দোলন প্রশ্নও প্রসঙ্গ, গ্রন্থ মিত্র, কলকাতা, ২০১৩।

সিং সুরজিৎ, হরকিসান, *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃ. ১৯।

সিংহ,মণি, *জীবনসংগ্রাম,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯১।

হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা,* পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭,

Internet Sources

Bagchi, A. 'Studies on the economy of West Bengal since Independence', *EPW,* Vol.XXXIII, November 21, 1998, Access Date, 24,4.17.

Bagchi, Amiya Kumar, Studies on the economy of West Bengal Since Independence, *Economic and Political Weekly*, December 4, 1998, Access Date, 24.4.17.

Bag, Kheya, "Red Bengal"s Rise and Fall", New Left Review, 70, Jul-Aug 2017; https,//newleftreview.org/II/70/kheya-bag-red-bengal-s-rise-and-fall

Bandyopadhyay, Sarbani, Caste and Politics in Bengal in *Economic and Political WeeklyVol. XLVII No. 50,* (December 15, 2012), পৃ.পৃ. ৭১-৭৩। Link: https://www.epw.in/journal/2012/50/discussion/caste-and-politics-bengal.html

Bandyopadhyay, Sekhar and Anasua Basu Roychowdhury, In search of space, the scheduled caste movement in West Bengal after Partition, Mohanirban Calcutta Research Group, Kolkata, 2014, http,//www.mcrg.ac.in/PP 59.pdf>,Access Date, 24.4.17

Bardhan, A B, Leader of the Left, He knew how to run a font, front line, Vol.27, Issue-3, 30 January-12 February, 2010, Access Date, 24.4.17.

Bardhan, Pranab and Mookherjee, Dilip, Poverty Alleviation Efforts of Panchayats in West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.39, No.9*, February 28, 2004. Link: https://www.epw.in/journal/2004/09/special-articles/poverty-alleviation-efforts-panchayats-west-bengal.html

Bhattacharya, Dwaipayan, Civic Community and Its Margins: School Teacher in Rural West Bengal, *Economic and Political Weekly, Vol.36, no.8,* February 24 2001. Link: https://www.researchgate.net/journal/Economic-and-Political-Weekly-0012-9976

Basu Raychowdhury, Anasua, Life after Partition, a study on the reconstruction of lives in West Bengal, July 7, 2015www.yheijhss.com, Access Date, 24,4,17.

Bhattacharya, Buddhadeb, "Thirty Years of left Front Government in West Bengal", People's Democracy, Vol. XXXI, No. 25, June 24, 2007; http,//archives.peoplesdemocracy.in/2007/0624/06242007_buddhadev.htm

Bhattacharya, Vinayak, People’s art or performance of the elites? Debating the History of IPTA in Bengal, Rupkatha journal on interdisciplinary studies in humanities, Bol.2, October 26, 20 http, //rukkatha.com/ipta-in-bengal/, Access Date, 24.4.17

Bhattacharya, Daipayan, 'West Bengal Permanent Incumbency and Political Stability' *EPW,* December 18, 2004, Access Date, 24.4.17.

Biswas, Soutik (2012), “Who Says Communism Is Dead in Bengal?”, BBC News Network South Asia, 12 May, viewed on 14 April 2014,www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13371621

Chandra, Deepan, P.C.Joshi, A Political Journey, *Mainstream, XLVI, 1*, December 25, 2007, Access Date, 24.4.17.

Chandra, N.K, Industrialization and the Left Movement, has a barrel question of Strategy in West Bengal, *Social Science*, BI, 7, Nos.1 to 4, 1997, Access Date, 24.4.17.

Chatterjee, Partha, Historicising Caste in Bengal Politics in *Economic and Political WeeklyVol. XLVII No. 50,* December 15, 2012,পৃ.পৃ. ৬৯-৭০।
Link: https://www.epw.in/journal/2012/50/discussion/historicising-caste-bengal-politics.html

Chandra, Uday and Nielsen, Kenneth Bo, The Importance of Caste in Bengal in *Economic and Political Weekly, VOL XLVI NO 44,* (November 3, 2012), পৃ.পৃ. ৫৯-৬১।
Link:https://www.epw.in/journal/2012/44/discussion/importance-caste-bengal.html

Chakravartty, Nikhil, 'Communicates and Quit India Struggle, *Mainstream, XLVI*, 34, August 13, 1994.www.mainstreamweekly.net 'Communicates and elections, never mind the ballots, Marxist bulletin, no six, a journal of the IBT's German section, September 1994. <www.bolshevik.org> Access Date, 24.4.17.

De, Nitish R,HA Technique for Social Intervention, *EPW*, 5, 3-4-5, January 1970.

Dutt, R. Palme And Bradley, Ben, Auntie Imperialist People Stand in India, the Labour Monthly, 18,3, March 1936 www.marxists.org, Access Date, 24.4.17.

Dutt, R. Palme and Bradley, Ben, 'Dutt-Bradley Thesis', International press correspondence, XVI, 2, Moscow 29 February 1936, Access Date, 24.4.17.

Guha, Ayan, “BJP has Married Mandal with Kamandal in Bengal, Posing a Dilemma for Scholars,” *Print*, April, 16, 2021. https://theprint.in/opinion/bjp-married-mandal-with-kamandal-in-bengal-dilemma-for-scholars/640524/

----------, “Is There A Second Wave of Dalit Upsurge in West Bengal?” *Economic and Political Weekly* 54, no. 2, 2019. Link: https://www.epw.in/engage/article/is-there-a-second-wave-of-dalit-upsurge-in-west-bengal

Khasnabis, Ratan, Operation Barga-Limits to Social Democratic Reformism Economic and Political Weekly, Review of Agriculture, Vol.16, No. 25 26, June, 20, 1981, Limk: https://www.epw.in/journal/1981/25-26/review-agriculture-uncategorised/operation-barga-limits-social-democratic

Kumar, Arvind and Guha, Ayan, Political Future of Caste in West Bengal, *Economic & Political Weekly*, August 9, 2014 Vol xlix No 32. Link: https://www.epw.in/journal/2014/32/discussion/political-future-caste-west-bengal.html

Mukherjee, Simantani (2014), “Trinamool and Its Leftist Discourse”, *Deccan Herald*, 19 April, viewed on19April,http,//www.deccanherald.com/content/158750/F

Paul, D Amato, 'Marxists and Election', International Socialist Review, Issue 13, August-September2000 https,//Social list worker.org/2016/04/26/elections-and-the-Marxist-tradition> Access Date, 25.4.17.

Pinto, Ambrose, Caste Discrimination and UN, *Economic and Political Weekly*, September 28, 2002, পৃ.পৃ. ৩৯৮৮-৩৯৯০। Link: https://www.epw.in/journal/2002/39/commentary/caste-discrimination-and-un.html

Samaddar, Ranabir, Whatever Has Happened to Caste in West Bengal in *Economic and Political WeeklyVol. XLVIII No. 36,* September 7, 2013,পৃ.পৃ. ৭৭-৭৯।

Link:https://www.epw.in/journal/2013/36/discussion/whatever-has-happened-caste-west-bengal.html

Sarkar, Abhirup, Political Economy of West Bengal: A Puzzle and a Hypothesis, *Economic and Political Weekly*, *Vol. 41, No.4*, January 28, 2006. Link: https://www.epw.in/journal/2006/04/special-articles/political-economy-west-bengal.html

Sinharay, Praskanva, A New Politics of Caste *in Economic and Political WeeklyVol. XLVII No. 34*, August 25, 2012, পৃ.পৃ. ২৬-২৭। Link: https://www.epw.in/journal/2012/34/states-columns/new-politics-caste.html

-----------, West Bengal's Election Story: The Caste Question in *Economic and Political Weekly Vol. XLIX No. 17*,April 26, 2014,পৃ.পৃ. ১০-১২। Link: https://www.epw.in/journal/2014/17/commentary/west-bengals-election-story.html

------------, Dalit Question in the Upcoming West Bengal Assembly Elections in *Economic and Political WeeklyVol. LI No. 9*, February 27, 2016, পৃ.পৃ. ১৭-২০। Link: https://www.epw.in/journal/2016/9/commentary/dalit-question-upcoming-west-bengal-assembly-elections.html

The population in 2001 according to Census 2001, http,//www.jsk.gov.in/projection_report_December2006.pdf

TNN (2014), "CPM Finally Expels RezzakMollah", *The Times of India*, 27 February, viewed on 19 April, http,//timesofindia.indiatimes.com/india/CPM-finally-expels-Rezzak-Mollah/articleshow/31070457.cms